ভলিউম ১৫

কুয়াশা

৪৩, ৪৪, ৪৫

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1105-8

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ শরাফত খান

মুদ্রাকর ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম ঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 15
KUASHA SERIES: 43, 44, 45
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা

সূচি

কুয়াশা ৪৩	৫—৫৫
কুয়াশা ৪৪	৫৬—১১৩
কুয়াশা ৪৫	১১৪—১৬০

কুয়াশা ৪৩

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৭৪

এক

সেদিনই বিকেলে আজমল রব্বানী শরীফ চাকলাদারের সাথে দেখা করার জন্যে বাইরে বের হবার কথা ভাবছিল। এমন সময় বেজে উঠল বাড়ির গেটের কলিংবেল। রবালি দরজা খুলে দিয়ে দেখল সুবেশী সুদর্শন স্বাস্থ্যবান একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার পাশে একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রবালি বুঝল ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এসেছেন। সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'কাকে চান, হুজুর?'

ভদ্রলোক অর্থাৎ সত্যান্বেষী শহীদ খান মুচকি হেসে বলল, 'চাই তোমাদের বিবি সাহেবাকে। বাড়িতে আছেন কি তিনি?'

রবালি কি বলবে ভেবে পেল না। আজ অবধি শোনেনি সে কেউ তার বিবি সাহেবার সাথে সরাসরি দেখা করতে চেয়েছে। অনেক ভেবে সে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল, 'সাহেব বাড়িতেই আছেন। আমি কি সাহেবকে ডেকে দেব? বিবি সাহেবা আপনার সাথে দেখা করবেন কিনা···।'

শহীদ বলল, 'তোমার সাহেবকে ডেকে দিতে হবে না। আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাও আগে। তারপর তোমার সাহেবকে গিয়ে খবর দাও। তোমার সাহেবকে গিয়ে বলবে ডিটেকটিভ শহীদ খান এসেছেন। জরুরী দরকার। তার সাথে আলাপ করার চেয়ে তার স্ত্রীর সাথেই আলাপ করার দরকার আমার।'

দারোয়ান রবালি বলল, 'আসুন, হুজুর।'

ড্রয়িংরুমে নিয়ে বসাল রবালি শহীদ খানকে। রবালি চলে যাবার পর ড্রয়িংরুমটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। বাড়ির মালিকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আছে বোঝা যায় দামী দামী আসবাবপত্রের আধিক্য দেখে। কিন্তু টাকা থাকলেও রুচিবোধের নিতান্তই অভাব। দেয়ালে লটকানো রয়েছে এমন সব মেয়ের ছবিসহ ক্যালেণ্ডার যা কোন ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুমে সম্পূর্ণ বেমানান। ছবির মেয়েগুলোর পরনে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। তাদের চোখ মুখে ফুটে উঠেছে অশ্লীল ইঙ্গিত।

থমথমে মুখে ড্রয়িংরুমে ঢুকল আজমল রব্বানী। শহীদের দিকে কটমট করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সে বসল একটা সোফায়। বলল, 'আপনার পরিচয়?'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। আর কোন পরিচয় দরকার আছে? দরকার থাকলে বলি···।'

'কি চান আপনি?'

শহীদ বলল, 'আপনার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই। মিজান চৌধুরী এবং তার ছেলে উজান চৌধুরীর নিখোঁজ হবার কেসটা আমি নিয়েছি। মিসেস ডলির সাথে সে ব্যাপারেই কথা বলব।'

'ওদের নিখোঁজ হওয়ার সাথে আমার ওয়াইফের সম্পর্ক কি?' ব্যাখ্যা দাবি করল আজমল রব্বানী।

শহীদ বলল, 'সম্পর্ক আছে। কিন্তু সব কথা আপনাকে বলা যাবে না।'

'আমার ওয়াইফের কথা আমাকে বলা যাবে না! সেক্ষেত্রে আমি তো আপনাকে তার সাথে দেখা করার অনুমতি দিতে পারি না! সে আমার ওয়াইফ, কার সাথে দেখা করবে আর কার সাথে দেখা করবে না তা আমার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে!'

'না, আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। আপনার স্ত্রীর আচরণ তা প্রমাণ করে না। আপনি কি জোর করে বলতে পারেন তিনি আপনার অনুমতি ছাড়া কোন লোকের সাথে দেখা করেন না?'

রাগে লাল হয়ে উঠেছে আজমল রব্বানীর গাল, 'এসব কথার মানে কি জানতে চাই আমি!'

শহীদ হেসে উঠল, 'দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তারচেয়ে, তর্ক না করে আপনার স্ত্রীকে একবার পাঠিয়ে দিন। অবশ্য আপনি যদি তার সাথে আমাকে দেখা করতে না দেন তাহলে জোর করে কিছু লাভ হবে না। সেক্ষেত্রে কাজটা আপনাদের জন্যে ক্ষতিকরই হবে। বিশ্বাস করুন, আপনার স্ত্রীর উপকার করারই ইচ্ছা আমার। কিন্তু আপনি যদি গোয়ার্তুমি করেন তাহলে আমার কিছু করার নেই। একটা কথা বলে রাখি, আপনার স্ত্রী যদি আমার সব প্রশ্নের উত্তর না দেন তাহলে আজই তাকে গ্রেফতার করবে পুলিস। পুলিসকে এ ব্যাপারে একমাত্র আমিই পারি ঠেকাতে, যুক্তি দিয়ে। এবার দয়া করে তাকে ডেকে দিন। কিংবা তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। হ্যাঁ, সেটাই ভাল। আমরা নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।'

আজমল রব্বানীর চোখমুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কিন্তু শহীদের প্রতিটি কথা সে বিশ্বাস করেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আসুন আমার সাথে, মি. শহীদ খান।'

অন্দর মহলে ঢুকল শহীদ আজমল রব্বানীর পিছু পিছু। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে সরু একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের দু'পাশে কয়েকটা রুম। একটি রুম থেকে বেরিয়ে এল একজন যুবক। আজমল রব্বানীর পিছনে শহীদকে দেখে যুবকটি থতমত খেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে শহীদ আজমল রব্বানীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার

ছেলে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আকরম রব্বানী।'

আকরম নিঃশব্দে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। আকরম নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।

ডলির রুমটা প্যাসেজের শেষ মাথায়। আজমল রব্বানী দরজায় টোকা দিতে ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু আধ মিনিট পরই খুলে গেল দরজা।

শহীদ দেখল মিসেস ডলির বয়স অত্যন্ত অল্প। বড়জোর তেইশ কি চব্বিশ। আজমল রব্বানীর বয়সের অর্ধেকের চেয়েও দু'এক বছর কম হবে। মাত্র আট মাস হলো বিয়ে করেছে আজমল রব্বানী ডলিকে। ডলি নয়, ওর নাম ছিল ঝুমা বাঈ।

ডলিকে বিয়ে করার ইতিহাসটাও বড় অদ্ভুত।

ডলি অবাক হয়ে তাকাল শহীদের দিকে। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'কি ব্যাপার বলো তো?'

আজমল রব্বানী পরিচয় দিল শহীদের। মুখ শুকিয়ে গেল ডলির চোখের নিমেষে। ঢোক গিলল সে। বলল, 'কিন্তু মিজান চৌধুরী বা তার ছেলেকে আমি চিনিই না! ওদের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এ ব্যাপারে আমাকে জড়াবার কি কারণ থাকতে পারে?'

শহীদ মৃদু হাসল। বলল, 'মিজান চৌধুরীকে আপনি না চিনলেও নওশের আবদুল্লাকে আপনি চেনেন। মিজান চৌধুরী ও তার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার সাথে নওশের আবদুল্লার সম্পর্ক আছে। সুতরাং আপনাকে প্রশ্ন করে নওশের আবদুল্লা সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ডলির মুখের চেহারা।

'নওশের আবদুল্লা! তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক, ডলি?' অবিশ্বাস ভরা গলায় জানতে চাইল আজমল রব্বানী।

ডলি কি বলবে ভেবে পেল না, 'আমি তো কিছুই···মানে, কিছুই বুঝতে পারছি না···।'

'নওশের আবদুল্লাকে আপনি চেনেন?' শহীদ এবার আজমল রব্বানীকে প্রশ্ন করল।

'আমি? না, মানে···না, চিনি না। তবে নাম শুনেছি যেন···।'

শহীদ হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে। আপনি এবার যান। আপনার স্ত্রীর সাথে একা কথা বলতে চাই আমি।'

কি মনে করে বিনা বাক্যব্যয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল আজমল রব্বানী।

ডলি পথ করে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল, রুমের ভিতর ঢুকল শহীদ। প্রথমেই লক্ষ্য করল ও রুমের ভিতর একটা সিঙ্গেল খাট। তারমানে ডলি একা শোয় এখানে। ওর স্বামী আলাদা কামরায় থাকে। আসবাবপত্রের অভাব নেই রুমের

ভিতর। ডলি বসল খাটের উপর পা ঝুলিয়ে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল শহীদ। তাকাল ডলির দিকে। বলল, 'নাচের অভ্যাস কি একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন?'

মাথা নিচু করে উত্তর দিল ডলি, 'হ্যাঁ।'

বাঈজী পাড়ার মেয়ে ডলি। নাচ তার রক্তের সাথে মিশে আছে। আজমল রব্বানী ওর নাচ দেখেই মজে ছিল। ডলির সৎ মা'কে নগদ দেড় লাখ টাকা দিয়ে বিয়ে করার অনুমতি নিতে হয়েছিল তাকে।

ডলি মুখ তুলে তাকাল। চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি জানলেন কিভাবে আমার সাথে নওশেরের পরিচয় আছে? নওশের বলেছে আপনাকে?'

শহীদ বলল, 'নওশের বলেনি। তাকে আমি খুঁজছি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে। যেভাবেই কথাটা জেনে থাকি, কথাটা কি সত্যি নয়? শুধু পরিচয় নয়, নওশেরকে আপনি ভালবাসতেন। আজমল সাহেবের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে ঠিক, কিন্তু আপনি নওশেরকে এখনও ভালবাসেন। নওশেরও আপনাকে ভালবাসে। সব কথাই আমি জেনেছি। প্রতি রবিবারে আপনি নওশেরের সাথে দেখা করতে যান তাও আমি জানি। অস্বীকার করবেন?'

অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডলি। কথা সরল না তার মুখে।

'নওশের কোথায়, মিসেস ডলি?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল শহীদ।

বোকার মত তাকিয়ে আছে ডলি। শহীদ আবার বলল, 'নওশেরের বন্ধুরা খুব চিন্তিত, তা জানেন? কেন বলুন তো? গতকাল থেকে তার কোন খোঁজ নেই। ঢাকা শহরে কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। আপনি জানেন কোথায় সে আছে। কোথায় আছে সে?'

'আমি জানি না, বিশ্বাস করুন···!'

শহীদ কঠোর স্বরে বলল, 'মিথ্যে কথা বলবেন না, মিসেস ডলি।'

'বিশ্বাস করুন, আমি জানি না···।'

'কবে শেষ দেখা হয়েছিল ওর সাথে আপনার?'

'পরশুদিন সকালে। গতকালও তাকে আমি দেখেছি। তবে কথা হয়নি। এ-বাড়িতে এসেছিল সে।'

'পরশুদিন সকালে কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?'

'তার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি।'

'কেন? তার সাথে কি আলাপ হয়েছিল আপনার?'

মাথা নিচু করে ফেলল ডলি।

শহীদ ছাড়ল না। হঠাৎ প্রশ্ন করল ও, 'একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন, মিসেস ডলি। আপনি কি নওশেরকে এখনও ভালবাসেন?'

ডলি উত্তর দিল না। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না সে।

'আপনি কি তার মঙ্গল চান?'

ঝট করে মাথা তুলল ডলি।

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা নওশের ভয়ঙ্কর কোন বিপদে পড়েছে। তাকে যদি আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চান তাহলে সব কথা খুলে বলুন। আমার কাছে কোন কথা গোপন রাখবেন না। যদি রাখেন তাহলে নওশেরের এমন ক্ষতি হবে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

ডলি চুপ করে রইল। শহীদ আবার বলল, 'আমি জানি নওশের কুখ্যাত একজন অপরাধী। বহু ধনী লোকের ব্যক্তিগত দুর্বলতার সুযোগ নেয় সে। বহু লোককে সে ব্ল্যাকমেল করে। নওশের ব্ল্যাকমেল করে এমন ক'জন লোককে আপনি চেনেন, মিসেস ডলি?'

ডলি এবারও মুখ খুলল না।

শহীদ বলল, 'আপনি কি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন না?'

উত্তর না দিয়ে ডলি জানতে চাইল, 'আপনি কি মনে করেন নওশের খুন হয়েছে?'

'ঠিক জানি না। তবে খুন হলেও আশ্চর্য হব না। তাকে খুন করার লোকের অভাব হবার কথা নয়।'

ডলি হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার ধারণা তাকে দু'জন লোক খুন করতে পারে। কিন্তু একজন নিজেই খুন হয়েছে। আর একজন···।'

'একজন খুন হয়েছে মানে? আপনি কি কুচবিহারীর কথা বলছেন?'

ডলি ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল, 'হ্যাঁ। নওশের কুচবিহারীকেও ব্ল্যাকমেল করত। কারণ কুচবিহারীর দুর্বলতা ছিল আমার ওপর। প্রায়ই সে গোপনে আমার কাছে আসত। খবরটা নওশের জেনে ফেলে···।'

'জেনে ফেলে, না, আপনিই তাকে জানিয়ে দেন?'

চুপ করে রইল ডলি।

'কুচবিহারীর কাছ থেকে কত টাকা করে নিত নওশের?'

'হপ্তায় একহাজার টাকা। আপনি কি মনে করেন কুচবিহারীকে নওশের খুন করেছে?'

'জানি না। নওশেরের সাথে গতপরশু সকালে কি কথা হয়েছিল আপনার বলুন আগে।'

ডলি কি যেন ভাবছে। খানিক পর সে বলল, 'সব কথাই যখন আপনি জেনেছেন, তখন আর বাকি দু'একটা কথা চেপে রেখে কোন লাভ নেই। যা সর্বনাশ হবার তা তো আমার হয়েছে। এ-কূল ও-কূল কোন কূলই আর রক্ষা করতে পারব না আমি। প্রথম থেকেই বলি আপনাকে।'

'বলুন।' শহীদ সিগারেট ধরাল।

ডলি বলতে শুরু করল, 'আজমল আমার স্বামী হলেও তাকে আমি একদিনের জন্যেও মনে প্রাণে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার নাচ দেখতে গিয়ে ও মুগ্ধ হয়। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে, কিন্তু তার প্রস্তাব ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিই আমি। কিন্তু আমার মতামতের তোয়াক্কা না করে আমার শত্রু সৎ-মায়ের সাথে ষড়যন্ত্র করে জোর করে বিয়ে করে ও আমাকে।'

'আচ্ছা!'

ডলি বলে চলে, 'নওশেরকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। একই বাঈজী পাড়ায় বাড়ি আমাদের। ওর মা মালেকা বাঈ আমাকে খুব ভালবাসত। ওদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল আমার! নওশের আমাকে খুব ভালবাসত, আমিও নওশেরকে ভালবাসতাম; কিন্তু আমার জীবনের চরম বিপদের সময় নওশের ঢাকায় ছিল না। আমার সৎ-মা ষড়যন্ত্র করে নওশেরকে টাকার লোভ দেখিয়ে একটা কাজ দিয়ে ঢাকার বাইরে সরিয়ে দেয়। নওশের এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। এক হপ্তা পর যখন সে ঢাকায় ফিরল তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তখন আজমল সাহেবের স্ত্রী।'

'তারপর?'

'নওশের চেয়েছিল আজমল সাহেবকে খুন করতে। কিন্তু আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে ক্ষান্ত করি। তার প্রতি আমার দুর্বলতা তখনও ছিল, এখনও আছে। হ্যাঁ, প্রতি রবিবারে আমি তার কাছে যাই।'

'গত পরও দিন সকালে...'

'বলছি। গত পরশু দিন সকালে আমি নওশেরের সাথে দেখা করি সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। তার আগের দিন রাতে আমি এক ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ফেলি।'

'ষড়যন্ত্র? কার বিরুদ্ধে কার ষড়যন্ত্র?'

'কুচবিহারীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আমার স্বামী এবং তার বন্ধু শরীফ চাকলাদার। নিজের কানে ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে পরদিন সকালে আমি নওশেরকে কথাটা বলি। নওশের খুব খুশি হয়। ওকে খুশি করার জন্যে সব সময় চেষ্টা করি আমি। নওশের আমাকে জানায় যে কুচবিহারীও তাকে প্রস্তাব দিয়েছে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারকে খুন করার জন্যে। ভাল পয়সা কামানো যাবে দুই দলকে খেলিয়ে।'

'ওরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করেছিল কেন?'

'ব্যবসা নিয়ে গোলমাল। কুচবিহারী নাকি এদের দুজনকে ঠকাচ্ছিল।'

'তারপর?'

'নওশের আমাকে বলে যে সে ওদের কাউকেই খুন করবে না। তবে খুন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু'দলের কাছ থেকেই মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করবে। গতকাল এসেছিল সে এ-বাড়িতে। আমার সাথে দেখা করেনি। দেখা করেছিল আমার স্বামী

এবং শরীফ চাকলাদারের সাথে। ওরাও নওশেরকে প্রস্তাব দেয় কুচবিহারীকে খুন করার জন্যে।'

'কি ভয়ঙ্কর! তারপর কি হলো? আচ্ছা, খানিক আগে আপনি বলেছেন, দুজন লোক নওশেরকে খুন করতে পারে। একজন কুচবিহারী, সে নিজেই তো খুন হয়েছে। আর একজন কে? তার পরিচয় তো দিলেন না?'

ডলি খোলা জানালাটার দিকে তাকাল। তারপর শহীদের দিকে চোখ ফেলে নিচু গলায় বলল, 'তাকেও নওশের ব্ল্যাকমেল করে। গতকাল নওশেরকে সে অনুসরণ করেছিল। নওশেরকে সাবধান করে দেয়ার কোনও সুযোগ আমার ছিল না। আমার ধারণা সে-ই নওশেরের কোন ক্ষতি করেছে। তা না হলে নওশের গেল কোথায়? নওশেরকে যদি খুন···।'

'নাম কি তার? কে সে?'

'তার নাম···।'

অকস্মাৎ শহীদের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিদ্যুদ্বেগে লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডলির একটা হাত ধরে সবেগে টান মারল।

পরমুহূর্তে কান ফাটানো শব্দ হলো গুলির।

শহীদের আকর্ষণে ডলি পড়ে গেছে মেঝেতে। শহীদ তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। প্যাসেজ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটল ও। দু'বার মোড় ঘুরে ডলির রুমের পিছনের জানালার নিচে, বাগানে এসে দাঁড়াল ও। কেউ নেই বাগানে।

অথচ বাগানে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে গুলি করেছে আততায়ী। বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে আজমল রব্বানীর। ছুটে আসছে সে। খানিক পরই আজমল রব্বানী বাগানে এসে হাজির হলো। শহীদকে দেখে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, মি. শহীদ! কাকে গুলি করলেন?'

আকরম তার বাবার পিছন পিছন বাগানে এল।

শহীদ বলল, 'গুলি আমি করিনি। জানালা দিয়ে কেউ আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল আজমল রব্বানী।

পাশ থেকে তার ছেলে আকরম গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'না বাবা, মি. শহীদ সত্যি কথাই বলছেন। আমি আমার ওপরের রুমের জানালা দিয়ে দেখলাম বাগান থেকে একজন লোক ছুটতে ছুটতে পাঁচিলের দিকে চলে যাচ্ছে। পাঁচিল টপকে রাস্তায় নামতে দেখেছি তাকে আমি। ঠিক ওখানটায়···।'

কথা না বলে আকরমের দেখানো পাঁচিলের অংশটা পরীক্ষা করার জন্যে পা বাড়াল শহীদ।

পাঁচিল পরীক্ষা করতে করতে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল শহীদের মুখের

চেহারা! কিন্তু আকরমকে সে কোনও প্রশ্ন করল না। পাঁচিলের অপর দিকে রাস্তা। পাঁচিলের উপর উঠে শহীদ দেখল একজন বুড়ো ফকির 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করছে দুলে দুলে।

পাঁচিল থেকে নেমে গেট পেরিয়ে বাড়ির বাইরে এসে বুড়ো ফকিরটার সামনে দাঁড়াল শহীদ। ওর ঠোঁটে মুচকি একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বুড়োকে প্রশ্ন করল ও, 'এই যে, ফকির বাবা, এখান দিয়ে কাউকে ছুটে পালাতে দেখেছ নাকি?'

বুড়ো ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'আমি অন্ধ ফকির, আমি কি দেখতে পাই? কাউকে দেখিনি, বাবা।'

'শব্দও শোনোনি? কালা তো আর নও।'

'না, তা-ও শুনিনি।'

শহীদ দেখল রাস্তার অপর পারের একটি বাড়ির সামনে পাঁচিলে চুনকামের কাজ করছে একজন শ্রমিক। বাড়িটায় লোকজন নেই। আবার মুচকি হাসল ও। কিন্তু আর কাউকে কোন প্রশ্ন না করে বাড়ির ভিতর ঢুকল আবার।

'আপনার কি পিস্তল আছে, আজমল সাহেব?' ড্রয়িংরুমে পা দিয়েই জানতে চাইল শহীদ।

'আছে। কেন?'

'আমাকে একবার দেখাতে পারেন পিস্তলটা?'

'নিশ্চয়ই দেখাতে পারি।' উঠে দাঁড়াল আজমল রব্বানী।

খানিক পরই ফিরে এল সে শুকনো মুখে। বলল, 'মি. শহীদ, আমার পিস্তলটা আয়রন সেফে নেই! কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে ওটা।'

খানিক পর আবার ডলির কামরায় ঢুকল শহীদ। আবার ও প্রশ্ন করল, 'নওশেরকে কে অনুসরণ করেছিল বলুন তো?'

'বলব না।' সরাসরি জানিয়ে দিল ডলি।

অবাক হলো শহীদ, 'বলবেন না? কেন? আপনি নিজেই তো···।'

'ভেবেছিলাম বলব। কিন্তু এখন ঠিক করেছি বলব না। প্রাণের ওপর আমার খুব মায়া, শহীদ সাহেব। আমি মরতে চাই না এত তাড়াতাড়ি।'

শহীদ বলল, 'তারমানে আপনি ভয় পেয়েছেন। একটু আগে যে লোকটা গুলি করেছে তাকে আপনি চিনতে পেরেছেন। এই লোকটাই নওশেরকে অনুসরণ করেছিল, তাই না?'

ডলি কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'কোন প্রশ্ন করবেন না আমাকে, শহীদ সাহেব। আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।'

বাড়ি ফিরে শহীদ দেখল ড্রয়িংরুমে মি. সিম্পসন এবং কামাল বসে আছে। লীনা

ওদের দুজনের সামনে চা নাস্তার ট্রে নামিয়ে রাখছে। মহুয়াকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কামাল মুচকি মুচকি হাসছে কেন জানি। শহীদকে দেখে মুছে গেল তার মুখের হাসি, 'কোথায় গিয়েছিলি রে?'

মৃদু হেসে শহীদ বসল কামাল এবং মি. সিম্পসনের মুখোমুখি, 'তোর মহুয়াদি বলেনি ডা. মিজান চৌধুরীর স্ত্রী আজ সকালে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন?'

'কই, না তো!' মহুয়াদি বসতে বলে ছুটে চলে গেল নতুন কেনা শাড়ি এনে দেখাবে বলে।

'এখনও আসছে না, প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল। তা কেন এসেছিলেন রে ভদ্রমহিলা?'

শহীদ বলল, 'কেন আবার, তার নিখোঁজ স্বামী এবং ছেলেকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে। মিসেস মিজান আবার তোর মহুয়াদির এক বান্ধবীর খালা। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে আমার কাছে এসেছেন। ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।'

কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়াল শহীদ, 'বস তোরা। কাপড় ছেড়ে আসি।'

শহীদ অন্দরমহলে চলে যাবার খানিক পরই মহুয়া ঢুকল। খানিক আগে মহুয়াকে যে শাড়ি পরে থাকতে দেখেছিল কামাল, মহুয়া সেই শাড়ি পরেই এসেছে, তার হাতেও কিছু নেই। কামাল অবাক হয়ে বলে উঠল, 'কি হলো মহুয়াদি, শাড়ি কই তোমার? অমন চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলে…!'

মহুয়া মুচকি মুচকি হাসছে। বলল, 'দেখোনি নতুন শাড়ি? ওমা, এ কি কথা! আমি না হয় কিছু মনে নাই করলাম, কিন্তু যে শাড়িটা দেখিয়ে গেল সে কি ভাববে বলো তো!'

কামাল মহুয়ার কথা এতটুকু বুঝতে পারল না। লীনা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে মহুয়ার কথা শুনে। মাথা নিচু করে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচল সে ওদের সামনে থেকে।

কামাল বলল, 'হেঁয়ালি রাখো, মহুয়াদি। তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মি. সিম্পসন উপভোগ করছিলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'আমি কিন্তু নতুন শাড়িটা দেখেছি।'

মহুয়া হতাশভাবে বলল, 'না, তোমার চোখ থাকতেও তুমি অন্ধ, ভাই। জলজ্যান্ত একটা মানুষ, সে আবার তোমার ইয়ে, নতুন শাড়ি পরে এল, এসে আবার চলেও গেল অথচ তুমি লক্ষ্য করলে না? ছি ছি ছি! কি ভাববে বলো তো মেয়েটা? যাই, কান্না থামাবার চেষ্টা করি। বেচারী নিশ্চয়ই বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মনের দুঃখে…!'

কামাল এতক্ষণে বুঝতে পারল। লজ্জা পেল ও। সত্যি, বড় ভুল হয়ে গেছে। লীনা যে একটা নতুন শাড়ি পরে এসেছিল তা সে লক্ষ্য করলেও মনোযোগ দেয়নি। ওর মনোযোগ ছিল লীনার মুখের দিকে। আজ বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে লীনাকে।

'মহুয়াদি! দাঁড়াও, শোনো আমার কথা, যেয়ো না···।'

কামালের কথা শেষ হবার আগেই ড্রয়িংরুমে ঢুকল শহীদ। বলল, 'কি রে, অমন চেঁচাচ্ছিস কেন?'

মহুয়া কামালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ঘাড় ফিরিয়ে নিল। চলে গেল সে। শহীদের উদ্দেশে কামাল নিচু গলায় বলল, 'না, কিচ্ছু না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ইতিমধ্যে কিছু জানতে পেরেছ, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'অনেক কথা জানা গেছে। কিন্তু মিজান চৌধুরী বা তার ছেলের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'কি জানতে পেরেছিস তাহলে?' জানতে চাইল কামাল।

শহীদ বলল, 'মিসেস চৌধুরী আমাকে এসে বললেন আজ সকাল থেকে সাত-আটজন লোক আলাদা আলাদা ভাবে তার স্বামীর খোঁজে বাড়িতে আসে। লোকগুলো নাকি সাধারণ ভদ্রলোক নয়। চেহারাগুলো যেন কেমন। কথাটা শুনে ওদের বাড়িতে গেলাম। ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর আবার একজন মিজান চৌধুরীর খোঁজে এল। দেখা করলাম তার সাথে। দেখেই চিনলাম। কুখ্যাত গুণ্ডা। আমাকে দেখেই পালাচ্ছিল—চেনে কিনা। ভয় করে যমের মত। ব্যাটাকে পাকড়াও করলাম। ভয় দেখাতেই গড় গড় করে বলে দিল বহু কথা। মিজান চৌধুরী বেশ কিছুদিন ধরে মেলামেশা করছে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-অপরাধীদের সাথে। ওদেরও তো চিকিৎসার দরকার হয়। রোজই তো দু'চারজন গুলি খাচ্ছে। মিজান চৌধুরী ওদের চিকিৎসা করেন মোটা টাকার বিনিময়ে। যাকগে, কথায় কথায় জানলাম নওশের আবদুল্লা নামে কুখ্যাত একজন ব্ল্যাকমেলার গতকাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে বেরিয়ে গেল নওশের আবদুল্লার সাথে অবৈধ সম্পর্ক আছে আজমল রব্বানীর যুবতী স্ত্রী ডলির। গেলাম ডলির কাছে। অনেক কথা জানা গেল। কিন্তু আসল কথাটা জানার আগেই কে যেন গুলি করল ডলিকে লক্ষ্য করে। গুলিটা ওর গায়ে লাগেনি, কিন্তু ভয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেল ডলির। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না আর।'

'বলিস কি! চিনতে পেরেছিস?'

'ঠিক চিনতে পারিনি। তবে অনুমান করতে পেরেছি সে কে হতে পারে। যাকগে, সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানিস?'

'কি?'

'কুয়াশার একজন অনুচরকে দেখলাম। মান্নান। ছদ্মবেশ নিয়ে আজমল রব্বানীর বাড়ির সামনে ভিক্ষা করছে। রাসেলকেও দেখলাম। রাসেলও সম্ভবত নজর রাখছে

লোকটার উপর।'

মি সিম্পসন বললেন, 'কেমন জটিল হয়ে উঠছে সবটা ব্যাপার, কামাল! আজমল রব্বানীর বাড়ির ওপর নজর রাখছে কুয়াশা। কারণ কি?'

কামাল বলে উঠল, 'কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে।'

শহীদ বলল, 'তোরা কতদূর এগিয়েছিস, কামাল। কুচবিহারীর খুনী কে?'

ম্লান গলায় কামাল বলল, 'সকালে মি. সিম্পসনের সাথে গল্প করতে গিয়ে জড়িয়ে গেছি আমি। হাবুডুবু খাচ্ছি এখন, শহীদ। এসেছি তোর বুদ্ধি নিতে। একটা উপায় বাতলে দে। কেসটা বড়ই জটিল মনে হচ্ছে।'

শহীদ মুচকি হাসল। বলল, 'কেসটা আমার কাছেও কম জটিল মনে হচ্ছে না। এখনও সময় হয়নি কিছু বলার। সময় হলে বলব। ততক্ষণ আমাদের আলাদা ভাবে কাজ করাই ভাল মনে করছি। ভাল কথা, কুচবিহারীর পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কি হলো, কামাল?'

'গুলি করে খুন করা হয়েছে তাকে। তারপর ছোরা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তার মুখের চেহারা। এটা একটা রহস্য, তাই না?'

চিন্তিত দেখাল কামালকে।

শহীদ বলল, 'কোন রহস্যই স্থায়ী রহস্য হয়ে থাকতে পারে না। যথাসময়ে সব রহস্যের মীমাংসা হবে। ধৈর্য ধরে কাজ করে যা।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজে মোড়া একটা বুলেটের খোল বের করল শহীদ। সেটা মি. সিম্পসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল আবার, 'এটা আজমল রব্বানীর বাড়িতে ডলিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখবেন। সম্ভবত ·৩২ এটা। কুচবিহারীকে যে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে এটাও সেই পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য কথার কথা বলছি, কোন তথ্য পাইনি এখনও। একই পিস্তল থেকে যদি গুলি দুটো ছোঁড়া হয়ে থাকে তাহলে অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে কেসটা।'

কামালের দিকে ফিরল শহীদ, 'ভাল কথা, একটা ব্যাপার তোকে বলা হয়নি, কামাল। আজমল রব্বানীর পিস্তলটা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা নাকি চুরি গেছে। অন্তত সেকথাই জানানো হয়েছে আমাকে।'

দুই

জমে উঠেছে আজমল রব্বানীর জলসাঘরে বাঈজীদের নাচ। নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ, তবলার আওয়াজ আর সোমরস ভরা পানপাত্রের টুংটাং ধ্বনি, তার সাথে ফিরোজা বাঈয়ের মিষ্টি সুরেলা হাসি—সব মিলিয়ে বড় ভাল লাগছে পরিবেশটা আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারের।

'বেশি খাবেন না আজ! মনে আছে তো, একজন মেহমান আসছেন

খানিকক্ষণের মধ্যে?'

ঢুলুঢুলু চোখে কথাটা বলল আজমল রব্বানী। ঢক ঢক করে আধগ্লাস বিলিতি মদ গিলল সে। শরীফ চাকলাদার পকেট থেকে একশো টাকার একটি নোট বের করে ছুঁড়ে দিল ফিরোজা বাঈয়ের দিকে। তারপর তাকাল পাশে বসা যুবতীটির দিকে। বলল, 'ঢালো, আরও ঢালো!'

শরীফ চাকলাদারের ভাবভঙ্গি দেখে যাই মনে হোক, মদ সে তুলনামূলকভাবে কমই খাচ্ছে। সম্মানীয় মেহমানের কথা সে ভোলেনি। সোমনাথন আগাট থাপার সাথে আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবার কথা। বার্মার কোটিপতি আগাট থাপা। সহজ ব্যাপার নয়।

যুবতীটি সোমরস ভরা গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতে শরীফ চাকলাদার সেটা ধরল। কিন্তু গ্লাসে চুমুক না দিয়ে আজমল রব্বানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'একটা কথা বেমালুম ভুলে গেছেন দেখছি।'

আজমল রব্বানীর হাসি নিভে গেল, 'তারমানে? কিসের কথা বলছেন আপনি?'

শরীফ চাকলাদারকে গম্ভীর দেখাল। নিচু গলায় সে শুধু একটি নাম উচ্চারণ করল, 'নওশের।'

'নওশের আবদুল্লা? দূর-দূর, মরা মানুষের কথা মনে রেখে কি লাভ!'

কথাগুলো বলে হাসল আজমল রব্বানী। ফিরোজা বাঈয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

শরীফ চাকলাদার কিন্তু প্রসঙ্গটা চাপা পড়তে দিল না। বলল, 'নওশের মরে গেছে কে বলল আপনাকে? আপনি তার লাশ দেখেছেন? তাছাড়া তাকে খুন করলই বা কে বলুন তো?'

'দূর, আপনি বড় বেরসিক। একটা খুনীর কথা আলাপ করার আর সময় পেলেন না? আরে, নওশের আবদুল্লাকে খুন করার লোকের অভাব হয় নাকি? ওদেরকে খুন করার হাজার হাজার লোক আছে। খুন-খারাবী করে বেড়ায় যারা তারা নিজেরাও খুন হয়। আর লাশ দেখার কথা বলছেন? লাশ দেখার কি দরকার? এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাটা খতম হয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে ভেবেছেন রেহাই দিত আমাদেরকে? পাওনা আড়াই লাখ টাকা টাকরায় আঙুল দিয়ে আদায় করে নিয়ে যেত। একহপ্তা কেটে গেল অথচ···।'

এমন সময় পাশের কামরা থেকে ভেসে এল ফোনের শব্দ। আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার পরস্পরের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

উঠে দাঁড়াল আজমল রব্বানী। বেরিয়ে গেল সে জলসাঘর থেকে। শরীফ চাকলাদার তার পানপাত্র তুলল ঠোঁটের কাছে।

পাঁচ মিনিট পরই আজমল রব্বানী জলসাঘরে ফিরে এল বিশাল দেহী এক বার্মীজ ব্যবসায়ীকে সঙ্গে নিয়ে। শরীফ চাকলাদার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিল,

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'আসুন, আসুন মি. থাপা।'

লম্বা চওড়া বার্মীজ ব্যবসায়ী আগাট থাপা সহাস্যে জলসাঘরে পা দিয়েই হাত বাড়িয়ে দিল। শরীফ চাকলাদার করমর্দন করল। আগাট থাপার হাতে কালো একটা অ্যাটাচী কেস। সেটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে ভারি গলায় বলল, 'ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার সময় নাচ-গান-ফূর্তি আমি পছন্দ করি না।'

আজমল রব্বানী সাথে সাথে বলে উঠল, 'আলবত্! আলবত্! চলুন, মি. থাপা, আমরা পাশের কামরায় গিয়ে বসি।'

পাশের কামরায় এসে বসল ওরা তিনজন। আগাট থাপা পকেট থেকে দামী সিগার বের করে অফার করল। তিনজন তিনটে চুরুট ধরাল। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল কামরার ভিতর। আগাট থাপা উরুর উপর কালো অ্যাটাচী কেসটা রেখে সহাস্যে বলল, 'কুচবিহারীজীর সাথে বিশদ আলোচনা হয়েছিল আমার। কিন্তু আপনারা বলছেন তিনি নাকি আমার সম্পর্কে কোন কথা আপনাদেরকে বলেননি। এ কেমন কথা? আপনারাও এ ব্যবসায় অংশীদার। আপনাদেরকে না জানাবার কারণ কি? ভদ্রলোক মারা গেছেন, মরা মানুষকে অভিযুক্ত করা উচিত নয়···।'

শরীফ চাকলাদার বলে উঠল, 'যে মরে গেছে তার কথা না তোলাই ভাল।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল আগাট থাপা। বলল, 'ঠিক। নতুন করে আলোচনা করব আমরা। ফোনে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনারা যে জেনুইন পার্টি তা আমি জেনেছি। আমিও যে জেনুইন পার্টি কুচবিহারীজী জানলেও আপনারা জানেন না। আপনাদেরকে আমি কিছু উপহার দিতে চাই। উপহারগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কি।'

কথাগুলো বলে আগাট থাপা তার অ্যাটাচী কেস খুলে ভিতর থেকে সোনার দুটো ভারি চাকা বের করল। সেদুটো টেবিলের ওপর রেখে আবার অ্যাটাচী কেসের ভিতর হাত ভরল সে।

একে একে অ্যাটাচী কেস থেকে বের হলো গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি, সেলোফিন পেপারে মোড়া আফিম, কোকেন, দু'টুকরো ডায়মণ্ড, অন্যান্য দামী পাথর এক টুকরো করে, সোনার নিব কয়েকটা, এক কৌটা কৃত্রিম রেডিয়াম, শিশিতে ভরা কয়েক প্রকার দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক দ্রব্য, এক কৌটা খাঁটি জাফরান, দামী আতর, বিদেশে প্রস্তুত সেন্ট, আমদানি করা পশমের দু'গজের একটা টুকরো, উলের একটা বল প্রভৃতি আরও বহুরকম জিনিস। বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই।

আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার গভীর মনোযোগের সাথে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করতে করতে পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে থেকে থেকে।

আগাট থাপা বলল, 'এগুলো আপনাদেরকে আমি দিলাম উপহার হিসেবে। এই সামান্য পরিমাণ উপহার দেয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু সঙ্গে করে বেশি কিছু আমি

আনিনি। যা এনেছিলাম তা-ও কুচবিহারীজীকে দিয়েছিলাম। এগুলো পড়ে ছিল অ্যাটাচী কেসে। ভাল করে সব পরীক্ষা করে নিন। এগুলোই আমার নমুনা। আপনাদের সাথে যদি ব্যবসা হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে এইসব জিনিসই পাঠাব আমি।'

লোভে চকচক করছে আজমল রব্বানীর চোখ দুটো। আনন্দে আটখানা সে, কথা বলতেই পারছে না। শরীফ চাকলাদার সহাস্যে বলে উঠল, 'আপনি যে জেনুইন পার্টি তাতে আর আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আপনার জিনিস-পত্রের নমুনা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। এদেশে এসবের প্রচণ্ড চাহিদা আছে। মাল পৌঁছুতে যা দেরি, সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যাবে।'

'খুব ভাল কথা। এবার আপনারা বলুন, এইসব জিনিসের বদলে আপনারা কি কি পাঠাতে পারবেন।'

'আপনি কি ধরনের জিনিস চান?'

'চাল চাই। চাল, ডাল, পাট, সরিষার তৈল, ডিম, বিদেশী বেবী ফুড, নিউজপ্রিন্ট, চা…।'

'পাবেন,' বলে উঠল আজমল রব্বানী।

আগাট থাপা বলল, 'আর একটা কথা। যে-কোন জিনিস যে-কোন পরিমাণ চান, পাবেন। কিন্তু লোকজনের বড় অভাব আমার। লোকজনের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাদেরকে। আপনাদেরই লোক আমার কাছ থেকে মাল নিয়ে আসবে। আবার আপনাদের লোকই এখান থেকে আপনাদের মাল নিয়ে বর্ডারের ওপারে দিয়ে আসবে। বর্ডারের ওপারে অবশ্য আমার লোক থাকবে। হিন্দুস্থান বা বার্মা যে-কোন দেশে মাল পাঠাতে পারেন। দু'দেশেই ব্যবসা আছে আমার।'

'আপনার লোকজনের কি এতই অভাব?'

'খুবই অভাব। বিশ্বস্ত লোক পাওয়া বড় কঠিন। আপনারা লোকের ব্যবস্থা করবেন ঠিক, কিন্তু যাবতীয় খরচ বহন করব আমিই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

প্রকাণ্ড মুখটা হাসিতে ভরে তুলে আগাট থাপা বলল, 'আলাপের তাহলে আর বাকি রইল কি? ও, হ্যাঁ, আপনারা মাল আনা-নেয়ার ব্যাপারে কি রকম সতর্কতা অবলম্বন করেন? ভারী মালগুলো তো বর্ডার ক্রস করে আসবে ট্রাকে, নিয়মিত ব্যবস্থার অধীনে। মাসিক টাকা দিতে হয় বিভিন্ন বাহিনীর বিভিন্ন অফিসারকে। কিন্তু হালকা এবং অল্প পরিমাণের জিনিসগুলো, যেমন সোনা, রেডিয়াম…!'

শরীফ চাকলাদার হাসতে লাগল।

আজমল রব্বানী বলল, 'সে ব্যাপারে আপনি কিছু ভাববেন না, মি. থাপা। হালকা মাল আনা-নেয়ার ব্যাপারে আমরা বিশেষজ্ঞ।'

'তাই নাকি?'

আজমল রব্বানী বলল, 'আজই তো ৬ মে! রাত বারোটার ফ্লাইটে মাল আসছে আমাদের। মাল নিয়ে আসছে সাতজন লোক। তাদের সাথে ব্যাগ অ্যাণ্ড ব্যাগেজ থাকবে । কিন্তু আপনি মাল খুঁজে পাবেন না। মাল আনার ব্যাপারে আমরা অভিনব একটা উপায় বের করেছি। লোকগুলোকে সার্চ করে দেখতে পারেন। পাবেন না মালের হদিস। অথচ তাদের সাথেই আসছে চোদ্দ পাউণ্ড সোনা।'

আগাট থাপাকে সন্তুষ্ট দেখাল। বলল, 'ব্যস, ব্যস। আর বলতে হবে না। তাহলে সব ব্যাপারেই আলোচনা হয়ে গেল। খুঁটিনাটি কয়েকটা ব্যাপার আলোচনা পরে করলেও চলবে। আজকের মত তাহলে আমাকে বিদায় দিন?'

'সে কি! এখুনি উঠবেন? আপনাকে আমরা খাতির করারই সুযোগ পেলাম না…।'

বাধা দিয়ে আগাট থাপা বলল, 'খাতির করার ব্যবস্থা আর একদিন করবেন, শরীফ সাহেব। এখন তো আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। যখন খুশি ডাকবেন।'

'ভালকথা, কোথায় উঠেছেন আপনি?'

আগাট থাপা হাসল। বলল, 'উঠেছিলাম তো কন্টিনেন্টালে। তবে প্রতিদিনই হোটেল বদলাচ্ছি। কারও নজরে পড়তে চাই না, বোঝেনই তো। এক হোটেলে আমি একদিনের বেশি থাকি না। আজ আছি ইন্টারন্যাশনালে। আগামীকাল সকালে কোন হোটেলে উঠব এখনও ঠিক করিনি।'

'তাহলে আপনার সাথে যোগাযোগ করার উপায়?' জানতে চাইল শরীফ চাকলাদার। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

আগাট থাপা বলল, 'আমিই সময় মত যোগাযোগ করব, শরীফ সাহেব। চিন্তা করবেন না।'

উঠে দাঁড়াল আগাট থাপা। আজমল রব্বানী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

একই দিনের ঘটনা।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা বাজে। ঢাকার আকাশে ভারি মেঘের ঘনঘটা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে নামতে পারে বৃষ্টি। থমথম করছে চারদিক।

ঢাকা এয়ারপোর্ট। লাউঞ্জে লোকজন নেই বললেই চলে। আজ রাতের শেষ বিমানটা এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে রানওয়েতে। আট-দশজন লোক লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে যাত্রীদের মধ্যে নিজেদের লোককে রিসিভ করার জন্যে। তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে রেইনকোট পরা শরীফ চাকলাদারকেও। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে সে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বিমান এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে। যাত্রীরা নামছে সিঁড়ি বেয়ে। দেশী-বিদেশী বহু যাত্রী। কাস্টমস অফিসাররা ব্যাগ অ্যাণ্ড ব্যাগেজ

চেক করে ছেড়ে দিচ্ছে যাত্রীদেরকে। যাত্রীরা দ্রুত হাঁটছে লাউঞ্জের দিকে। মাথার উপর ভারি মেঘ। বৃষ্টি এল বলে।

লাউঞ্জের ভিতর হঠাৎ ঢুকতে দেখা গেল হ্যাট পরিহিত একজন রোগা-পটকা লোককে। হ্যাটটা বিশেষ ভঙ্গিতে মাথায় দেয়ায় লোকটার মুখের বেশির ভাগই ঢাকা পড়ে গেছে। প্রকাণ্ড পাইপ তার ঠোঁটে। কুল কুল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে পাইপ থেকে। ঢোলা কালো প্যান্টের সাথে লোকটা নীল একটা শার্ট পরেছে। তার বাঁ হাতে একটা ছড়ি।

লাউঞ্জে ঢুকে লোকটা উপস্থিত লোকজনদেরকে ভাল করে দেখে নিল। সবশেষে তার চোখ গিয়ে পড়ল জানালার সামনে দণ্ডায়মান শরীফ চাকলাদারের দিকে। মুচকি হাসল সে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আপন মনে হাতের ছড়িটা খেলাচ্ছলে ঘোরাতে ঘোরাতে লাউঞ্জের একদিক থেকে আর একদিক অবধি পায়চারি করতে লাগল।

যাত্রী অনেকেই লাউঞ্জে ঢুকল, অনেকেই ঢুকল না। শরীফ চাকলাদার একসময় জানালার কাছ থেকে সরে এল। লাউঞ্জের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সে। প্রবেশ পথের কাছে সে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই দেখা গেল সাতজন বিভিন্ন পোশাক পরা বিভিন্ন চেহারার লোক একসাথে লাউঞ্জে ঢুকছে। লোকগুলো কাকে যেন খুঁজছে। শরীফ চাকলাদার তাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল সেই হ্যাট পরা পাইপধারী রোগা-পটকা লোকটাকে। লোকটা শরীফ চাকলাদারের পথরোধ করে দাঁড়াল। বিরক্ত হয়ে শরীফ চাকলাদার থমকে দাঁড়াল। রোগা-পটকা লোকটি মধুর ভঙ্গিতে হাসল, বলল, 'এই যে, মিস্টার। হামাকে চিনিটে পারিটেছেন?'

শরীফ চাকলাদারের বিরক্তি চরমে উঠল। 'কি জ্বালা!' বলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলো সে। কিন্তু ডি. কস্টা তার ছড়িটা বাড়িয়ে দিল যথাসময়ে।

ছড়ির সাথে পা জড়িয়ে গেল শরীফ চাকলাদারের। চোখের পলকে আছাড় খেয়ে পড়ল সে লাউঞ্জের পাকা মেঝেতে। 'বাবারে, গেছি!' বলে আর্তনাদ করে উঠল শরীফ চাকলাদার।

'ভেরি সরি! ভেরি সরি! কোঠায় চোট পাইলেন, জেন্টেলম্যান?'

কথাগুলো বলতে বলতে হাঁটুমুড়ে বসল ডি. কস্টা চাকলাদারের ভূপাতিত দেহের পাশে। হাঁটুতে এবং কনুইয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়া সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে অশ্লীল একটা খিস্তি দিতে উদ্যত হলো শরীফ চাকলাদার। কিন্তু ডি. কস্টা এক গাল হেসে বলে উঠল, 'ঠাক্, মিস্টার, ঠাক্। কষ্ট করিয়া লাভ নাই টোমার, কঠা যা বলিটে চান টাহা বাড়িটে গিয়া বলিবেন। গুড বাই···!'

কথাগুলো বলতে বলতে ডি. কস্টা তার ছড়ির আগাটা চেপে ধরল শরীফ

চাকলাদারের পায়ের বুড়ো আঙুলে। ছড়ির আঘাতে অতি ক্ষুদ্র যে সূচটা ছিল সেটা বুড়ো আঙুলের মাংসে ঢুকে গেল। ছড়িটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডি. কস্টা। অসহায় ভঙ্গিতে বলে উঠল সে, 'কান্ট্ হেল্প্। আপাতত ভদ্দরলোকটি সেন্স্ হারাইয়াছেন!'

লাউঞ্জে যে সাতজন লোক একটু আগে প্রবেশ করেছিল তারা তাদের পরিচিত লোককে দেখতে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে দু'একটা কথা বলে ঘুরে দাঁড়াল লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার সাথে সাথে তারা কালো আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় এক পুরুষের মুখোমুখি হলো।

'আপনারা কুচবিহারীর খোঁজ করছেন, তাই না?'

ভরাট গলায় কালো আলখাল্লা পরিহিত পুরুষ প্রশ্ন করল। লোকগুলো তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল তারা। আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ অভয় দিয়ে হাসল, বলল, 'আমি কুচবিহারীজীরই লোক। আপনারা আমার সাথে চলুন।'

সাতজনের একজন তার পাশের সঙ্গীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমি হলপ করে বলতে পারি এ লোক স্বয়ং কুয়াশা!' অপর একজন দীর্ঘকায় কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না। কে আপনি?'

কুয়াশা হাসল শব্দ করে। বলল, 'ঠাট্টা করবেন না। আপনারা আমার সব কথাই জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারছেন।'

'আমরা আপনাকে চিনি না। সুতরাং আপনার সাথে আমরা যাচ্ছি না···।'

কুয়াশার হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। সে শুধু ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'কলিম, ব্যবস্থা করো।'

চোখের পলকে কুয়াশার দুপাশে এসে দাঁড়াল চারজন লোক। তাদের মধ্যে একজন কলিম। বাকি তিনজনও কুয়াশার ভক্ত অনুচর। চারজনের হাতেই অস্বাভাবিক লম্বা নলওয়ালা পিস্তল। প্রত্যেকের মুখে মুখোশ।

লোক সাতজন অবস্থা বেগতিক দেখে পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে শোনা গেল ডি. কস্টার খটমটে ভাষা, 'এভরি ওয়ান হেডের উপর হ্যাণ্ড টুলুন। টা না হইলে হামি গোলি চালায়গা!'

দেখা গেল ডি. কস্টাও মুখোশ পরে নিয়েছে কোন্ ফাঁকে। লাউঞ্জে যে দশ-পনেরোজন লোক ছিল তাদের মধ্যে ছয় জনই ডি. কস্টার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও মুখোশ ব্যবহার করছে। মুখোশগুলো রাবারের হলেও চোখের জায়গায় স্বচ্ছ কাচ লাগানো।

কাণ্ড দেখে এক মহিলা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারালেন। ডি. কস্টা সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল।

কুয়াশাকে দেখা যাচ্ছে না। লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেছে সে। কলিম তার পিস্তল উঁচিয়ে লোক সাতজনকে নির্দেশ দিল, 'এবার কথা শুনবেন তো?'

এমন সময় কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা পুলিসকে দেখা গেল লাউঞ্জের প্রবেশ পথে। ডি.কস্টা ইউনিফর্ম দেখা মাত্র গা ঢাকা দেবার জন্যে মাথা নিচু করে বসে পড়ার উপক্রম করছিল। এমন সময় গর্জে উঠল কলিমের হাতে অস্বাভাবিক লম্বা ব্যারেলের পিস্তল।

ডি. কস্টার হাতের পিস্তলও গর্জে উঠল! গর্জে উঠল পর পর আরও ক'জনের হাতের পিস্তল। চোখের পলকে কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলল লাউঞ্জের সবাইকে।

ঘন কালো ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ কিছু কিছু শব্দ শোনা গেল। একটু পর সব স্থির হয়ে গেল। আরও খানিক পর লাউঞ্জের বাইরে ভিড় জমতে শুরু করল। এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা ছুটোছুটি করতে লাগল। ফোন করা হলো ফায়ার ব্রিগেডে।

দমকল বাহিনীর গাড়ি পৌঁছুবার আগেই প্রচণ্ড বাতাস এসে হামলা করল। লাউঞ্জের ভিতর থেকে সব কালো ধোঁয়া উড়ে যেতে লোকজন ভিতরে ঢুকল। কলিম, ডি.কস্টা, কুয়াশার অন্যান্য অনুচর বা সেই সাতজন লোককে লাউঞ্জের ভিতর দেখা গেল না। শরীফ চাকলাদার, অন্য চার-পাঁচজন ভদ্রলোক, একজন মহিলা এবং ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিসকে দেখা গেল প্রাণহীন লাশের মত লাউঞ্জের মেঝেতে পড়ে আছে।

ডাক্তার ডাকার জন্যে ছুটল লোক। আধঘণ্টা পর ডাক্তার এসে অজ্ঞান সবগুলো লোককে পরীক্ষা করে চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করায় জ্ঞান হারিয়েছে এরা সবাই। তবে ভয়ের কিছু নেই। সবাই জ্ঞান ফিরে পাবে।'

তিন

জলসাঘরে এখন আর নাচ-গান হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না নূপুরের ধ্বনি। দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ উঠছে আজমল রব্বানীর নাক দিয়ে। খালি পায়ে প্রশস্ত মেঝের উপর সবেগে পায়চারি করছে সে। শরীফ চাকলাদার গম্ভীর মুখে বসে আছে একটি চেয়ারে। বিধ্বস্ত, পরাজিত দেখাচ্ছে তাকেও।

'আমি এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি নই!' চাপা গলায় গর্জে উঠল আজমল রব্বানী।

শরীফ চাকলাদার কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি তাহলে কি বিশ্বাস করেন?'

'আমার বিশ্বাস এ-কাজ সেই বার্মীজের! আগাট থাপাই লোক লাগিয়ে আমাদের সাতজন লোককে হাইজ্যাক করেছে। নওশের আবদুল্লা ওদের আসার

খবর জানতেই পারে না। আমর দুজন ছাড়া খবরটা জানত কুচবিহারী। সে নেই, তার প্রশ্ন ওঠে না। আর একজনকে জানানো হয়েছে, সে হলো আগাট থাপা। আমি হলপ্ করে বলতে পারি এ-কাজ থাপা করিয়েছে!'

'তারমানে থাপা জেনুইন পার্টি না?'

আজমল রব্বানী বলল, 'এখন তাই প্রমাণ হচ্ছে। লোকটা এক নম্বরের চিট।'

শরীফ চাকলাদার বলল, 'থাপাকে আপনিই কথাটা জানিয়েছিলেন?'

মাথার চুল টানতে টানতে আজমল রব্বানী বলল, 'তখন কি আর জানতাম···!'

এদিকে ডলির কামরায় টেলিফোন বাজছে। গভীর রাত, প্রায় দুটো বাজে। ঘুম ভেঙে গেল ডলির। কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে খুব বিরক্ত হলো সে। ফোন বেজেই চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ বিছানা ছেড়ে উঠল না ডলি! কিন্তু হঠাৎ নওশের আবদুল্লার কথা মনে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে। গায়ের শাড়ি-ব্লাউজ ঠিকঠাক না করেই উন্মাদিনীর মত খাট থেকে নেমে এলোচুলে ছুটল কামরার এক কোণে একটা টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে।

ক্রেডল থেকে রিসিভারটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দম বন্ধ করে ডলি বলল, 'হ্যালো?'

'ঘুমাচ্ছিলে বুঝি, ডলি? কেমন আছ? চিনতে পারছ তো আমাকে?'

অশরীরী আতঙ্কে ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল ডলির সর্বশরীর এক মুহূর্তে। কাঁপা গলা দিয়ে একটা মাত্র শব্দ বের হলো, 'কে!'

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় পেলে নাকি, ডলি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আরে, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ভালই আছি। তোমার খবর কি?'

গলা শুকিয়ে তক্তা হয়ে গেছে ডলির। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। এ কি করে সম্ভব!

'কি হলো, ডলি? কথা বলছ না যে?'

ডলি কোন রকমে প্রশ্ন করে, 'কোথা থেকে বলছ তুমি?'

অপরপ্রান্ত থেকে আবার জোরাল হাসির শব্দ ভেসে আসে।

ডলি ভয়ে ভয়ে আবছা অন্ধকারে ঢাকা রুমের চারদিকে তাকায়। ইচ্ছা হয় রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দেয়; কিন্তু সে শক্তিও নেই তার। হাত-পা অবশ হয়ে গেছে ভয়ে।

'ভয় পেয়ো না, ডলি। শীঘ্রি তোমার সাথে দেখা হবে। পথের কাঁটাগুলো দূর করার জন্যে আপাতত গা ঢাকা দিয়েছি, বুঝলে। পথের কাঁটা দূর হোক, তখন আর তোমার আমার মিলনে কোনও বাধা থাকবে না। তুমিই হবে আমার রাণী, আমার দেবী। তোমাকে আমি কতটুকু ভালবাসি তা তো তোমার অজানা নয়! তোমার

উপযুক্ত আসন এতদিন দিতে পারিনি বলে মনে আমার শান্তি ছিল না। তবে, আর দেরি নেই। খুব শীঘ্রিই তোমাকে আমি নিজের ঘরে নেব, হৃদয়াসনে বসাব সসম্মানে।'

'কোথায় আছো তুমি…?'

ডলিকে থামিয়ে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে রহস্যময় লোকটি বলে চলে নিজের কথা, 'তোমাকে নিয়ে আমি অন্য কোন দেশে চলে যাব, ডলি। কেউ থাকবে না সেখানে, শুধু তুমি আর আমি। টাকা পয়সার কোন অভাব নেই আমার, পায়ের ওপর পা দিয়ে সারাটা জীবন বসে বসে খাব আর ফুর্তি করব। আমাদের সুখে, আমাদের আনন্দে কেউ বাধা দিতে যাবে না। জীবনটা হবে বড় মধুর। কিন্তু সেই মধুর দিনের স্বাদ পেতে হলে বুদ্ধি খরচ করে অনেকগুলো কাজ করতে হবে আমাকে। সে ব্যাপারে তুমি ভেব না। সবই করতে পারব আমি। তুমি শুধু কয়েকটা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। পারবে তো, ডলি?'

ডলি ইতিমধ্যে খানিকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে বলল, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি…!'

অপরপ্রান্ত থেকে বলল লোকটা, 'মন দিয়ে শোনো, ডলি। বুঝিয়ে বলছি। আজমল রব্বানী আর শরীফ চাকলাদার, এরা দুজন হলো আমার আর তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাদের সুখী ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় দুটো কাঁটা। এই কাঁটা দুটোকে উপড়ে ফেলতে হবে, ডলি।'

'কিন্তু…!'

বাধা দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে বলল, 'ভয় পেলে চলবে না, ডলি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে অটুট মনোবল নিয়ে কাজটা করতে হবে। সব কাজ আমিই করছি, এ কাজটাও আমিই করতাম। কিন্তু এ কাজটা আপাতত আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওদের কাছাকাছি থাকার সুযোগ রয়েছে তোমার। কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না। সন্দেহ করলেই বা কি…।'

'কি করতে হবে আমাকে…?' আতঙ্কে কাঁপছে ডলি।

'ওদের দুজনকে খুন করতে হবে। কাজটা খুবই সহজ। জলসাঘরে রোজ সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসর বসে ওদের। দেয়াল-আলমারিতে থাকে মদের বোতল। সবগুলো বোতলে মিশিয়ে রাখো বিষ। ব্যস, এরপর তোমার দায়িত্ব শেষ। কাজটা খুব সহজ, করলেই করা হয়। ওরা মদ খেলেই মারা যাবে। কিন্তু তাতে তোমার কোন ভয় নেই। ওরা মারা গেছে একথা জানার পরই তুমি পালিয়ে আসবে বাড়ি ছেড়ে। আমি তোমাকে…।'

'কিন্তু আমি তা পারব না…' ডলি কাঁপা গলায় বলে উঠল।

'ও-কথা বলতে নেই, ডলি। তোমার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। পারব না বললে চলবে কেন, বলো? তুমি কি চাও না আমরা সুখী হই? আমাদের জীবনটা

আনন্দের হোক? পরস্পরের সাথে আমরা চিরকালের জন্যে মিলিত হই?'

'কিন্তু আমি দুর্বল একটা মেয়ে…!'

'নিজেকে দুর্বল মনে কোরো না, ডলি।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি কি পারব…আচ্ছা, ভেবে দেখার জন্যে সময় দাও আমাকে…।'

'ঠিক আছে। দু'দিন ভেবে দেখো তুমি। আমি আবার ফোন করব। কোনও চিন্তা কোরো না। আমি ভালই আছি। ছাড়ছি, প্রিয়তমা, কেমন?'

'ছাড়ো।' অস্ফুটে কথাটা বলে ক্রেডলে নামিয়ে রাখল ডলি রিসিভারটা।

ভোর চারটের সময় মিস্টার সিম্পসনের কাছ থেকে ফোন পেল কামাল।

থানায় মিসেস মিজান চৌধুরী ফোন করে জানিয়েছেন ঘণ্টাখানেক আগে ডা. মিজান চৌধুরীর চেম্বারে চুরি হয়েছে। চোর চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় কোন কিছুর সাথে ধাক্কা খায়, উল্টে পড়ে ছোট একটা টেবিল, ফলে শিশি-বোতল ভেঙে যায়। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির সকলের। মিসেস মিজান চৌধুরী এবং তার মেয়ে উজালা চেম্বারে ঢুকে দেখে চেম্বারের রাস্তার দিকের দরজা খোলা। চোর ওই পথেই এসেছিল। শিশি-বোতল ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার পর বাড়ির চাকর-বাকর 'চোর' 'চোর' করে চিৎকার করে ওঠে। ঠিক তখুনি বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা যায়। মিসেস মিজান সন্দেহ করছেন চোর কোন সাধারণ লোক নয়। গাড়ি নিয়ে যে চুরি করতে আসে সে নিশ্চয়ই অসাধারণ চোর। মিসেস মিজানের আরও সন্দেহ যে এই চুরির সাথে তাঁর স্বামী এবং ছেলের নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তবে চেম্বার থেকে কি চুরি হয়েছে তা তিনি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না।

ফোন পাবার দশ মিনিটের মধ্যে একজন ক্যামেরাম্যান ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এবং একজন পুলিস ইন্সপেক্টরকে মিজান চৌধুরীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। ইন্সপেক্টর মিসেস মিজান চৌধুরীর বক্তব্য লিখে নিয়েছেন। মিসেস মিজান তাঁকে জানিয়েছেন, খুব সম্ভব চেম্বার থেকে চুরি হয়ে গেছে দুটি জিনিস। ক্লোরোফর্ম ইঞ্জেকশন এবং তরল সায়ানায়েড পয়জন। দুটোই মারাত্মক জিনিস।

পরদিন সকালে একটি লোমহর্ষক ঘটনার খবর শুনে শিউরে উঠল সকলে। কোন কোন সংবাদ পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে খবরটা বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা হলো। বাংলাদেশ বেতারের সকাল সাতটার খবরে প্রচার করা হলো ঘটনাটা। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা শহরে, বন্দরে, গঞ্জে, গ্রামে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল নাগরিকেরা। হোটেল, রেস্তোরাঁয়, অফিসে, দোকানে, রাস্তাঘাটে, ড্রয়িংরুমে এবং রান্নাঘরে ছেলে-মেয়ে-বৃদ্ধ-যুবক সবাই খবরটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

এমনিতেই দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বিপর্যয়ের চরমে পৌঁছেছে। গুম, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ঘুষ নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে গতকালের ঘটনা।

সকাল পাঁচটায় টহলদানরত পুলিসের চোখে পড়ে প্রথমে। স্টেডিয়ামের প্রকাণ্ড গেটের কাছে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। খানিক আগে তারা সেখানে এসে দাঁড়ায়। তাদের ডিউটি শেষ হতে দেরি ছিল না। গল্প-গুজব করছিল তারা। তখনও সকাল হয়নি পুরোপুরি। দিনের আলো ক্রমশ ফুটে উঠছিল। সেই আবছা অন্ধকারেই তাদের দৃষ্টি পড়ে আউটার স্টেডিয়ামের প্রকাণ্ড সবুজ মাঠের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন লোক।

দূর থেকে শায়িত লোকগুলোকে দেখে প্রথমে কোন সন্দেহ হয়নি তাদের। কিন্তু দিনের আলো আরও উজ্জ্বল হতে তারা দেখে লোকগুলো এমনভাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে যে দূর থেকে তা বেশ একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। নিজের মধ্যে এ ব্যাপারে খানিকক্ষণ আলাপ করার পর কনস্টেবল দুজন ঠিক করে কাছাকাছি গিয়ে লোকগুলোকে দেখা দরকার। পা বাড়ায় তারা মাঠের দিকে।

তারা যতই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ততই তাদের মনে সন্দেহ এবং শঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। একেবারে কাছাকাছি না পৌঁছেই তারা বুঝতে পারে লোকগুলো নড়াচড়া করছে না। স্বাভাবিক মানুষ যেভাবে শুয়ে থাকে বা ঘুমিয়ে থাকে লোকগুলো সেভাবে শুয়ে বা ঘুমিয়ে নেই। কেউ চিৎ হয়ে শুয়েছে, কিন্তু তার একদিকের গাল ঠেকে আছে ঘাসের সাথে। নাকের ভিতর ঢুকেছে একটা ঘাসের ডগা। কেউ শুয়ে আছে যতদূর সম্ভব হাত পা ছড়িয়ে। কনস্টেবল দুজন কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই জমাট রক্তের সমুদ্র দেখতে পেল।

দূর থেকে এই জমাট রক্তকেই মনে হয়েছিল শুকনো ঘাস।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তারা অবিশ্বাস ভরা চোখ মেলে যা দেখল তা বিভীষিকাময়, লোমহর্ষক। মোট সাতজন লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে বিশৃংখলভাবে ঘাসের উপর। সাতজনেরই পরনে প্যান্ট। কিন্তু কারও গায়ে শার্ট বা গেঞ্জি নেই।

প্রত্যেককেই খুন করা হয়েছে পেট কেটে। সাতজন লোকেরই পেট চেরা। কারও কারও নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। মাছিরা এসেছে দলবেঁধে।

অকুস্থল থেকে অফিসে পৌঁছুলেন মি. সিম্পসন কামালকে নিয়ে সকাল সাতটায়। লাশকাটা ঘরে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে এসেছেন তিনি সাতটা মৃতদেহকে। ফেরার পথে একটাও কথা বলেনি কামাল। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠেছে সে।

কামালকে নিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন মি. সিম্পসন। বসল ওরা।

মি. সিম্পসন বললেন, কী সাংঘাতিক! শেষ পর্যন্ত কুয়াশা এমন জঘন্য খুন-

খারাবীতে মেতে উঠল! এতটা জঘন্য চরিত্রের লোক বলে আগে কখনও তাকে মনে হয়নি আমার। কুয়াশা যে এত নীচে নেমে যেতে পারে তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

কামাল ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।

মি. সিম্পসন আবার কথা বলে উঠলেন, 'গতরাতে কনস্টেবল দুজন কুয়াশার অনুচরদেরকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল—তাদের ভুল হয়নি!'

কামাল থমথমে গলায় বলল, 'ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। ডি.কস্টাকে আর কলিমকে তো ওরা চিনেছেই। এয়ারপোর্টের বাইরে আরও দুজন কনস্টেবল ছিল। তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা দেখেছে স্বয়ং কুয়াশাকে। সাতজন লোককে কুয়াশার অনুচররা কাঁধে করে একটা মাইক্রোবাসে তোলে। কুয়াশা নিজে মাইক্রোবাস চালিয়ে কেটে পড়ে ওখান থেকে।

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'এই লাশগুলি যে সেই সাতজনেরই তাও তো কনস্টেবল দুজন সনাক্ত করল। না, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল কামাল। রুমালের ভিতর থেকে বের হলো একটা ঘড়ি। মি. সিম্পসনের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন কিনা।'

মি. সিম্পসন ঘড়িটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। অদ্ভুত ডায়াল ঘড়িটার। পুরো একবছরের ক্যালেণ্ডার, কম্পাস, সেকেণ্ডকে ভাগ করে সময় নির্ধারণের কাঁটা ইত্যাদি সহ তিনটে হালকা রঙে তৈরি ডায়ালটা। চাবি দিতে হয় না। পানিতে আটচল্লিশ ঘণ্টা ফেলে রাখলেও ঘড়ির কোন ক্ষতি হবে না। শক প্রুফ।

'কোথায় পেলে এটা তুমি? এ তো কুয়াশার। তার নিজের তৈরি।'

'হ্যাঁ, তার নিজের তৈরি। কোথায় পেয়েছি জানেন? লাশগুলোর নিচে চাপা পড়ে ছিল।'

মি. সিম্পসন চিৎকার করে উঠলেন, 'মাই গড! যাওবা একটু সন্দেহ ছিল তাও আর রইল না। এ কাজ কুয়াশার, নো ডাউট্! কামাল, এখন আমাদের করণীয় কাজ কি?'

কামাল বলল, 'অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে কুয়াশাকে। কিন্তু তার আগে আমি শহীদের সাথে পরামর্শ করতে চাই। সব কথা ওরও জানা দরকার। কুয়াশাকে তাড়াহুড়ো করে গ্রেফতার করতে চাই না আমি। আঁটঘাট বেঁধে আগে তার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো সংগ্রহ করতে চাই। তারপর গ্রেফতার। গ্রেফতার করে প্রমাণের অভাবে আবার তাকে ছেড়ে দিতে হলে লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না।'

মি. সিম্পসন খুশি হয়ে উঠলেন, 'আমিও তাই চাই, কামাল। শহীদের সাথে পরামর্শ করবে ভাল কথা। কিন্তু সুযোগ পেলে রাসেলের সাথেও পরামর্শ করতে পারো এ ব্যাপারে। ছেলেটা বুদ্ধিমান।'

*

গত কয়েকদিন থেকেই ছায়ার মত লেগে আছে লোকটা আকরমের পিছনে। জীবনে এর আগে এ ধরনের সমস্যায় পড়েনি সে। গত কয়েকদিনে লোকটা তার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। বাড়ি থেকে বের হলেই পিছু নিচ্ছে লোকটা। অনেকভাবে অনেকবার লোকটার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছে আকরম। রিকশা ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়েছে, ট্যাক্সি ছেড়ে বাসে উঠেছে, বাস থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পায়ে হেঁটে বহুদূর চলে গেছে—কিন্তু কোন লাভ হয়নি। লোকটা ঠিকই অনুসরণ করে এসেছে তাকে পিছু পিছু।

গতকাল সারাদিন লোকটাকে ফাঁকি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে রাত বারোটারও পরে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল আকরম। উপরের কামরা থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোকটাকে সে এরপর দেখতে পায়নি। তা সত্ত্বেও আধঘণ্টা অপেক্ষা করে সে। আধঘণ্টা পর আবার সে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে।

অত রাত হলেও বাইরে বের হবার বিশেষ দরকার ছিল আকরমের। পুরানো ঢাকা শহরের একটা বাড়িতে যাওয়া দরকার তার। কয়েকদিন আগেই যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু অনুসরণকারী লোকটার জ্বালায় সে যেতে পারেনি। আকরম সে বাড়িতে যেতে চায় সকলের অগোচরে।

ক'দিন বাড়িটায় যেতে পারেনি বলে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিল আকরম। দেরি হলে সে-বাড়ির লোক তার সাথে দেখা করার জন্যে আসতে পারে। কেউ তার সাথে সে-বাড়ি থেকে দেখা করতে আসুক তা আকরম কোনমতেই চায় না।

গতকাল অত রাতে সে-বাড়িতে যাবার জন্যেই বেরিয়েছিল আকরম। কিন্তু যাওয়া তার হয়নি। বাদ সেধেছিল সেই অনুসরণকারী লোকটাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকদূর যাবার পর পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেয়েছিল সে লোকটাকে।

অগত্যা আবার বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল আকরম। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে সে। লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি সে। আগে কোনদিন লোকটাকে দেখেছে বলে মনে হয় না। আকরম প্রথমে ভেবেছিল লোকটা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ শহীদ খান হবে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করার পর সে বুঝতে পেরেছে লোকটা ডিটেকটিভ শহীদ খান নয়। অন্য কেউ।

অন্য কে হতে পারে?

হাঁটতে হাঁটতে আবার পিছন ফিরে তাকাল আকরম। রাস্তার অপর দিকের ফুটপাথ ধরে ঠিকই হেঁটে আসছে লোকটা।

পুলিসের লোক নয় তো? কিন্তু পুলিসের লোক তাকে অনুসরণ করবে কেন? পুলিসের কাছে তার বিরুদ্ধে কি রেকর্ড আছে?

হাঁটতে হাঁটতে সুলতাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে আকরম। মনে মনে

সে ঠিক করল সুলতার সাথে দেখা করে ফিরবে সে। সুলতার সাথে ক'দিন ধরেই আলাপ হচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার করে কিছু বলছে না সে। আজ সুলতার কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে। রাতে সে ঘুমুতে পারে না সুলতার জন্যে। মেয়েটা সুন্দরী, বাবা টাকাও রেখে গেছে যথেষ্ট। সুন্দরী নারী এবং টাকা দুটোর উপরই লোভ তার। দেরি করলে কি থেকে কি হয়ে যায় তার ঠিক নেই। যা করার তা তাড়াতাড়ি করাই ভাল। সুলতাকে আজ বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে বলবে আকরম। কোন রকম ওজর-আপত্তি শুনবে না সে। দরকার হলে জোর খাটাতে হবে। সুলতার বাবা নেই, সুতরাং ভয়েরও কিছু নেই। তবে সুলতার কাকা নাকি আসছে, টেলিগ্রাম করেছে মাদ্রাজ থেকে। লোকটা কেমন কে জানে। মুসলমান ছেলের সাথে ভাইঝির বিয়ে দিতে না-ও চাইতে পারে। বিয়েটা যদি সে এসে পড়ার আগেই সেরে ফেলা যেত তবেই সবদিক দিয়ে ভাল হত। কিন্তু তা কি সম্ভব? সুলতা কি মত দেবে? মত দেবে না কেন, ভাবল আকরম, চেষ্টা করে দেখাই যাক না। দরকার হলে জোর করে বিয়ে করতে হবে।

আকরম বাড়ির কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিল হনুমানজী।

'তোমার দিদিমণি বাড়িতে আছে?' ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে জানতে চাইল আকরম।

'আছেন। ওপরের কামরায় আছেন। যান,' হনুমানজী দরজা বন্ধ করতে করতে বলল।

সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিন তলায় উঠে গেল আকরম। সুলতার কামরার দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে সে ভাবল, এত বড় বাড়িটার মালিক হবে দু'দিন পর সে। ব্যাঙ্কে সুলতার নামে জমা আছে বারো লাখ টাকা। সে টাকারও মালিক হবে সে।

'কে?' সুলতার গলা ভেসে এল কামরার ভিতর থেকে।

'আমি। চিনতে পারছ?' সহাস্যে বলল আকরম।

সব দুশ্চিন্তার কথা আপাতত ভুলে গেছে সে। সুলতা নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দিয়ে পিছন ফিরে কয়েক পা হেঁটে বসল সে একটা সোফায়। আকরম কামরার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো।

সুলতা বলে উঠল, 'ও কি হচ্ছে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আকরম। রহস্যময় হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'ক্ষতি কি, কেউ তো দেখছে না।'

সুলতা কঠিন হলো, 'কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, দরজা বন্ধ করার দরকার নেই।'

দরজার কাছ থেকে না সরেই আকরম বলল, 'তুমি বড় সেকেলে, সুলতা। মনের মানুষের সাথে দরজা বন্ধ করে গল্প-গুজব করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে,

রোমাঞ্চ আছে, তা কি তুমি বোঝো না?'

সুলতা আবার কঠিন সুরেই বলল, 'ভেবেচিন্তে কথা বলতে শেখো, আকরম। নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না।'

হাসি উবে গেল আকরমের মুখ থেকে। দরজাটা সে বন্ধ না করেই সুলতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চোখমুখ বিকৃত, কুৎসিত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চিবিয়ে চিবিয়ে সে উচ্চারণ করল, 'তারমানে? কি বলতে চাও তুমি?'

সুলতা বলল, 'যা বলতে চাই তা তুমি ভাল করেই বুঝেছ। কিন্তু, এখন ওসব কথা থাক। কেন এসেছ এত রাতে?'

'কেন, বিরক্ত হয়েছ নাকি এসেছি বলে? আর কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলে বুঝি?'

'অসহ্য!' অস্ফুটে বলে উঠল সুলতা।

কথাটা শুনতে পায়নি আকরম। দ্রুত জিজ্ঞেস করল সে, 'কি বললে?'

সুলতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমার শরীর ভাল নয়, আকরম। কেন এসেছ বলবার ইচ্ছা থাকলে বলো।'

'কেন এসেছি তা তুমি জানো না? ভাল কথা, তোমার কাকা কাঞ্চন বিহারী এসেছেন?'

সুলতা শান্ত গলায় বলল, 'না, কাকা আগামীকাল আসবেন।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল আকরম, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এসেছি তোমার সাথে আমার বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে।'

'কি!' সুলতা স্তম্ভিত হয়ে গেল আকরমের দুঃসাহস দেখে।

'কি হলো, চমকে উঠলে যে?'

সুলতা বলে উঠল, 'বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ তুমি, আকরম। বাবা নেই বলে তুমি দেখছি রীতিমত অতিষ্ট করে তুলছ আমাকে। আমাকে বিয়ে করার কথা ভাবো কি করে তুমি?'

'তারমানে আমাকে তুমি বিয়ে করবে না?'

সুলতা বলল, 'এ তো নতুন কথা নয়, আকরম। তোমাকে তো আমি বিয়ে করার কথা কল্পনাই করতে পারি না। তোমাকে কেন, আমি একজনকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না, পারবও না!'

'সেই একজন তো উজান চৌধুরী। তারমানে তুমি মরা মানুষকে বিয়ে করার জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'আকরম!' গর্জে উঠল সুলতা বাঘিনীর মত। উঠে দাঁড়াল সে সোফা ছেড়ে।

'ওরে বাপরে! এত তেজ? তা মন্দ কি বলেছি আমি? আজ আট-দশ দিন ধরে

যে নিখোঁজ সে কি আর বেঁচে আছে বলে আশা করো? তোমার মত বোকা আমি…।'

'চুপ করো, আকরম! উজান মারা যায়নি, আমার মন বলছে বেঁচে আছে সে…!' করুণ মিনতি ফুটে উঠল সুলতার কণ্ঠে।

হাঃ হাঃ করে হাসল খানিকক্ষণ আকরম। তারপর বলল, 'মেয়েরা সম্ভবত মিথ্যে আশার পিছনে ছুটতে ভালবাসে। যাকগে! আচ্ছা, উজান চৌধুরী যদি সত্যি মারা যায় তাহলে কি করবে তুমি? বিয়ে করবে তো আমাকে?'

'জানি না! ওসব কথা আমাকে বোলো না তুমি। তুমি…তুমি যাও…!'

'জানি না বললে চলবে না। আজ আমি তোমার কথা আদায় না করে যাব না। বলো, উজান চৌধুরীর খোঁজ পাওয়া না গেলে বা তার মৃত্যু-সংবাদ পেলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে! এবার তুমি যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি…!'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল আকরম সুলতার কামরা থেকে। সফল হয়েছে সে, কথা দিয়েছে সুলতা।

বাইরে বেরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে আকরম দেখল রাত এগারোটা বেজে গেছে। পুরানো শহরের বাড়িটায় তার যাওয়া দরকার। এদিক-ওদিক তাকাল সে। লোকটাকে দেখতে না পেয়ে খুশি হলো। বিরক্ত হয়ে চলে গেছে লোকটা, অনুমান করল। রিকশা কিংবা বেবী ট্যাক্সি দরকার আকরমের। কিন্তু কোনরকম যানবাহন নেই আশেপাশে। মোড়ের দিকে পা বাড়াল সে। ওদিকে গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

মোড়ে এসে গাড়ি পেল ঠিকই আকরম। কিন্তু গাড়ি পেলে হবে কি, এখানে সেই অনুসরণকারী নাছোড়বান্দা লোকটাকে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে থাকতে। রাগে সর্বশরীর জ্বলতে লাগল তার। নিষ্ফল আক্রোশে লোকটার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। লোকটা অদূরে একটি বেবী ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্যান্ট-শার্ট। স্বাস্থ্যটা খুবই ভাল। অভিজাত পরিবারের লোক বলেই মনে হলো আকরমের। তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটার উদ্দেশ্য কি বুঝে উঠতে পারছে না সে।

বেবী ট্যাক্সি ভাড়া করল আকরম। বেবী ট্যাক্সিতে চড়ে তাকাতেই সে দেখল লোকটাও তার পাশের বেবী ট্যাক্সিতে উঠল।

পুরানো শহরের নির্দিষ্ট বাড়িতে আর যাবার ইচ্ছা নেই আকরমের। অর্থাৎ উপায় নেই। ঠিক করল সে তাদের ধানমণ্ডির বাড়িতেই ফিরে যাবে।

বাড়ির কাছে বেবী ট্যাক্সি থেকে নামতেই আট-নয় বছরের একটা ছেলেকে বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল আকরম। সে যা

আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, আসছে পিছন পিছন আর একটা বেবী ট্যাক্সি।

গাড়ি থেকে নেমেই আট-দশ বছরের ছেলেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল আকরম। পকেট থেকে দশ টাকার দুটো নোট বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে সে দ্রুত চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কোন কথা বলবি না! সোজা বাড়ি ফিরে যা!'

বেবী ট্যাক্সির কাছে ফিরে এসে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল আকরম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল দ্বিতীয় বেবী ট্যাক্সিটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

টাকা নিয়ে ছোট ছেলেটা দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। ছেলেটাকে বেবী ট্যাক্সির রহস্যময় আরোহী কিছু জিজ্ঞেস করে কিনা দেখার ইচ্ছা হলেও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না আকরম। কারণ তাতে অনুসরণকারী লোকটা সন্দেহ করতে পারে ছোট ছেলেটার সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল আকরম। গেট খুলে অপেক্ষা করছিল রবালি।

চার

রবালিকে আকরম জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা কোথায় রে?'

রবালি ইতস্তত করছে দেখে ধমকে উঠল আকরম, 'কি হলো, উত্তর দিচ্ছিস না কেন?'

ভয় পেয়ে রবালি বলল, 'সাহেব···মানে, সাহেব জলসা ঘরে।'

'থাক, আর বলতে হবে না! বুঝেছি।'

এগিয়ে যায় আকরম। করিডরে উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় রবালির দিকে, 'আমার খাবার দিয়েছিস?'

'জ্বী, ছোট সাহেব। আপনার কামরাতে রেখে এসেছি।'

'ঠিক আছে। তোকে আর দরকার হবে না আমার।'

রবালি চলে যায়। করিডর ধরে এগোতে থাকে আকরম। তার সৎ-মা, ডলির কামরার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে। দম বন্ধ করে, কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে আকরম। ডলির রুমে ডলি কথা বলছে।

কার সাথে কথা বলছে এত রাতে ডলি? প্রচণ্ড কৌতূহলে পেয়ে বসে আকরমকে। সে জানে তার বাবা ডলির কামরায় শোয় না আজ প্রায় মাস ছয়েক। ডলির কামরায় বড় একটা আসেও না সে। তবে···?

কার সাথে কথা বলতে পারে ডলি।

গভীর মনোযোগের সাথে শোনার চেষ্টা করে আকরম। খানিক পরই সে বুঝতে পারে ডলির কামরায় কেউ নেই, ডলি কথা বলছে ফোনে। কার সাথে কথা বলছে ডলি?

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে আকরম ডলির দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে। বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে তার। সে বুঝতে পারে ডলি কার সাথে কথা বলছে। বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যায় আকরম। অবিশ্বাস্য-ব্যাপার, কিন্তু নিজের কানে শোনা কথা অবিশ্বাস করে কিভাবে সে?

একসময় ডলি রিসিভার নামিয়ে রাখে। স্তম্ভিত, বিমূঢ়, দিশেহারা আকরম নিঃশব্দে পা বাড়ায় নিজের কামরার দিকে।

নিজের কামরায় ফিরে এসেও স্থির হতে পারে না আকরম। মাথাটা বন বন করে ঘুরতে থাকে তার। টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে ঢাকা দেয়া খাবারদাবার। কিন্তু খিদের কথা ভুলে গেছে সে। উত্তেজিত ভাবে ঘণ্টাখানেক মেঝেতে পায়চারি করার পর আকরম ঠিক করল ডলির সাথে কথা বলবে সে। যে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মনে, তার সঠিক একটা ব্যাখ্যা দরকার। হুমকি দিয়ে হলেও ডলির মুখ সে খোলাবে।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে আকরম। এক পা দু'পা করে এগোয় ডলির কামরার দিকে।

কোথাও কোন শব্দ নেই। রাত গভীর। ডলির কামরার সামনে পৌঁছে হতভম্ব হয়ে পড়ে আকরম। ডলির কামরার দরজা খোলা, হা-হা করছে পাল্লা দুটো। কামরার ভিতর অন্ধকার। অন্ধকার কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আকরম নিঃশব্দে। ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। খুক করে কাশে আকরম। আশ্চর্য হয় সে। কেন যেন একটু ভয়ও লাগে। আবার একবার খুক করে কাশে। কিন্তু অন্ধকার কামরার ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসে না। নিঃশব্দে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আকরম।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালে আকরম। পা বাড়িয়ে কামরার ভিতর ঢোকে সে। দরজার পাশেই সুইচবোর্ড। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে ইলেকট্রিক আলো জ্বালে, তাকায় কামরার চারদিকে। খালি পড়ে আছে কামরা, ডলি নেই ভিতরে। গেল কোথায় ডলি?

কামরার ভিতর চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আকরম। এক মিনিট, দু'মিনিট। কিন্তু ডলি ফেরে না। গেল কোথায়? বাবার সাথে কথা বলতে যায়নি তো? হতে পারে! চঞ্চল হয়ে ওঠে মনে মনে আকরম। ডলি বাবার সাথে নিশ্চয়ই খানিক আগে ফোনে কথা বলার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেছে। আলোচনাটা শোনা দরকার। প্রচণ্ড কৌতূহল পেয়ে বসেছে তাকে।

আকরম ডলির কামরা থেকে বেরিয়ে আসে। নিঃশব্দে পায়ে হাঁটতে থাকে সে

তার বাবার বেডরূমের উদ্দেশে।

আকরম তার বাবার বেডরূমের কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বেডরূমের দরজাটা দূর থেকেই সে খোলা দেখতে পায়। ভিতরে আলো জ্বলছে দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়। একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হয়। পরমুহূর্তে দেখা গেল ডলিকে। উন্মাদিনীর মত বেরিয়ে এল ডলি বেডরূম থেকে। আকরম কি মনে করে করিডরের একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে। ডলি ছুটে আসছে। আশ্চর্য হয় আকরম ডলির মুখের ভাব দেখে। রীতিমত আতঙ্কিত মনে হয় ডলিকে তার। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে সে। যেন কেউ তাড়া করেছে তাকে।

থামের পাশ ঘেঁষে ছুটে চলে যায় ডলি। আকরম পাথরের মূর্তির মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারেনি সে। রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে তার কাছে। তার বাবার বেডরূমের দরজা খোলাই রয়েছে।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে বেডরূমের দরজার দিকে পা টিপে টিপে এগোতে থাকে আকরম। আস্তে আস্তে খোলা দরজার সামনে এসে উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকায় সে।

কামরার ভিতর তার বাবাকে দেখতে পায় না আকরম। কেউ নেই কামরার ভিতর। অবাক হয় আকরম। বাবা কি তাহলে এখনও তার জলসা ঘরে?

জলসা ঘরে বাবার উপস্থিতিতে এর আগে কখনও যায়নি আকরম। কিন্তু এই মুহূর্তে যাবে সিদ্ধান্ত নিল সে। ডলির মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আতঙ্কিত একটা মুখ। ডলি এমন কিছু দেখেছে বা শুনেছে যার ফলে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। তার ভয় পাবার কারণটা জানতে চায় আকরম।

রেডরূমে ঢুকে আকরম দেখতে পায় জলসা ঘরে যাবার সিঁড়ি মুখের সামনে যে আলমারিটা থাকে, সেটা সরানো হয়েছে আগেই।

সিঁড়ি বেয়ে অত্যন্ত সাবধানে নামতে থাকে আকরম। ডলি এই মাত্র উঠে গেছে জলসা ঘর থেকে। বাবা নিশ্চয়ই জেগে আছেন। হয়তো মাতাল অবস্থায় আরও মদ গিলছেন। মুচকি হাসল আকরম। বাবা যত বুড়ো হচ্ছেন ততই ভোগী হয়ে উঠছেন। পা টিপে টিপে নামতে থাকে আকরম। বাবা যেন টের না পান।

সিঁড়ি থেকে নেমে করিডরে পা দেয় আকরম। করিডরের শেষ মাথার দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সে। জলসা ঘরের দরজাটা খোলাই দেখা যাচ্ছে। চোখ-কান সতর্ক রেখে এগোতে থাকে আকরম। বাবার সাথে আর কেউ থাকতে পারে, ভাবে আকরম। কিন্তু জলসা ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেও কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে অবাক হতে শুরু করে সে। কান পেতে এতটুকু শব্দও শুনতে পায় না সে। ছুঁয়ে দেয় তাকে একটা অশরীরী ভয়ের স্রোত হঠাৎ। গা ছমছম করে ওঠে। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে বক্সনগরের জঙ্গলের প্রাচীন মন্দিরের ছবি। ভয়ে

গলা শুকিয়ে যায় তার।

জলসাঘরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় আকরম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। না, কোন শব্দ নেই। জলসা ঘরের ভিতরটা দেখার জন্যে উঁকি দেয় আকরম।

আজমল রব্বানী শুয়ে আছেন। হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছেন তিনি। তার পাশে দাঁড় করানো রয়েছে একটা সাদা পেট মোটা মদের বোতল।

সন্তর্পণে জলসাঘরের ভিতরে পা দেয় আকরম। বাবা কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে শুয়ে রয়েছেন। মুখটা অন্যদিকে ফেরানো।

বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আকরম। তখুনি সে দেখতে পায় বাবার চোখ দুটো।

আজমল রব্বানীর চোখ দুটো খোলা। স্থির হয়ে আছে চোখ দুটো। এতটুকু নড়ছে না। মরা মানুষের চোখ যেমন হয়ে থাকে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে আকরম। কোন সন্দেহ নেই তার যে ডলি তার বাবাকে খুন করেছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখা এই পরিস্থিতিতে খুব কঠিন হলেও আকরম সবরকম পরিস্থিতির সাথে পরিচিত বলেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলল। পুলিস ডলিকে গ্রেফতার করবে তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। আর সে চায়ও তাই। ডলিকে পুলিস গ্রেফতার করলে তার অনেক লাভ।

দৃঢ় মন নিয়ে স্থির, অচঞ্চল পায়ে জলসাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে তার বাবার বেডরুমে। সেখান থেকে সরাসরি ঢুকল নিজের কামরায়। এতটুকু সময় নষ্ট না করে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল সে। কানেকশন পাবার পর সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি পুলিস স্টেশন?'

'হ্যাঁ। ও. সি. বলছি।'

আকরম বলল, 'আমি আজমল রব্বানীর ছেলে আকরম রব্বানী ধানমণ্ডির আঠারো নম্বর রোডের পাঁচ বাই তিন থেকে বলছি। এ-বাড়িতে একজন খুন হয়েছে। তাড়াতাড়ি পুলিস পাঠান। খুনী এখনও আছে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে।'

'কি বললেন? খুন? খুনী এখনও আছে কাছাকাছি? কী সাংঘাতিক! দাঁড়ান, দাঁড়ান, ঠিকানাটা আর একবার বলুন দেখি···।'

ঠিকানাটা আবার জানিয়ে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল আকরম। কিন্তু থানায় ফোন করেই নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। ডলি খুন যখন করেছে তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পালাবার চেষ্টাও করতে পারে বলে মনে হলো তার। কথাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। আটকানো দরকার ডাইনীটাকে। তা না হলে পালাবে। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল আকরম।

ডলির রুমের কাছাকাছি এসে দরজাটা খোলা দেখে বেশ একটু অবাকই হলো আকরম। এখনও দরজা খোলা কেন?

কামরাটা আলোকিত। আকরম বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল কামরার সামনে। কেউ নেই কামরার ভিতর। ডলি পালিয়েছে ইতিমধ্যেই।

দশ মিনিট পর প্রথমে থানা থেকে একজন ইন্সপেক্টর দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো। মি. সিম্পসন এবং কামাল এল আরও দশ মিনিট পর।

ইন্সপেক্টর আকরম এবং রবালির জবানবন্দি নিল। জলসা ঘরে গিয়ে লাশ দেখল মি. সিম্পসন এবং কামাল। কামাল মদের বোতলটা রুমালে জড়িয়ে পকেটে ভরল। অবশিষ্ট মদ পাঠানো হবে সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে।

এক ফাঁকে কামাল মি. সিম্পসনকে জানাল, 'ডলি কোথায় গেছে তা হয়তো খোঁজ করলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব।'

'কোথায় খোঁজ করতে চাও তাকে?'

কামাল বলল, 'শহীদ আমাকে বলেছিল ডলির প্রাক্তন প্রেমিক নওশের আবদুল্লার এক বন্ধুর বাড়ি আছে কুখ্যাত একটি পাড়ায়। সেখানেই নাকি মাঝে মধ্যে ডলি যায়। নওশের আবদুল্লার বন্ধুটাও একজন কেউকেটা, গুণ্ডাদের সর্দার আর কি। আমার মনে হয় ডলি সেখানে গেছে গা-ঢাকা দেবার জন্যে।

'চলো তাহলে, গিয়ে দেখা যাক।'

কামাল বলল, 'আমি একাই যাই। আপনি বরং লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, সকালে যেন রিপোর্টটা পাওয়া যায়।'

'কিন্তু কুখ্যাত পাড়ায় একজন গুণ্ডার সর্দারের বাড়িতে তুমি একা···।'

বাধা দিয়ে কামাল বলল, 'না, একেবারে একা যাব না। থানা থেকে কয়েকজন আর্মড পুলিসকে তুলে নেব যাবার সময়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ। তাই করো। আমি বলে দিচ্ছি ফোনে।'

পাঁচ

রাত গভীর হয়েছে। সারা শহর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কিন্তু ঘুম নেই বাঈজীদের পাড়ায়। বাঈজীরা জেগে আছে। রোজই জেগে থাকে তারা সারা রাত। শুধু জেগেই থাকে না, রাত জেগে এরা বিলাসী ধনী-সন্তানদের মন ভোলাবার জন্যে নাচে।

বাঈজী পাড়ায় সাধারণত ধনী লোকেরাই আসে। আসে যারা নিশাচর, যারা অসামাজিক গোপন ভোগবিলাসের দাস। বিকৃত রুচির লোকেরই সমাগম ঘটে এখানে। মাতাল, লম্পট, ব্ল্যাকমেইলার, কালোবাজারী, চোরাচালানকারী,

মজুতদার, কালো টাকার কারবারী, গুণ্ডাদের সর্দার, ধনীলোকের বখে যাওয়া সন্তান প্রভৃতিদের একচেটিয়া স্বর্গ এই বাঈজী পাড়া।

রাত যত গভীরই হোক এ পাড়ার অলিতে গলিতে মাতালের দেখা পাওয়া যাবে। শোনা যাবে আশপাশের বাড়ি থেকে আসা নূপুরের ধ্বনি, তবলার আওয়াজ, মেয়েলি গলার গান এবং রহস্যময় খিলখিল হাসি।

এই পাড়ারই একটি গলি থেকে মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একজন প্যান্ট-শার্ট পরা সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান লোককে। এই লোকটাই গত কয়েকদিন ধরে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে আকরমকে।

লোকটা টলতে টলতে গলি থেকে বেরিয়ে আবছা অন্ধকারে ঢাকা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় বেরিয়েই মুখোমুখি পড়ল কামালের।

কামাল গলিটার ভিতরই ঢুকতে যাচ্ছিল। মাতাল লোকটাকে দেখে চমকে উঠল সে। অবাক চোখে মাতালের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'এ কি রে, শহীদ! তুই এখানে? এত রাতে তুই···।'

মাতাল লোকটি অর্থাৎ ছদ্মবেশধারী শহীদ খান তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিল, 'প্রশ্নটা তো আমিও তোকে করতে পারি। এত রাতে তুই এখানে কেন?'

কামাল নিচু গলায় বলল, 'আমি ডলির খোঁজে এসেছি। খানিক আগে আজমল রব্বানী খুন হয়েছেন। আকরমের ধারণা তার বাবাকে খুন করেছে ডলি। ডলিকে বাড়িতে পাইনি। সে নাকি পালিয়ে এসেছে। তাই খোঁজ করতে এসেছি···।'

শহীদ এখন আর টলছে না। মাতালের অভিনয় করার আপাতত দরকার নেই। দ্রুত রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিল ও। দূরে দু'চারজন লোককে মাতলামি করতে দেখা যাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই। এদিকটা বেশ অন্ধকারও। কামালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল শহীদ, বলল, 'তুই ডলিকে খুঁজছিস আর আমি ডলিকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি।'

'ডলিকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিস? কোত্থেকে? ডলি তাহলে এ পাড়ায় আছে? কোথায়, কোন্ বাড়িতে বল দেখি?'

'আজমল রব্বানীর বাড়ি থেকে অনুসরণ করে আসছি আমি। শোন, নওশের আবদুল্লার বন্ধুর বাড়িটা এই গলির ভিতর। ডলি ওখানেই আছে। নওশেরের বন্ধুকে একটা কাগজের টুকরো দিয়েছে ডলি, দেখেছি আমি। কাগজের টুকরোটায় কি লেখা আছে তা আমার দেখার সুযোগ হয়নি। তুই কি ডলিকে গ্রেফতার করতে চাস?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ, সম্ভব হলে···।'

'কিন্তু একা পারবি না। নওশেরের বন্ধু হুরমুজ বেগ ভয়ঙ্কর লোক···।'

'আমার সঙ্গে আটজন আর্মড পুলিস আছে। পাড়ার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি তাদেরকে···।'

বিদ্যুদ্বেগে ধাক্কা দিল শহীদ কামালকে। তিনহাত দূরে গিয়ে পড়ল কামাল

আচমকা শহীদের ধাক্কা খেয়ে। পরমুহূর্তে দেখা গেল অন্ধকার গলি থেকে ওদের দুজনের দিকে লাফিয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য। লোকটার হাতে চকচকে একটা ছোরা।

সময়মত সরে গিয়েছিল বলে রক্ষা। লোকটা তাল সামলাবার আগেই শহীদ পাশ থেকে প্রচণ্ড লাথি চালাল। বিশালদেহী আক্রমণকারীর পাঁজরে গিয়ে লাগল সবুট লাথি। মট করে ভেঙে গেল একটা পাঁজরের হাড়।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না আক্রমণকারী। বিপুল-বিক্রমে ছোরা উঁচিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। শহীদ চোখের পলকে সরে গেল এক পাশে। এবারও আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো শত্রু। শহীদ এবার প্রাণপণ শক্তিতে ঘুসি চালাল।

শত্রুর কপালের পাশে গিয়ে লাগল ঘুসি। শহীদের হাতের আঙুলগুলো যেন ঢুকে যেতে চাইল শত্রুর কপালের হাড় ভেদ করে ভিতরে। ককিয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না সে। সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছোরা চালাল। কিন্তু শহীদ প্রস্তুত হয়েই ছিল। বিদ্যুদ্বেগে বসে পড়েই দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ও শত্রুর হাঁটু দুটো। তারপর আকর্ষণ করল নিজের দিকে হাঁটু দুটোকে। তাল হারিয়ে ফেলল শত্রু। এক সেকেণ্ড পরই শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসা অবস্থাতেই আবার ঘুসি চালাল শহীদ।

তলপেটে ঘুসি খেয়ে ককিয়ে উঠল আবার শত্রু। উঠে দাঁড়িয়েই লাথি চালাল শহীদ। পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু পিছন থেকে পিঠে কামালের লাথি খেয়ে আবার সামনের দিকে ঝুঁকল ভারী দেহটা।

সশব্দে রাস্তার উপর পড়ল শত্রুর দেহ। কালবিলম্ব না করে শহীদ এবং কামাল অচেতন দেহটাকে ধরাধরি করে অন্ধকার গলির ভিতর নিয়ে গেল। গলির এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে দেহটা নামিয়ে রেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল ওরা।

'তুই সময় মত আমাকে সরিয়ে না দিলে…!'

কামালকে বাধা দিয়ে শহীদ নিচু গলায় বলে উঠল, 'এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা উচিত হবে না। লোকটাকে চিনতে পারছিস? এই-ই নওশের আবদুল্লার বন্ধু হুরমুজ বেগ। এর সাঙ্গপাঙ্গরা টের পেলে আর রক্ষে নেই।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি করতে বলিস?'

শহীদ বলল, 'ডলিকে যদি গ্রেফতার করতে চাস তবে আর দেরি করিস না।'

কথাটা বলেই হুরমুজ বেগের পাশে বসল শহীদ। লোকটার পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ ও বলে উঠল, 'পেয়েছি।'

'কি পেয়েছিস রে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কামাল।

দেখা গেল শহীদের হাতে একটা চিরকুট।

'কি ওটা?'

শহীদ বলল, 'ডলি এই কাগজের টুকরোটাই দিয়েছিল হুরমুজ বেগকে।'

'কি লেখা আছে ওতে?'

আবছা অন্ধকারে পড়বার কোন উপায় নেই। পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বের করল শহীদ, সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় চিরকুটের লেখাটা পড়ে শহীদ গম্ভীর গলায় বলল, 'এ যে দেখছি বক্সনগরের একটি মন্দিরে যাবার পথের নির্দেশ লেখা রয়েছে।'

'মন্দিরের সাথে কি সম্পর্ক ডলির?'

শহীদ বলল, 'কোন না কোন সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। ওই মন্দিরেই হয়তো পাওয়া যাবে এই কেসের সকল সমাধান। বলা যায় না, ওখানেই হয়তো আত্মগোপন করে আছে নওশের আবদুল্লা কোন কারণে।'

'তুই কি যাবি···?'

'যাব না মানে? পারলে এখুনি রওনা হতাম। কিন্তু রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পৌঁছুতে সেই সকালই হয়ে যাবে। তারচেয়ে সকালেই রওনা হব।'

'সেই ভাল। আমি তোর সাথে যেতে পারব না হয়তো। অনেক কাজ বাকি থাকবে। ডলিকে গ্রেফতার করার পর ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে···।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি আমার সাহায্য দরকার?'

হাসল কামাল। বলল, 'আটজন আর্মড কনস্টেবল আছে আমার সঙ্গে। তোর সাহায্য লাগবে না। তুই তো সকালবেলাই মন্দিরের খোঁজে ছুটবি। বাড়ি গিয়ে বরং বিশ্রাম নে। তুই ফিরে খবর দিস, দেখা করব।'

শহীদ বলল, 'যদি ফিরি তবে খবর দেব।'

'যদি ফিরি মানে?'

শহীদ হাসল। বলল, 'বলা যায় না, মন্দিরে হয়তো আমার জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে।'

গম্ভীর গলায় কামাল বলল, 'অলক্ষুণে কথা বলিস না, শহীদ!'

বক্সনগর। কাঁচা রাস্তার শেষ মাথায় থামো।

সামনে জঙ্গল। শিমুল গাছগুলোকে ডানপাশে রেখে এগোও। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর পাবে সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ।

এই পথ ধরে এগিয়ে চলো। সামনেই পড়বে এক প্রাচীন মন্দির।

ডলির হাতের লেখা ভাল। চিরকুটে উপরের কথাগুলো লেখা। পাকা রাস্তার শেষ মাথায় এসে চিরকুটটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল শহীদ।

সকাল দশটায় জঙ্গলে ঢুকল শহীদ। শিমুল গাছের কথা লেখা আছে চিরকুটে। কিন্তু সমস্যায় পড়ল শহীদ। একটা শিমুল গাছও চোখে পড়ল না ওর। অযথা সময় নষ্ট না করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল ও। খানিকদূর যাবার পর দেখা পাওয়া গেল শিমুল গাছের। ডানদিকে গাছগুলোকে রেখে সরু একটা পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে

চলল শহীদ। প্রায় সাত মিনিট হাঁটার পর জঙ্গলের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল সে। অদূরে, সামনে, দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা।

সতর্ক চোখে মন্দিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল শহীদ। প্রাণের কোন চিহ্ন বাইরে থেকে দেখতে পেল না ও। সাবধানী পায়ে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। দোতলার বারান্দার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এই প্রাচীন মন্দিরে কি কেউ বাস করে? নিজেকেই প্রশ্নটা করল শহীদ। হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করল ও। অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি মেলে ঢুকল মন্দিরের ভিতর।

উঠন পেরিয়ে মন্দিরের উঁচু বারান্দায় উঠল শহীদ। বারান্দায় উঠে খোলা দরজাটার দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

সন্তর্পণে খোলা দরজা পথে উঁকি দিয়ে তাকাতেই কালীমূর্তি দেখতে পেল শহীদ। মেঝেতে শুকনো রক্ত দৃষ্টি এড়াল না ওর। কালীমূর্তির পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে একটা বড় ছোরা। ছোরার ফালাতেও রক্ত। কিন্তু সে রক্তও শুকিয়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন আগে রক্তের সংস্পর্শে এসেছে ছোরাটা তা বুঝতে পারল শহীদ। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকল ও।

ছোরাটা মেঝে থেকে তুলে রুমালে জড়িয়ে নিল শহীদ। কালীমূর্তির পিছনটা দেখল ও। কেউ নেই, কিছু নেই। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল এবার শহীদ।

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠতে চাইলেও তা সম্ভব হলো না। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে নড়বড়ে সিঁড়িটা প্রবল অভিযোগ প্রকাশ করতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল শহীদ।

উপরে তিনটে কামরা। প্রথম কামরাটার সামনে থমকে দাঁড়াল শহীদ। কামরাটার কড়ায় নতুন তালা ঝুলছে। শহীদ দেখল তিনটে কামরার দরজাতেই নতুন তালা।

প্রথম কামরার দরজার গায়ে কান পেতে কিছু শোনা যায় কিনা পরীক্ষা করল শহীদ। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। ভিতর থেকে অস্ফুট কাতরধ্বনি ভেসে আসছে। কে যেন নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন বিপদের লক্ষণ দেখতে পেল না শহীদ। রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে তালার উপর ঘা মারল ও।

কয়েকবার আঘাত করতে পচা কাঠের শরীরে ঢোকানো লোহার একটা মরচে ধরা কড়া ভেঙে গেল।

আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক করল শহীদ। ভ্যাপসা গরম বাতাস নাকেমুখে এসে লাগল। কামরার ভিতর আবছা অন্ধকার। ভিতরে পা দিল

শহীদ।

কামরার মেঝেতে প্রৌঢ় একজন লোক প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। লোকটার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। শহীদ লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ মেলে শহীদের দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

শহীদ মৃদু হাসল। বলল, 'আর কোন ভয় নেই, মি. মিজান চৌধুরী। পাপের শাস্তি আপনি পেয়েছেন। আপনার ছেলে উজান চৌধুরী কোথায়?'

ছয়

বেলা একটার সময় শহীদের ফোন পেল কামাল।

'বড় চিন্তায় ছিলাম রে। তা মন্দিরে গিয়ে কি পেলি, শহীদ?'

শহীদের হাসির শব্দ ভেসে এল। ও বলল, 'মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। পরে শুনিস। তুই বরং একজন লোক পাঠিয়ে দে আমার বাড়িতে। একটা ছোরা, একটা সিগারেট কেস পাঠাব, ওগুলোতে হাতের ছাপ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে।'

কামাল বলল, 'তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু তোকে যেন খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে। কি করছিস রে?'

'বেড়াতে বেরিয়েছি,' বলল শহীদ কৌতুক ভরে।

'এমন সময়? কোথায় বেড়াচ্ছিস? ফোন করছিস কোত্থেকে?'

শহীদ হাসতে হাসতে জানাল, 'পরে শুনিস। আর একটা কাজ করতে হবে তোকে।'

'বল।'

'আজ বিকেলে মি. সিম্পসনের চেম্বারে বর্তমান কেসে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করে একত্রিত করবি। পারবি তো?'

'তা পারব। ব্যাপার কি রে, শহীদ? মনে হচ্ছে তুই কেসটার সমাধান করে ফেলেছিস!'

শহীদ বলল, 'সমাধান আমাকে করতে হবে না। তুই-ই পারবি। আমি শুধু তোকে দু'একটা তথ্য দেব। ভাল কথা, কুচবিহারীর লাশে যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল সেটা যে পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছিল সেই পিস্তল থেকেই ডলির উদ্দেশে গুলি করা হয়েছিল কিনা বলতে পারিস না? খোল এবং বুলেট দুটোই তো তোর কাছে আছে। পরীক্ষা করিসনি?'

কামাল বলল, 'কেন, তোকে বলিনি? ভুলে গিয়েছিলাম, শহীদ। পরীক্ষার রিপোর্ট বলছে দুটো গুলি যে একই পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে আরও মজার কাণ্ড হয়েছে তা জানিস?

'কি কাণ্ড?'

'মিজান চৌধুরীর চেম্বার থেকে ক্লোরোফর্ম এবং সায়ানায়েড বিষ চুরি হয়েছে তা তো জানিস?'

'হ্যাঁ।'

'চেম্বারে চোরের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।'

'কার সাথে মিলছে?'

কামাল বলল, 'হাতের ছাপটা যে কার ঠিক বুঝতে পারছি না। দাগী অপরাধীদের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, মিলছে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আজমল রব্বানী যে মদের বোতল থেকে মদ খেয়ে নিহত হয়েছেন সেই বোতলেও এই চোরের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। এখন দেখছি ডলি আজমল রব্বানীকে খুন করেনি। ডলি নিজেই অস্বীকার করছে। বলছে, সে জলসাঘরে গিয়ে দেখে তার স্বামী মরে পড়ে আছে। আমার বদ্ধমূল ধারণা ক্লোরোফর্ম এবং সায়ানায়েড যে চুরি করেছে সে-ই খুন করেছে সেই সাতজন লোককে এবং আজমল রব্বানীকে। আমার একথা বলার কারণ এই যে সাতজন লোকের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে ওদেরকে ক্লোরোফর্ম ইঞ্জেকশন দিয়ে আগে অজ্ঞান করা হয় তারপর ছোরা চালিয়ে চেরা হয় প্রত্যেকের পেট। আজমল রব্বানীর বোতলের মদে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে সায়ানায়েড বিষ।

'কাকে সন্দেহ করিস তাহলে তুই? তোদের তো ধারণা কুয়াশা সাতজন লোককে খুন করেছে।'

কামাল বলল, 'কুয়াশা আজমল রব্বানীকেও খুন করেছে হয়তো।'

'মোটিভ?'

কামাল বলল, 'সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'কেন, কুয়াশার হাতের ছাপ তো আছে। মিলিয়ে দেখ।'

'দেখেছি। মিলছে না।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শহীদ। হাসি থামিয়ে ও বলল, 'পরস্পরবিরোধী কথা বলছিস কেন? একবার বলছিস ক্লোরোফর্ম এবং সায়ানায়েড যে চুরি করেছে সেই-ই সাতজন লোক এবং আজমল রব্বানীকে খুন করেছে এবং সে লোক কুয়াশা ছাড়া আর কেউ নয়; আবার বলছিস কুয়াশার হাতের ছাপের সাথে চোরের অর্থাৎ খুনীর হাতের ছাপ মিলছে না। তোর কথা অনুযায়ী প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে চোর এবং খুনী এক লোক এবং সে আর যে-ই হোক, কুয়াশা নয়।'

কামাল বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। এ ব্যাপারে তোর সাহায্য ছাড়া আমি অচল।'

শহীদ বলল, 'খানিকক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরছি আমি। লোক পাঠিয়ে দে তুই। পরে আলোচনা করব। বিকেল পাঁচটায় সবাইকে মি. সিম্পসনের চেম্বারে জড়ো

করবি, আমি আসব। কয়েকটা চেয়ার বেশি রাখিস। নতুন মুখ দেখতে পাবি।'

'কোথা থেকে ফোন করছিস রে তুই?'

'সুলতাদের বাড়ি থেকে।'

কামাল অবাক হলো, 'ওখানে কি?'

শহীদ বলল, 'বাহ্, সুলতা একা আছে, তাকে দেখতে আসতে নেই? আজ থেকে অবশ্যি বেচারা মেয়েটাকে একা থাকতে হবে না। ওর কাকা কাঞ্চন বিহারী আজ সকাল আটটায় মাদ্রাজ থেকে ঢাকায় এসেছেন। ভদ্রলোক বেজায় মুষড়ে পড়েছেন ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে। গুম মেরে গেছেন। হাজার হোক, এক মায়ের পেটের ভাই তো!'

কামাল বলল, 'কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করব বল তো?'

শহীদ বলল, 'সবাইকে। শরীফ চাকলাদার, সুলতা, আকরম। সুলতার কাকা কাঞ্চন বিহারীকেও নিমন্ত্রণ করিস। তার ছোট ভাই খুন হয়েছে সুতরাং এই কেসের সমাধানের ব্যাপারে সে-ও নিশ্চয়ই আগ্রহী হবে। আর ডলি তো পুলিসের হেফাজতেই আছে। ওকেও আনাবি। খোঁজ পেলে কুয়াশাকে খবর দিস। রাসেলকেও ডাকিস। আমার ধারণা কিছু তথ্য সে-ও দিতে পারবে।'

'কুয়াশা আসবে?'

শহীদ বলল, 'নিমন্ত্রণ পেলে আসবে না কেন? দোষী হলে হয়তো আসবে না, কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার এটাই তো তার সুযোগ।'

বিকেল পাঁচটায় মি. সিম্পসনের চেম্বারে একে একে জমায়েত হলো সবাই। সবাই এসেছে, আসেনি কেবল শরীফ চাকলাদার। আসেনি, কিন্তু ফোন করে সে জানিয়েছে বিশেষ একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে বলে তার আসতে ঘণ্টা খানেক দেরি হবে।

কামাল অস্থির হয়ে উঠল শহীদের অপেক্ষায়। পাঁচটা বেজে গেছে, অথচ শহীদ এখনও আসছে না কেন?

আকরম তাকিয়ে আছে কামালের দিকে। তাকিয়ে আছে ডলি এবং সুলতাও। কাঞ্চনবিহারী এসেছে। এক মনে চুপচাপ চুরুট খাচ্ছে সে। কোন দিকে মনোযোগ নেই।

আকরম বলে উঠল, 'কি ব্যাপার, মি. কামাল? আমাদেরকে এভাবে বসিয়ে রাখার মানে কি···?'

কামাল ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'আপনাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে বর্তমান কেসটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। কিন্তু এই কেস নিয়ে যারা মাথা ঘামাচ্ছেন তাদের অনেকেই হাজির হননি এখনও। কেসের সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে শরীফ চাকলাদার সাহেবও আসতে পারেননি। তিনি পরে আসবেন,

জানিয়েছেন। ঠিক আছে, আমরা এখুনি আলোচনা শুরু করতে পারি।'

কামাল মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল। মি. সিম্পসন মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলেন। পাশাপাশি চেয়ারে বসেছে ওরা। ওদের পাশে আরও কয়েকটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। ওদের সামনে মস্ত একটা টেবিল। ওদের মুখোমুখি বসেছে আকরম, কাঞ্চনবিহারী, সুলতা এবং ডলি।

কুয়াশাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে রাসেলকেও। তারা এখনও এসে পৌঁছায়নি।

কামাল শুরু করল, 'বর্তমান কেসটা প্রথমে যেমন সরল মনে করা হয়েছিল পরে ঠিক তেমনি জটিল হয়ে ওঠে তা আপনারা সকলেই জানেন। প্রথমে খুন হলেন মি. কুচবিহারী। তারপর সাতজন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের লাশ পাওয়া গেল। সবশেষে নিহত হলেন মি. আজমল রব্বানী। এদিকে প্রথম থেকেই নিখোঁজ হয়েছেন ডা. মিজান চৌধুরী এবং তাঁর ছেলে উজান চৌধুরী।'

কামাল দম নেবার জন্যে থেমে একে একে সকলের দিকে তাকাল। তারপর শুরু করল আবার, 'আপনারা সকলেই নিহত মি. কুচবিহারী বা মি. আজমল রব্বানীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কিন্তু দুনিয়া বড় জঘন্য স্থান, এখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে খুন করে। অর্থাৎ আপনারা কেউই সন্দেহের বাইরে নন। যারা খুন হয়েছেন তাদেরকে খুন করার পিছনে আপনাদের অনেকেরই উপযুক্ত মোটিভ থাকা সম্ভব। সুতরাং আমি আপনাদের প্রত্যেককেই কয়েকটা করে প্রশ্ন করব। আশা করি আমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবেন সবাই।'

কামাল এবার তাকাল আকরমের দিকে। বলল, 'মি. আকরম, আমি সবার আগে আপনাকেই প্রশ্ন করতে চাই।'

গম্ভীর গলায় আকরম বলল, 'বলুন।'

'আপনার বাবা মি. আজমল রব্বানীর একটা পিস্তল ছিল। সেটা নাকি ক'দিন আগে চুরি যায়। আপনি জানেন পিস্তলটা কে চুরি করেছে?'

'না।'

কামাল বলল, 'যে পিস্তল দিয়ে মি. কুচবিহারীকে খুন করা হয়েছে সেই পিস্তল দিয়েই গুলি করা হয়েছে শহীদ খান ও মিসেস ডলিকে। তার মানে যে পিস্তলটা চুরি করেছে সে-ই খুন করেছে মি. কুচবিহারীকে এবং সে-ই গুলি করেছিল শহীদ খানকে লক্ষ্য করে। মি: আকরম, আপনি জানেন শহীদ খানকে কে গুলি করেছিল?'

'না। তবে আমি একজনকে ছুটে পালাতে দেখেছিলাম গুলির শব্দের পর পরই...!'

'মিথ্যে কথা!'

শোনা গেল শহীদের কণ্ঠস্বর। একটা তিন-চার বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে অফিসরুমের ভিতর প্রবেশ করল শহীদ। চমকে উঠে সকলে তাকাল ওর দিকে। হাঁ

হয়ে গেছে কামালের মুখ শহীদের কোলে একটি শিশুকে দেখে।

আকরম কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল শহীদের কোলের তিন-চার বছরের শিশুটি। বাচ্চাটা আকরমের দিকে তাকিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, 'আব্বা! আব্বা!' শহীদ বাচ্চাটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই সে ছুটে গিয়ে তার বাবা আকরমের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল।

সুলতা সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তার মানে?'

শহীদ মৃদু হাসল। বলল, 'মিস সুলতা, ধৈর্য ধরুন। সবই জানতে পারবেন। হ্যাঁ, এই বাচ্চাটি মি. আকরমেরই ঔরসজাত। তিনি বিবাহিত। কিন্তু বিয়ের কথাটা তিনি এতদিন চেপে রেখেছেন এই যা। কারণ তাঁর এই বিয়ের কথা জানতে পারলে তাঁর বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করতেন এবং আপনাকে তাঁর বিয়ে করার শখ বা লোভ মিটত না। সে যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবার। মি. আজমল রব্বানীর বাড়িতে মিসেস ডলির সাথে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আমাকে লক্ষ্য করে জানালা দিয়ে গুলি করা হয়। সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে আসি আমি। মি. আকরম আমাকে জানান যে পাঁচিল টপকে একজন লোককে তিনি পালাতে দেখেছেন। কিন্তু পাঁচিল পরীক্ষা করে এবং কুয়াশার একজন অনুচর মান্নানকে প্রশ্ন করে আমি জানতে পারি যে পাঁচিল টপকে বাড়ি থেকে কেউ পালায়নি। তার মানে মি. আকরম মিথ্যে কথা বলেছিলেন আমাকে। আমি জানতে চাই, কেন আপনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, মি. আকরম?'

আকরম হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।

কামাল বলে উঠল, 'আপনি মুখ না খুললেও ক্ষতি নেই, মি. আকরম। সত্য কখনও চাপা থাকে না একথা আপনার জানা না থাকলেও আমাদের জানা আছে। আপনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, তার কারণ আপনার বাবার পিস্তলটা চুরি করেছিলেন আপনিই। আপনিই খুন করেন মি. কুচবিহারীকে এবং আপনিই গুলি করেন শহীদ খানকে…!'

'কুচবিহারীকে আমি খুন করেছি? চমৎকার! তাকে খুন করার পেছনে আমার স্বার্থ কি? মোটিভ কি?'

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শহীদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না, আপনি মি. কুচবিহারীকে খুন করেননি। কিন্তু আপনি নওশের আবদুল্লাকে খুন করেছেন। অস্বীকার করেন?'

'নিশ্চয়ই অস্বীকার করি! তাকে কেন খুন করতে যাব আমি? কে নওশের আবদুল্লা? তাকে আমি চিনিই না…।'

'বাজে কথা বললে ফল ভাল হবে না, মি. আকরম। নওশের আবদুল্লাকে আপনার ভালভাবেই চেনার কথা। সে ছিল একজন কুখ্যাত ব্ল্যাকমেইলার। আমার

ধারণা সে আপনাকেও ব্ল্যাকমেইল করত…।'

'মিথ্যে কথা!'

চিৎকার করে উঠল আকরম। ডলি পরমুহূর্তে তার চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সমান রবে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মিথ্যে নয়, সত্যি কথা। নওশের তোমাকেও ব্ল্যাকমেইল করত। তুমি বিবাহিত, তোমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে একথা প্রচার করে দেবার ভয় দেখায় সে। তুমি তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে মাসে মাসে পাঁচশো করে টাকা দেবার প্রতিজ্ঞা করো। আমি শহীদ সাহেবের সাথে যখন কথা বলছিলাম, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তখন তুমি আমাদের কথা শুনছিলে। তার আগে একটা কথা বলে নিই। এই ঘটনার আগের দিন নওশের আমাদের বাড়িতে যায়। নওশের যখন তোমার বাবার সাথে আলোচনা শেষ করে চলে যাচ্ছিল তখন তুমি তাকে অনুসরণ করো। তোমার এই অনুসরণের কথাটাই পরদিন শহীদ সাহেবকে আমি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বলা আর হলো না, তার আগেই তুমি গুলি করো শহীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে। তোমাকে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু ভয়ে তোমার নাম আমি পুলিসকে বা শহীদ সাহেবকে বলি। এখন সব কথা বলতে আমার কোন বাধা নেই। কারণ তুমি আমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ডলি থামতেই কামাল প্রশ্ন করে, 'মি. আকরম তাহলে নওশেরকে খুন করেছেন। কিন্তু তার লাশ কোথায় রেখেছেন?'

উত্তর দিল শহীদ, 'তার লাশ বিকৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে পুলিস। আমরা সবাই যে লাশকে মি. কুচবিহারীর লাশ বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে মি. কুচবিহারীর লাশ নয়। সেটা নওশের আবদুল্লার লাশ।'

সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'এ তুমি কি বলছ, শহীদ?'

কামাল বলল, 'মি. কুচবিহারী তাহলে কোথায়?'

শহীদ তাকাল কাঞ্চনবিহারীর দিকে। বলল, 'মি. কুচবিহারী এই অফিস রুমেই উপস্থিত আছেন।'

'হোয়াট!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন।

এমন সময় অফিস রুমে ঢুকল একজন সুবেশী প্রৌঢ়। তার পিছন পিছন ঢুকল এক সুদর্শন তরুণ। তরুণের দিকে তাকিয়ে সুলতা আনন্দে আবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'উজান! উজান তুমি…!'

কান্নায় গলা বুজে গেল সুলতার।

শহীদ সুবেশী, প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আসুন, মি. মিজান চৌধুরী, আসুন।'

মিজান চৌধুরী কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল কাঞ্চনবিহারীর দিকে। কাঞ্চনবিহারী

তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে কাঁপছে সে।

মিজান চৌধুরী বলে উঠল, 'তোমার পাল্লায় পড়ে জীবনে অনেক পাপ করেছি। আমি প্রায় নরকে পৌঁছে গিয়েছিলাম। শেষ অবধি তোমার হাতেই খুন হতে হত আমাকে। ভাগ্য নেহাত ভাল, সময় মত মি. শহীদ আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওঁর ঋণ জীবনে আমি শোধ করতে পারব না। কুচবিহারী সাহেব, নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করো।'

সুলতা চিৎকার করে উঠল, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ইনি আমার কাকা কাঞ্চনবিহারী···।'

শহীদ বলল, 'না। ইনি আপনার কাকা নন, ইনি আপনার পিতা মি. কুচবিহারী। প্লাস্টিক সার্জারী করে নিজের চেহারা পাল্টে ফেলেছেন। সে এক বিরাট ইতিহাস। সংক্ষেপে বলছি।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল শহীদ, 'মি. কুচবিহারী, মি. আজমল রব্বানী এবং মি. শরীফ চাকলাদার, এই তিনজন একটা অবৈধ ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। চোরাচালানের ব্যবসা। অ্যাকটিভ পার্টনার ছিলেন কুচবিহারী। বাকি দুজন অংশীদার হলেও ব্যবসার রহস্য জানার কোন সুযোগ পেত না। ওরা দুজন সন্দেহ করে যে মি. কুচবিহারী তাদেরকে ঠকাচ্ছে। ফলে ওরা ঠিক করে মি. কুচবিহারীকে খুন করতে হবে। কিন্তু ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ফেলে ডলি। ডলি খবরটা দেয় নওশেরকে। নওশের দেয় মি. কুচবিহারীকে। ফলে কুচবিহারী ঠিক করেন তিনিই আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারকে খুন করবেন। এটুকু আমরা তথ্য এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলতে পারি। বাকিটা শোনা যাক স্বয়ং মি. কুচবিহারীর নিজের মুখে। নিন, মি. কুচবিহারী, শুরু করুন।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল কুচবিহারী। মুখ তুলে শহীদের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আমি পাপ করেছি। টাকার লোভ আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। তাই প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও চোরাচালানে নামি আমি। পাপ করেছি, তার উপযুক্ত শাস্তি আমাকে দিন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'বলুন।'

'আমার পাপের শাস্তি যেন আমাকেই দেয়া হয়। আমার মেয়ে সুলতা ফুলের মত নিষ্পাপ, পবিত্র। ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়···।'

'ওর কোন ক্ষতি যাতে না হয় তা আমরা দেখব, সরকার দেখবে।'

কুচবিহারী বলল, 'তাহলে আমি শুরু করি। শরীফ চাকলাদার এবং আজমল রব্বানী আমাকে খুন করবে একথা জানার আগেই আমি ওদেরকে খুন করার প্রস্তাব দিই নওশেরকে। কিন্তু নওশের পরদিন আমাকে বলে যে ওরাও নাকি আমাকে খুন করতে চায়, সে জানতে পেরেছে। যে টাকায় ওদেরকে খুন করতে রাজি হয়েছিল নওশের, তার চেয়ে বেশি টাকা দাবি করে সে। বেশি টাকা দিতেও রাজি হই

আমি। কিন্তু পরে ফোনে নওশের আমাকে জানায় যে আজমল এবং শরীফ নাকি তাকে একই পরিমাণ টাকা দিতে চেয়েছে আমাকে খুন করার জন্যে। আমি নওশেরের চালাকি বুঝতে পারি। ওকে আমি ফোনে বলি যে ওরা যে পরিমাণ টাকা দেবে বলেছে আমি তারচেয়েও বেশি টাকা দেব। সে যেন বিকেল চারটেয় বক্সনগরের মন্দিরে হাজির থাকে, আমি টাকা নিয়ে যাব। আমি কিন্তু মনে মনে তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি নওশেরকে খুন করার। মন্দিরে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় শুনলাম আমার মেয়ে সুলতা ফোনে কথা বলছে উজান চৌধুরীর সাথে। উজান চৌধুরী আমাদের বাড়িতে আসছে একথা বুঝতে পেরে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আমি উজান চৌধুরীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি বাড়ির পিছনের সিঁড়ির আড়ালে। কয়েক মিনিট পরই উজান চৌধুরী আসে। আমি পিছন থেকে তার মাথায় লোহার রড মেরে অজ্ঞান করে ফেলি। অজ্ঞান দেহটা সকলের অগোচরে আমার গাড়ির পিছনের বনেট তুলে লুকিয়ে রাখি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এরপর আমি ফোন করি মিজান চৌধুরীকে।'

দম নেবার জন্যে থামে কুচবিহারী।

তারপর আবার সে শুরু করে, 'মিজান চৌধুরী আমাকে সাহায্য করতেন। খুলেই বলি। মূলত ভারত থেকে সোনা আমদানি করাই ছিল আমার পেশা। সোনা নিয়ে আসত একদল লোক পেটের ভিতর করে। মিজান চৌধুরী ডাক্তার। তিনি পেট কেটে সোনা বের করে আবার সেলাই করে দিতেন পেট। এর জন্যে ভাল টাকা দিতাম। এই পেট কাটা এবং সেলাইয়ের কাজ হত বক্সনগরের মন্দিরে। সুতরাং মিজান সাহেবকে ফোন করে মন্দিরে যাবার কথা বলতে তিনি আপত্তি না করে রাজি হয়ে যান। আমরা মন্দিরে যাই। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে আমি দেখি নওশের আবদুল্লাকে কে খুন করে রেখে গেছে।'

'তারপর?'

কুচবিহারী বলে, 'তখনও আজমল এবং শরীফকে খুন করার পরিকল্পনা আছে আমার। নওশেরের লাশ দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। নওশেরের লাশের মুখটা আমি ছোরা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করলাম, যাতে কেউ চিনতে না পারে। আমার কাপড় চোপড়, আঙটি, ঘড়ি পরালাম নওশেরের গায়ে, কব্জিতে, আঙুলে। তারপর লাশটা ফেলে দিয়ে এলাম রমনা পার্কের পাশে। এদিকে উজানকে বন্ধ করে রাখলাম একটা কামরায়। তার একটা আঙুল আগেই কেটে নিয়েছিলাম। সেটা মিজান সাহেবকে দেখিয়ে বললাম প্লাস্টিক সার্জারী করে আমার চেহারা বদলে দিতে হবে। তা না হলে তার ছেলেকে খুন করব আমি। এর পরের ঘটনা তো সবই জানা আপনাদের…।'

শহীদ বলল, 'নিজের চেহারা বদলে ফেলার পিছনে আপনার উদ্দেশ্য কি ছিল?'

কাঞ্চনবিহারী ওরফে কুচবিহারী বলল, 'উদ্দেশ্য ছিল আজমল রব্বানী এবং

শরীফ চাকলাদারকে খুন করা। কুচবিহারী মরে গেছে জানলে ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠত। সেই সুযোগে ওদেরকে আমি খুন করতাম কৌশলে। কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারত না। ওদেরকে খুন করার জন্যে আমি ডলিকে কয়েকবার ফোনও করি।'

কামাল বলল, 'শহীদ, তুই যে সিগারেট কেস আর ছোরা পাঠিয়েছিলি আজ দুপুরে সে দুটোর ছবি তুলে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। দুটো ছাপ একই লোকের হাতের।'

শহীদ বলল, 'সিগারেট কেসটা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম আজ দুপুরে সুলতাদের বাড়িতে। কাঞ্চনবিহারীকে সিগারেট অফার করি। কেসটা সে ধরে। আমার উদ্দেশ্যই ছিল ওর হাতের ছাপ সংগ্রহ করা। এর আগে মি. মিজান চৌধুরীর কাছ থেকে সবকথা শুনি আমি। আর ছোরাটা পেয়েছি মন্দির থেকে। ছোরা এবং সিগারেট কেসের হাতের ছাপ একই লোকের অর্থাৎ কাঞ্চনবিহারীর হওয়ায় একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে কুচবিহারী এবং কাঞ্চনবিহারী একই লোক। এ-কথা যদি তিনি অস্বীকারও করতেন তাতেও কোন ক্ষতি হত না। আমরাই প্রমাণ করতে পারতাম।'

কামাল হঠাৎ বলে উঠল, 'একটা ব্যাপারে একদম কথা বলছিস না তুই, শহীদ। আজমল রব্বানীর খুনী কে? কে খুন করেছে সাতজন অজ্ঞাত পরিচয় লোককে?'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'সাতজন লোককে অবশ্যই খুন করেছে কুয়াশা।'

'না। কুয়াশা ওদেরকে খুন করেননি। তার সাক্ষী আমি,' সকলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বক্তার দিকে। দেখা গেল হাসতে হাসতে সুদর্শন তরুণ রাসেল ঢুকছে অফিসরুমে।

'এসো, রাসেল।' কামাল হাসিমুখে কাছে ডাকল। কামাল এবং শহীদের মাঝখানের চেয়ারে গিয়ে বসল রাসেল। বলল, 'কুয়াশার পিছনে আমি ছায়ার মত লেগে ছিলাম। আমি জানি কুয়াশা ওদেরকে খুন করেননি।'

'কিন্তু, রাসেল, মাইবয়, কুয়াশার নিজের তৈরি ঘড়ি পাওয়া গেছে লাশগুলোর সাথে, তা কি তুমি জানো?'

'ঘড়ি পাওয়া গেছে লাশের সাথে মি. কুয়াশার?' চিন্তিত দেখাল একটু রাসেলকে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখমুখ। বলল, 'কিন্তু এই ঘড়ি পাবার একটা ব্যাখ্যা আছে। ওঁর ঘড়ি পাওয়া গেছে মানে এই নয় যে ওদেরকে কুয়াশা খুন করেছেন।'

শহীদ বলল, 'সব খুলে বলো, রাসেল।'

রাসেল বলল, 'প্রথম থেকেই তাহলে শুরু করি। মি. কুচবিহারী যে চোরাচালানের কাজে লিপ্ত একথা মি. কুয়াশা সন্দেহ করছিলেন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। মি. কুচবিহারীর পিছনে লোক লাগান তিনি। নিজেও চোরাচালানের

ব্যবসার সাথে জড়িত এই পরিচয় দিয়ে তিনি নিজেও মি. কুচবিহারীর সাথে দেখা করেন। কুয়াশার উদ্দেশ্য ছিল মি. কুচবিহারী কোন্ পথে, কোন পদ্ধতিতে চোরাচালান করেন তা অবগত হওয়া। কিন্তু হঠাৎ মি. কুচবিহারী নিহত হন। এরপর কুয়াশা মি. আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারের সাথে দেখা করেন। এখানেও তিনি নিজের পরিচয় দেন একজন চোরাচালানী হিসেবে। ওদের দুজনকে বেশ কয়েক রকম মূল্যবান জিনিস উপহার দেন তিনি। তার মধ্যে কুয়াশার আবিষ্কৃত দুটো ঘড়িও ছিল। যাই হোক, মি. আজমল রব্বানী এবং মি. শরীফ চাকলাদার কুয়াশাকে একজন সমব্যবসায়ী হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং তাঁকে বলেন যে মে মাসের ছয় তারিখে ঢাকা এয়ারপোর্টে রাত বারোটায় সোনা নিয়ে সাতজন লোক আসছে, কিন্তু সার্চ করেও সোনাগুলো তাদের কাছ থেকে বের করা যাবে না, এমনই বিশেষ কৌশলে নিখুঁত পদ্ধতিতে মাল আনা-নেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন তাঁরা। নির্দিষ্ট সময়ে কুয়াশা ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সাতজন লোককে হাইজ্যাক করেন. লোকগুলোকে সার্চ করার জন্যে। হাইজ্যাক করে কুয়াশা লোকগুলোকে তাঁর আজিমপুরের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যান। সেখানে লোকগুলোকে সার্চ করেন কুয়াশা। অনায়াসেই তিনি জানতে পারেন যে লোকগুলোর পেটের ভিতর সোনা আছে। যা জানার জেনে নিয়ে তিনি ছেড়ে দেন ওদেরকে। আমার সামনে দিয়ে লোকগুলো কুয়াশার ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে যায়।'

'তাহলে লোকগুলোকে খুন করল কে?' মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন।

রাসেল কামালের দিকে ফিরে বলল, 'মি. মিজান চৌধুরীর চেম্বারে চুরি হয়েছে, শুনেছি। শুনেছি হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। এদিকে মি. আজমল রব্বানীর মদের বোতলেও পাওয়া গেছে হাতের ছাপ। আমি জানতে চাই দুটো হাতের ছাপ কি একই লোকের?'

'হ্যাঁ,' বলল কামাল।

পকেট থেকে একটা রুমালে জড়ানো কাঁচের গ্লাস বের করল রাসেল। বলল, 'এই গ্লাসে একজন লোকের হাতের ছাপ আছে। এর সাথে যদি মদের বোতল এবং মি. মিজান চৌধুরীর চেম্বারে পাওয়া হাতের ছাপের মিল হয় তাহলে আমি বলে দিতে পারব কে মি. মিজান চৌধুরীর চেম্বার থেকে চুরি করেছে, কে মি. আজমল রব্বানীকে খুন করেছে এবং কে সাতজন লোককে হত্যা করেছে।'

বোতলটা রাসেলের কাছ থেকে নিয়ে একজন ইন্সপেক্টরকে দিয়ে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি গ্লাসটা কোথেকে নিয়ে এলে বলো তো?'

রাসেল বলল, 'ঢাকা এয়ারপোর্টের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে কুয়াশা এবং এক ভদ্রলোক নাস্তা পানি খাচ্ছেন দেখে এসেছি। কুয়াশার সঙ্গী ভদ্রলোক যে গ্লাসে পানি খেলেন সেই গ্লাসটা সংগ্রহ করলাম ওয়েটারকে দশ টাকা ঘুষ দিয়ে। ভদ্রলোকের

হাতের ছাপ কামাল ভাইয়ের প্রয়োজনে লাগতে পারে মনে করেই এ কাজ করেছি আমি। কাজটা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তা না হলে আরও তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম। যাক, এবার আমাকে যেতে হয়।'

'কোথায় যাবে আবার তুমি?' জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।

রাসেল বলল, 'কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা। কুয়াশা ভদ্রলোককে নিয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে বসে আছেন। কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কারণ আছে। কারণটা জানা দরকার।'

শহীদ বলল, 'আজও কি মাল আসছে চোরাচালান হয়ে?'

এবার কথা বলে উঠল কুচবিহারী, 'আজ এগারো তারিখ না? হ্যাঁ, আজও মাল আসবে। কিন্তু মাল আসার কথা আর কারও তো জানার কথা নয়।'

'আপনার ব্যবসার অংশীদাররা অত বোকা নয়, মি. কুচবিহারী। আপনি না জানলে কি হবে, তারা সব খবরই জানত। আপনি যে তাদেরকে ঠকাচ্ছেন তার প্রমাণ পেয়েই তারা আপনাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।'

শহীদ কথাগুলো বলে তাকাল রাসেলের দিকে, 'শুনলে তো, আজও মাল আসছে।'

রাসেল কুচবিহারীর দিকে তাকাল, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?'

হেসে উঠল শহীদ। বলল, 'তোমার না চেনারই কথা। ওঁর নাম মি. কুচবিহারী।'

'কিন্তু...'

শহীদ বলল, 'প্লাস্টিক সার্জারী করে চেহারা বদলে ফেলেছেন...।'

রাসেল কুচবিহারীকে প্রশ্ন করল, 'ক'টার সময় মাল আসছে?'

'সন্ধ্যা সাতটায়। পঞ্চাশ পাউণ্ড সোনা আসছে দুটো কাঠের বাক্সে। কোড ওয়ার্ড—ডেলিভারী।'

ঘড়ি দেখল শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন এবং রাসেল একযোগে।

কথা বলে উঠল রাসেল, 'সময় খুব কম। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না। মাত্র পনেরো মিনিট বাকি সাতটা বাজতে।'

মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়ালেন, 'পৌঁছুতেই হবে, রাসেল। কুয়াশার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। সোনাগুলো সে চায়। কিন্তু আমরা তার আশা পূরণ হতে দেব না। চলো, রাসেল।'

এমন সময় ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে এল ইন্সপেক্টর। সে জানাল, 'তিনটে হাতের ছাপই এক লোকের।'

রাসেল বলল, 'তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল যে মি. মিলান চৌধুরীর চেম্বার থেকে বিষ চুরি করেছিল শরীফ চাকলাদার। সে-ই খুন করেছে সাতজন সোনা বহনকারী লোককে। মি. আজমল রব্বানীর মৃত্যুর জন্যেও দায়ী সে-ই।'

কামাল বলল, 'তোমরা সবাই যাও। আমি একটু পরে আসছি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আকরমকে গ্রেফতার করো, ইন্সপেক্টর। গ্রেফতার ক
মি. কুচবিহারীকেও। ডলিকেও গ্রেফতার করো। ব্ল্যাকমেলিং করার জন্যে নওা
আবদুল্লাকে সাহায্য করত ও। মিস সুলতা, আপনি যেতে পারেন।'

শহীদ তাকাল মিজান চৌধুরীর দিকে।

মি. সিম্পসন বলেই চলেছেন, 'মি. মিজান চৌধুরীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আ
ওকেও গ্রেফতার করো, ইন্সপেক্টর।' অফিসরুমের দু দিকের কোণ থে
কনস্টেবলরা এগিয়ে এল হাতকড়া নিয়ে ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে।

রাসেল বলে উঠল, 'আর দেরি করলে কুয়াশাকে বাধা দেয়া সম্ভব হবে না,
সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়ালেন।

শহীদ বলল, 'চলো।'

এয়ারপোর্টের গেটের সামনে এসে থামল মি. সিম্পসনের জীপ।

রাসেল বলল, 'আপনারা জীপেই বসে থাকুন। আমি রিফ্রেশমেন্ট রুমে যাচ্
দেখে আসি ওরা কি করছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরো। দেরি কোরো না।'

রাসেল বলল, 'ওদের দুজনের কাউকে দেখামাত্র আটকাবেন। তাড়াতা
ফিরে আসব আমি।'

চলে গেল রাসেল। ওরা জীপে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের প্রকাণ্ড গেট দিয়ে লোকজন যাচ্ছে আসছে। কড়া দ
রেখেছেন মি. সিম্পসন গেটের দিকে। ইউরোপিয়ান, আমেরিকান নিগ্রো, ভারতী
নেপালী, ইরাকী, বার্মীজ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের লোক বেরিয়ে আসছে ভি
থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে যে যার গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটছে।

অস্থির হয়ে উঠল শহীদ। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে ও। রাসেল গেছে ৩
পনেরো মিনিট হয়ে গেল। এখনও ফিরছে না কেন সে?

এদিকে রাসেল রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকে দেখে ভয়ানক গণ্ডগোল। সং
ল্যাভেটরির দরজার সামনে লোকজনের ভিড়। সবাই উত্তেজিত। ভিড় ঠে
ল্যাভেটরির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে
জানতে পারল যে আধঘন্টা আগে দুই ভদ্রলোক ল্যাভেটরিতে ঢুকেছেন। অনেকে
দেখেছেন ঢুকতে। কিন্তু এখনও তাঁরা বের হচ্ছেন না। দরজা ভিতর থেকে ব
এত ডাকাডাকি, চেঁচামেচি হচ্ছে অথচ ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। রহস্য
কাণ্ড তাতে আর সন্দেহ কি!

কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করে দরজা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল রাসেল।

সকলের মিলিত চেষ্টায় ভেঙে ফেলা হলো দরজা।

ল্যাভেটরির মেঝেতে দেখা গেল শরীফ চাকলাদারের দেহ। দেহটার পাশে বসে পরীক্ষা করল রাসেল। মরেনি, জ্ঞান হারিয়েছে মাত্র। বুঝতে বাকি রইল না রাসেলের এ-কাজ কুয়াশার।

জানালার গ্রিল খুলে অন্য পথে ল্যাভেটরি থেকে পালিয়েছে কুয়াশা। রাসেল শঙ্কিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে কুয়াশা হয়তো সোনা নিয়ে কেটেও পড়েছে।

ভিড় কমাবার অনুরোধ করে রাসেল উপস্থিত লোকজনদেরকে বলল, 'অজ্ঞান এই ভদ্রলোককে আমি চিনি। পুলিস একে খুঁজছে। গেটের বাইরে…।'

শহীদ, মি. সিম্পসন এবং কামালকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে।

কামাল পুলিস বাহিনী নিয়েই এসেছে। ফলে ভিড় সরাতে দেরি হলো না। রাসেলের কাছ থেকে সব কথা শুনে মি. সিম্পসন এবং কামাল গোটা এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা প্রায় অবরোধ করে ফেলল। শরীফ চাকলাদারের অজ্ঞান দেহটা পাঠিয়ে দেয়া হলো পুলিস ভ্যানে।

আধঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পরও কুয়াশার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সে যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসের সাথে।

রাসেল হতাশ গলায় বলল, 'ভেগেছেন তিনি!'

'কিন্তু সোনাগুলো সে পাবে কিভাবে? যারা নিয়ে এসেছে তারা কি এতই বোকা যে কুয়াশা চাইলেই তাকে দিয়ে দেবে?'

রাসেল বলল, 'কুয়াশা নিশ্চয়ই শরীফ চাকলাদারের কাছ থেকে কোড ওয়ার্ড জেনে নিয়েছিলেন।' কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

রাসেল বলল, 'আশ্চর্য! কুয়াশা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোন দিক দিয়ে পালালেন বলুন তো? আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে রেখে ভিতরে ঢুকলাম যখন তারপর গেট দিয়ে কুয়াশা বেরিয়ে যাননি তো?'

শহীদ বলল, 'না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'গেটের দিকে আমি নজর রেখেছিলাম। দেশী লোক খুব কমই দেখেছি। যারা বেরিয়ে গেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদেশী।'

রাসেল বলল, 'মি. কুয়াশা কিন্তু বিদেশীদের ছদ্মবেশ নিয়েই আছেন।'

'তারমানে!'

রাসেল বলল, 'কেন, আপনারা জানেন না? কুয়াশা ক'দিন থেকেই বার্মীজদের পোশাক পরে আছেন। মি. কুচবিহারী, মি. আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারকে বার্মীজ হেসেবেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।'

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. সিম্পসন।

রাসেল তাকিয়ে রইল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'একজন লম্বা-চওড়া বার্মীজকে আমি গেট দিয়ে বেরি আসতে দেখেছিলাম। লোকটার হাতে দুটো রঙের বাক্স ছিল।'

রাসেল বলে উঠল, 'তিনিই কুয়াশা! কী সাংঘাতিক, আপনাদের চোখে সামনে দিয়ে চলে গেলেন, অথচ···।'

শহীদ বলল, 'ছি ছি ছি! এতটা অমনোযোগী হওয়া আমাদের উচিত হয়নি।'

থানায় জ্ঞান ফিরে এল শরীফ চাকলাদারের। আজমল রব্বানীকে খুন ক কথা স্বীকার করল সে। স্বীকার করল সাতজন লোককে খুন করার কথাও। সাত লোককে খুন করার কারণ হিসেবে সে যা বলল তাতে তার নিষ্ঠুর, দয়ামায়া প্রকৃতির পরিচয়ই ফুটে ওঠে।

কুয়াশা লোকগুলোকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়েছিল, পরে তাদেরকে ছে দেয়। ছাড়া পেয়ে লোকগুলো রব্বানীর বাড়িতে যায়। লোকগুলো জানায় যে ত কুচবিহারীকে না পেয়ে তাদের কাছে এসেছে। কারণ ওরা জানে কুচবিহা বিজনেস-পার্টনার তারা। কুয়াশা লোকগুলোকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেড়ে দে শরীফ চাকলাদার সন্দেহ করেছিল এই ছেড়ে দেয়ার পিছনে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আ হাইজ্যাকার সাতজন লোককে নিজের দলের হয়ে কাজ করাতে রাজি ক ফেলেছে, ভবিষ্যতে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সন্দেহে সে খুন ক সবাইকে। এ ব্যাপারে তার সাথে একমত হয়নি আজমল রব্বানী। সাত লোকের পেট থেকে উদ্ধার করা সোনার ভাগ দিতে হবে আজমল রব্বানীকে কথা ভাবতেই খারাপ লাগছিল তার। আরও একটা ভয় তার ছিল। সাত লোককে খুন করার ব্যাপারে আজমল রব্বানী ভবিষ্যতে তাকে ব্ল্যাকমেইল কর পারে। এই দুই কারণে সে তাকে খুন করে। আজমল রব্বানীর জলসাঘ আলমারিতে রাখা মদের বোতলে বিষ মিশিয়ে রেখে এসেছিল সে।

শরীফ চাকলাদারকে প্রশ্ন করে আরও জানা গেল যে ভারত থেকে আজ স সাতটায় যে সোনা এসেছে তা তরল এবং রঙিন। কাঠের বাক্সের ভিতর দু রঙের টিনে থাকবে এই তরলীকৃত সোনা।

রাত দশটায় একজন লোক দেখা করতে এল মি. সিম্পসনের সাথে। লো একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠিটা কুয়াশা পাঠিয়েছে।

সে লিখেছেঃ

'মি. সিম্পসন, পত্র বাহকের হাতে দুটো টিন পাঠালাম। এ দুটো টিন শরীফ চাকলাদারের লোক ভারত থেকে আজকের সন্ধ্যা সাতটার ফ্লাইটে নিয়ে এসেছে। ভিতরে তরল সোনা ছিল। বের করে নিয়েছি আমি। খালি টিন দুটো পাঠালাম টিনের গায়ে যে তরল সোনা এখনও এক-আধটু লেগে আছে তা পরীক্ষা করার জন্যে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন কি কি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সোনাকে তরল

অবস্থায় রাখা যায়।

সোনা বের করে নিয়েছি বলে রাগ করবেন না। উদ্ধারের চেষ্টাও করবেন না দয়া করে। ধানমণ্ডির পাশে যে বস্তিগুলো আছে সেখানে বাস করে কিছু সম্বলহীন, নির্যাতিত মানব সন্তান। ওদের দুঃখ সহ্য করা যায় না। ওদেরকে অল্প-স্বল্প সাহায্য করার চেষ্টা করি সুযোগ পেলেই। আজও সুযোগ পেয়েই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি। মোট সোনার মূল্য হিসেব করে যে টাকা হয় সেই পরিমাণ টাকা ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। আজ ওরা সারারাত ঘুমাবে না। আনন্দে। আগামীকাল ওরা পেট ভরে খেতে পাবে। রোগে ভুগছে যারা তারা ওষুধ কিনবে। যারা প্রায় উলঙ্গ থাকে তারা কাপড় চোপড় কিনবে। আশা করি ওদের ওপর জুলুম করবেন না। ওরা দোষী নয়। সব দোষ আমার। পারলে আমাকে ধরার চেষ্টা করুন। হাতে নাতে।

আমাকে ধরার চেষ্টা যে আপনি এবার পুরোদমে করবেন সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। এই চিঠিটা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের কথা চিন্তা করবেন না। কারণ আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যাবে লেখাগুলো। সাদা হয়ে যাবে পাতাটা। শীঘ্রি শেষ অংশটুকু পড়ে হাত থেকে ফেলে দিন কাগজটা। একটু পরেই আগুন ধরে যাবে এতে।

আরও একটা কথা বলে শেষ করব আমার বক্তব্য। যে সাতজন লোকের লাশ পাওয়া গিয়েছে তাদেরকে আমি খুন করেছি বলে আপনার বিশ্বাস, কিন্তু তা সত্যি নয়। ওদেরকে হাইজ্যাক করি আমি তা ঠিক। কিন্তু ছেড়ে দিই। কেন জানেন? কারণ ওদের সাথে কথা বলে, ওদেরকে বুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে সৎ পথে ফেরত আনার কোন উপায় নেই। ছেড়ে দিয়েছিলাম, নিজেদের পাপের ফল নিজেরাই ভোগ করুক গিয়ে—এই মনে করে। জানতাম ধরা ওদের পড়তেই হবে, শাস্তিও নিতে হবে মাথা পেতে। কিন্তু বজ্রপাতের মতই বড় দ্রুত ঘটে গেল শাস্তিটা। বড় নির্মম। আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি শরীফ চাকলাদার ওদেরকে এভাবে খুন করে ফেলবে।

যাই হোক, আজ এখানেই শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে—কুয়াশা।'

চিঠিটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই লক্ষ করলেন মি. সিম্পসন মিলিয়ে যাচ্ছে লেখাগুলো। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন তিনি কাগজটার দিকে। এমনি সময় দপ করে আগুন ধরে গেল কাগজটায়।

খসে পড়ে গেল কাগজটা তাঁর হাত থেকে।

কুয়াশা ৪৪

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৭৫

এক

রাত বারোটা বাজতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি।

প্রফেসর ওয়াই নরম কার্পেট বিছানো বিশাল ডিম্বাকৃতি আণ্ডারগ্রাউণ্ড কন্ট্রোলরুমে পায়চারি করছেন। টিউব লাইটের সাদা আলোয় তাঁর কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক চিক করছে। ফোলা ফোলা লাল গাল দুটো মাঝে মধ্যে কাঁপছে। আপন মনে বিড় বিড় করছেন তিনি। কখনও আশার আলো ফুটে উঠছে মুখের চেহারায়, কখনও আশঙ্কার কালো মেঘ ছায়া ফেলছে দু'চোখে।

ঢং, ঢং, ঢং…।

রাত বারোটা।

বাঁ বগলের ক্রাচটা ডান হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসর ওয়াই। বাঁ পায়ের গোড়ালি নেই তাঁর। গোড়ালিহীন পা'টা আবার বাঁকাও একটু। ক্রাচ ছাড়াও হাঁটতে পারেন তিনি, তবে একটু কষ্ট হয়।

লাল টকটকে চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে যেন প্রফেসর ওয়াইয়ের। লাল টেলিফোনটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি।

'অপারেশন শুরু হয়েছে!' বিড় বিড় করে বললেন।

আবার শুরু করলেন পায়চারি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলালেন কিছুক্ষণ। মেহেদি রাঙানো পরিপাটি মাথার চুলে আঙুল চালালেন। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে মুছলেন সাদা রুমাল দিয়ে। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে তাঁর।

কন্ট্রোলরুমের চারদিকের দেয়ালে, সিলিঙের কাছাকাছি, চারটে ইস্পাতের তৈরি হাতির মাথা দেখা যাচ্ছে। অক্সিজেন ঢোকার এবং কার্বনডাই অক্সাইড বেরোবার পথ আসলে ওই হাতির মাথাগুলো। রুমের এক কোনায় পাশাপাশি দাঁড় করানো রয়েছে দুটো টিভি। দুটোই অন করা। এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড আস্তানার দুটো প্রবেশ পথের সম্মুখভাগ দেখা যাচ্ছে টিভিদুটির স্ক্রীনে। পশ্চিম দিকের দেয়াল জুড়ে তিনটে ম্যাপ সাঁটা দেখা যাচ্ছে। একটি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, দ্বিতীয়টি এশিয়ার ম্যাপ, তৃতীয়টি বাংলাদেশের। পুব দিকে দেয়ালে ঝুলছে দুটো অটোমেটিক কারবাইন, একটা মেশিনগান। উত্তর দিকে দেয়ালে প্রকাণ্ড ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রটা। পৃথিবীর যে কোন

দেশের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এই যন্ত্রের সাহায্যে।

কন্ট্রোলরুমের মাঝখানে ডিম্বাকৃতি একটি টেবিল। টেবিলের উপর দুটো ফোন, ইন্টারকম, এগারোটা বোতামসহ একটি সুইচবোর্ড, ফাইলপত্র, চকচকে কালো একটা রিভলভার, কলম-পেন্সিল, হাইপডারমিক সিরিঞ্জ, কয়েকটা শিশি প্রভৃতি হরেক রকম জিনিস শোভা পাচ্ছে।

প্রকাণ্ড কন্ট্রোলরুমের কোথাও দরজার চিহ্ন মাত্র নেই। তবে প্রবেশপথ একটা নয়, একাধিক আছে। দেখা না গেলেও প্রফেসর ওয়াই জানেন কোন্ বোতাম টিপলে কোনদিকের দেয়াল ফাঁক হয়ে যাবে। যে কোন মুহূর্তে প্রফেসর ওয়াই ল্যাবরেটরিতে বা স্টাডিরুমে বা মেকআপ রুমে কিংবা টরচার চেম্বারে উপস্থিত হতে পারেন এখান থেকে।

ক্রাচে ভর দিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর ওয়াই। ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে বললেন, 'ল্যাবরেটরিতে দুটো বানর চাই আমি। সাধন, পেরু থেকে যে পার্সেলটা এসেছে সেটা খোলোনি তো? ওতে ইউরেনিয়াম আছে—হ্যাঁ, কাজে বসব আমি আজ রাতেই। সেই বেঁটে লোকটার উচ্চতা মেপেছ সন্ধ্যার পর?···বেড়েছে, না?···দু'ইঞ্চি বাড়ল সাতদিনে···কিন্তু মেডিসিন আর দেয়া যায় না ওকে, মারা যাবে, এদিকে বাড়ছে না আর···চিন্তার কথা। যাকগে, আস্তানা নম্বর পাঁচ, সতেরো, উনত্রিশ, সাতচল্লিশ—সব জায়গায় খবর পাঠাও, টাকা পাঠায় যেন যত বেশি সম্ভব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

আবার পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর ওয়াই। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। বিড় বিড় করছেন আপন মনে, 'টাকা দরকার। লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা! মাই গড, কত কাজ পড়ে রয়েছে অসমাপ্ত। প্রজেক্ট ইমিটেশন হার্ট টাকার অভাবে স্থগিত রয়েছে। বেঁটে মানুষকে লম্বা করার পরীক্ষায় প্রায় সফল হয়েছি আমি, টাকার অভাবে আমদানি করা যাচ্ছে না দুষ্প্রাপ্য কেমিক্যালস্, ফলে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, নিখুঁত হচ্ছে না এক্সপেরিমেন্ট। নাহ্, এভাবে চলতে পারে না। যেভাবেই হোক টাকা যোগাড় করতে হবে। নিকট মহাশূন্যে স্থিতিশীল শহর নির্মাণের পরিকল্পনাটা কাগজে কলমেই রয়ে যাচ্ছে, টাকা নেই বলে হাত দিতে পারছি না কাজে! মানুষের ফুসফুস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েও পিছিয়ে এলাম, টাকা নেই। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুসফুসের উন্নতি, এবং পরিবর্তন করতে পারলে মানুষ যেমন ডাঙায় বসবাস করছে তেমনি পানিতেও বসবাস করতে পারবে···।'

প্রফেসর লাল টেলিফোনটার দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। রিস্টওয়াচ দেখলেন। বারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট হয়েছে। খবর আসছে না কেন এখনও? একশো বত্রিশটা ট্রাক—কতক্ষণ লাগবে বর্ডার পেরিয়ে যেতে? দূরত্ব তো মাত্র চার মাইল!

আবার পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর ওয়াই। বিড় বিড় করছেন আবার।

'টাকার ব্যবস্থা হবে, হবে। ভয় পাবার কিছু নেই। আজকের অপারেশন সাক্সেসফুল হতে বাধ্য! খামোকা আশঙ্কা করছি। নিজে তদারক করে এসেছি, সব পুরোপুরি নিখুঁত দেখে এসেছি। খবরটা এল বলে, আর দেরি নেই।—বেশ ভাল টাকা পাব এই অপারেশনে। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্যাশ। তার ওপর এক মন সোনা···। অভাব মোটামুটি দূর হবে সাময়িক ভাবে···।'

ক্রিং ক্রিং ক্রিং···!

পড়িমরি করে টেবিলের দিকে এগোলেন প্রফেসর। ক্রাচটা পড়ে গেল বগলচ্যুত হয়ে। টেবিলটা ধরে ফেলে কোনমতে তাল সামলালেন তিনি। থরথর করে কাঁপছে হাত। ক্রেডল থেকে তুলে নিলেন তিনি কাঁপা হাতে লাল রিসিভারটা। 'হ্যালো···শাহীন!···হোয়াট!···রোড ব্লক ফ্রম মিলিটারী? ইমপসিবল! পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোন ক্যাম্প থাকার কথা নয়···বুঝতে পারোনি ওরা কারা? ইডিয়ট!···মেশিনগান, মর্টার, মাইন ব্যবহার করা হয়েছে—মাই গড!···হোয়াট অ্যাবাউট গোল্ড?···ওহ জেসাস! ওহ জেসাস!—শাহীন, এসব কি বলছ তুমি! পাবলিক, একজন সাধারণ লোক, তোমাদের দুশো জন সশস্ত্র লোককে পিছু হটিয়ে দিয়েছে···ট্রাক দখল করে নিয়েছে, সোনা কেড়ে নিয়েছে···আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? ওহ জেসাস! ···শাহীন, আমি ওদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় চাই। ইয়াহ্, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওদের কর্তার, ইয়েস! আই ওয়ান্ট টু নো হু ইজ দ্যাট বাস্টার্ড!'

রিসিভার নামিয়ে রেখে টেবিলের প্রান্ত ধরে কোনরকমে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখছেন প্রফেসর ওয়াই। ঘামছেন তিনি। কাঁপছেন। উন্মাদের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে চোখের অগ্নিগোলক দুটো।

'সব শেষ করে দিয়েছে! হলো না, কাজ হলো না! অভাব আমার ঘুচল না এবারও। ওহ্ জেসাস! কিন্তু কার এই দুঃসাহস! দেখব, তাকে আমি দেখব! এই পৃথিবীর বাতাস তার জন্যে নিষিদ্ধ করে দেব আমি!'

দুই

শাওয়ারে স্নান সেরে সুসজ্জিত হয়ে বেডরুমে ঢুকল শখের গোয়েন্দা শহীদ খান। অপর দরজা দিয়ে একই সাথে ঢুকল মহুয়া। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মহুয়া বলল, 'রেডি?'

মহুয়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শহীদের হাত দুটো ধরে নামিয়ে দিল ওর দু'পাশে, নিজেই টাইয়ের নট ঠিক করে বেঁধে দিতে দিতে বলল, 'ডাইনিংরুমে যাও তুমি।'

'আর তুমি?'

মহুয়া বলল, 'কামাল নামেনি ছাদ থেকে। দেখে আসি কি করছে।'

মুচকি হাসল শহীদ। বলল, 'কাজ পাচ্ছে না বেচারা। গত একমাসে দেশে বড়

রকমের কোন অঘটন ঘটেনি—মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। বেশি ঘাঁটিয়ো না ওকে।'

'এই সাত সকালে তোমাদের সাথে আমি ঝগড়া করতে চাই না। কিন্তু কথাটা না বলেও পারি না। বেশ ভালই তো আছি আমরা সবাই। দেশে অঘটন ঘটলে বড় আনন্দ পাও, না? কিরকম মানুষ তোমরা বুঝি না। একমাত্র কামনা তোমাদের—কিছু একটা ঘটুক! আশ্চর্য! তবে শকুনের দোয়ায় কি আর গরু মরে···।'

মহুয়ার কথা কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না শহীদ। ইতিমধ্যে সোফায় বসেছে সে। হাতে তুলে নিয়েছে সকালবেলার দৈনিক পত্রিকাটা। গভীর মনোযোগের সাথে সেটাই পড়ছে সে।

গুলশানের বাড়ি এটা শহীদের। পা টিপে টিপে ছাদে উঠল মহুয়া। দেখল কামাল শক্তিশালী বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে আছে পুব দিকে।

অবাক হলো মহুয়া। কামাল গতকাল রাত এগারোটায় ছাদে উঠল বাকি রাতটুকু নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি দেখে কাটাবে বলে। শহীদকে এ কাজের শরিক করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে। শহীদ ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব-পত্র দেখার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন। লাভ লোকসানের হিসেব নিয়ে চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসেছে।

পা টিপে টিপে কামালের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল মহুয়া। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কি দেখছে কামাল অমন গভীর মনোযোগের সাথে! চোখ কপালে উঠল মহুয়ার! ও, এই ব্যাপার! মাইল খানেক দূরে একটি বাড়ির সুইমিং পুল দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ স্নান করছে ওখানে—খালি চোখে মহুয়া পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, মেয়েরাই সাঁতার কাটছে।

হাত উঁচু করে কামালের কান চেপে ধরল মহুয়া শক্ত করে।

'কে—মাগো! মহুয়াদি, ছাড়ো···উঃ! লাগে বলছি···।'

কান ধরে হিড় হিড় করে সিঁড়ির দিকে কামালকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মহুয়া খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'নক্ষত্র, গ্রহ এসব বুঝি আজকাল সুইমিং পুলে নেমে এসেছে!'

'ছাড়ো,লাগছে···লোকে কি বলবে দেখলে···।'

'লোক কোথায়? ওই মেয়েগুলো, যারা সাঁতার কাটছিল? ওরা যদি দেখে থাকে তাহলে ভাববে আমি তোমার দজ্জাল বউ, কুকর্ম করাতে শাসন করছি।'

'মহুয়াদি, অপরাধ করেছি, মাফ চাই···। আসলে ডি. কস্টা···'

'তুমি বলতে চাও ডি. কস্টা ব্রেসিয়ার পরে নেমেছে ওই সুইমিং পুলে?'

'না, না। সুইমিং পুলে না। আশেপাশেই ঘুর ঘুর করছে। ওকে দেখতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল মেয়েগুলো। বিশ্বাস করো, দশ সেকেণ্ডের বেশি দেখিনি ওদের। এবার কানটা ছাড়ো, লক্ষ্মী দিদি। তোমাকে চাইনিজ খাওয়াব। উঃ!'

'ঠিক আছে, ছাড়ছি। নিজে ধরো এবার। দশবার উঠবস করে নেমে এসো

নিচে। আর হ্যাঁ···চাইনিজের কথাটা আবার ভুলে যেয়ো না যেন।'

নিচে নেমে সোজা বাথরুমে ঢুকল কামাল। বেরুল দশ মিনিট পর। ড্রইংরুমে ঢুকতেই কানে গেল গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'কাণ্ড ঘটেছে রে, কামাল।'

শহীদ হাতের দৈনিক পত্রিকাটা সামনের নিচু টেবিলে রেখে বলল, 'বর্ডারে একশো সাতচল্লিশটা ট্রাক ধরা পড়েছে, চাল ভর্তি। বর্ডার পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছিল। এক হাজার টনেরও বেশি হবে—পঞ্চাশ লাখ টাকার চেয়েও বেশি মূল্য, বাজারদর অনুযায়ী।'

ধপ করে সোফায় বসল কামাল, 'বলিস কি!'

'পড়ে দেখ আরও মজার তথ্য আছে।'

মহুয়া বলে উঠল, 'সেরেছে। এই সক্কালবেলা তোমরা মজার তথ্য নিয়ে মেতে উঠবে! বলি ব্রেকফাস্ট কি আমার একার জন্যে তৈরি হয়েছে?'

কামাল ততক্ষণ খবরের কাগজে নিমগ্ন। শহীদ চিন্তা করছে চোখ বুজে। ওরা কেউ যেন মহুয়ার কথা শুনতেই পায়নি। এদের সাথে রাগারাগি করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে অসহায় দৃষ্টিতে দু'জনকে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে দুপ্‌দাপ পায়ের শব্দ করে বেরিয়ে গেল মহুয়া।

কামাল বলে উঠল, 'কী সাংঘাতিক! কে এই এহসান চৌধুরী? ভদ্রলোককে "বীরশ্রেষ্ঠ" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা উচিত।'

'তুই ঠাট্টা করছিস?'

কামালকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে, 'মোটেই না! ভেবে দেখ কী অসাধ্য সাধন করেছেন ভদ্রলোক। ঢাকায় থাকতে তিনি খবর পান একদল চোরাচালানকারী প্রচুর চাল বর্ডারের ওপারে পাচার করার চেষ্টা করছে। পাচারকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় পাননি তিনি। কিন্তু তাদেরকে অনুসরণ করার সুযোগ পান। ভদ্রলোকের সাথে মাত্র নয়জন সাহায্যকারী ছিল। বর্ডারের এমন এক জায়গা দিয়ে একশো সাতচল্লিশ ট্রাক চাল পাচারের চেষ্টা চলছিল যেখানে কোন সামরিক ঘাঁটি নেই। জায়গাটা স্বভাবতই বনভূমির গভীরে এবং দুর্গম। কিন্তু পাচারকারীরা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে পাচারের পথ সুগম করার জন্য। সংখ্যায় তারা ছিল দুইশো লোক। সবাই সশস্ত্র। ওদের কাছ থেকে নানা রকম অস্ত্র এবং বোমা ছিনিয়ে নিয়ে এই এহসান চৌধুরী এবং তার নয়জন সাহায্যকারী বাধা দেয় পাচারের কাজে—ফলে ট্রাক রেখে পাচারকারীরা জান নিয়ে পালায়। শহীদ, তুই যা-ই বলিস, এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এর মধ্যে, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, রহস্য আছে। কে এই এহসান চৌধুরী? এমন যার সাহস, তাকে দেশের লোক চেনে না কেন? চাল কেনা বেচারই ব্যবসা করে; বলছে রিপোর্টার, তাছাড়া আরও ডজনখানেক ব্যবসা আছে ভদ্রলোকের। সবই বুঝলাম। প্রশ্ন হলো, এত দিন নাম শুনিনি কেন তার? আমার কি মনে হয় জানিস, শহীদ?'

'কি মনে হয়?'

'এ কাজ কুয়াশার নয় তো? এমন দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনোবল, ক্ষমতা কুয়াশারই একমাত্র আছে বলে জানতাম। এখন দেখছি—।'

শহীদ গম্ভীর হলো একটু। বলল, 'কুয়াশার কাজ বলছিস? কোন্ কাজটা বল তো? পাচার করার কাজটা, না, পাচারকারীদের ধরার কাজটা?'

কামাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।

শহীদ বলল, 'প্রথম পাতারই শেষ কলামের সবচেয়ে নিচের খবরটা পড়ে দেখ।'

কামাল খবরের কাগজটা আবার তুলে ধরল সামনে, তারপর শহীদের নির্দেশিত খবরটা পড়তে শুরু করল ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বিগ্নঃ কুয়াশার কোলকাতা উপস্থিতি। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোপন এবং বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর দস্যু কুয়াশা বর্তমানে কোলকাতা শহরে অবস্থান করছে। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাদেশিক সরকার কুয়াশা কর্তৃক সম্ভাব্য ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা সম্পর্কে আইনরক্ষক কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে সরকারের মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন দস্যু কুয়াশাকে জীবিত বন্দী করতে পারলে বা তার অবস্থানের সঠিক তথ্য দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি সাংবাদিকদের জানান, এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

কামাল নামিয়ে রাখল খবরের কাগজ।

'কি বুঝলি?'

কামাল বলল, 'কুয়াশা কোলকাতায়! তারমানে কি এই যে চাল পাচার করার ব্যবস্থাদি সেরে সে আগেভাগে কোলকাতায় চলে গেছে পেমেন্ট নিতে?'

'দূর বোকা! কুয়াশাকে তুই এতদিনেও চিনলি না! টাকা তার দরকার, সত্যি কথা। কিন্তু দেশের সম্পদ অন্য দেশে পাচার করে, দেশের চরম ক্ষতি করে কোন কাজ করার লোক সে নয়।'

কামাল বলল, 'তাহলে? পাচারকারী না হয় কুয়াশা নয় ধরে নিচ্ছি। কিন্তু এই এহসান চৌধুরীটা কে? এত টাকাই বা ইনি পেলেন কোথায়? খবরে দেখা যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলাশহরে ভুখা-নাঙ্গা অসহায় মানুষের জন্যে লঙ্গরখানা খুলেছেন এই এহসান চৌধুরী। তারপর, এই একশো সাতচল্লিশ ট্রাক চাল। তাঁর বিশেষ অনুরোধে সরকার এই চাল যুক্তিসঙ্গত মূল্যে তাঁরই কাছে বিক্রি করতে রাজি হয়েছে। এহসান চৌধুরী এই চাল কিনে লঙ্গরখানা খুলবে আরও কয়েকটা। ভেবে দেখ, কত লক্ষ টাকার ব্যাপার! বাংলাদেশে এত বড় মহান দাতা আছে—ভাবা যায়? গরীবের বন্ধু হিসেবে আমরা তো চিনি একমাত্র কুয়াশাকে।'

'এহসান চৌধুরী কুয়াশা নয় একথা জোর করে বলা যায় না, কামাল।'

শহীদের কথা শুনে কামাল হতবাক।

শহীদ আবার বলল, 'এমনও তো হতে পারে কাগজের খবরটা মিথ্যে? হয়তো কুয়াশাই রটিয়েছে। আসলে কোলকাতায় যায়ইনি সে…'। এসব আমাদের সন্দেহের কথা। বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসল কথা কি জানিস, ঘটনা মাত্র ঘটতে শুরু করেছে। তুই কি মনে করিস পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের চাল যে পাচার করছিল সে সহজে এই এহসান চৌধুরীকে ছেড়ে দেবে?'

'মাথা খারাপ! নির্ঘাৎ এহসান চৌধুরীকে খুন করবে সে।'

শহীদ বলল, 'খুন করাটাই তো বড় কথা নয়। খুনোখুনি হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে, কিন্তু তার আগে আরও কত কি ঘটতে পারে দেখ না…।'

'আবার সেই খুনোখুনির কথা!' মহুয়া প্রবেশ করল রুমে তার পিছনে ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে সন্দেশ এবং লেবু।

সন্দেশ ও লেবু দুই ভাই। দু'জনেই তোতলা। ওরা যমজ ভাই। মহুয়া ওদেরকে আবিষ্কার করে একটি গ্রাম্য মেলাতে। বয়স ষোলো-সতেরো বছর। সন্দেশ সাত মিনিটের বড় লেবুর চেয়ে। বাড়ির কাজকর্ম করে ওরা।

'ডি ডি-ডি-ডি…।' সন্দেশ টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে শহীদের দিকে তাকিয়ে বলতে চেষ্টা করছে কিছু।

বড় ভাই উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে দেখে ছোট ভাই লেবু বলতে চেষ্টা করল, 'ক-ক-কস-কস…।'

কামাল ওদেরকে সাহায্য করল, 'ডি. কস্টা?'

সন্দেশ আনন্দে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

কামাল জানতে চাইল, 'ডি. কস্টা কি করেছে?'

সন্দেশের মুখের হাসি উবে গেল। রীতিমত করুণ সুরে বলতে চেষ্টা করল সে, 'ধা-ধা-ধা-ধা…।'

লেবু যোগ দিল, 'পা-পা-পা-পা…।'

শহীদ বিরক্তির সাথে বলল, 'এযে দেখছি রীতিমত গান ধরছে দুজনে!'

মহুয়া বলল, 'এই! বেরো তোরা। আমি বলছি কি হয়েছে।'

মহুয়া ধমকে উঠতেই সন্দেশ এবং লেবু ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। কি করবে ভেবে কূল কিনারা পেল না যেন কিছুক্ষণ। তারপর, দুই ভাই একযোগে পরস্পর পরস্পরের কান ধরে দ্রুত ওঠ-বস করতে শুরু করল। পাঁচ-সাতবার ওঠ-বস করে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল বেডরুম থেকে।

হাসি মুখে মহুয়া বলল, 'গতকাল ডি. কস্টা এসে ওদেরকে রমনা পার্ক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল পার্কে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবে। ওদের

বেতনের টাকা আমার কাছে জমা থাকে। দশটা টাকা চাইল ওরা, দিলাম আমি। রাতে ফিরল দু'জন কাঁদতে কাঁদতে।'

'টাকাগুলো ধাপ্পা দিয়ে কেড়ে নিয়ে ডি. কস্টা ওদেরকে···।'

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ। ওদেরকে পার্কে বসিয়ে রেখে টিকেট কাটতে যাবার নাম করে গাড়ি নিয়ে চলে যায়, আর ফেরেনি।'

শহীদ মহুয়ার দিকে তাকাল, 'গাড়ি?'

'হ্যাঁ, দাদার সেই কালো মার্সিডিজটা।'

শহীদ এবং কামাল পরস্পরের দিকে তাকাল। কালো মার্সিডিজ কুয়াশা আর কাউকে ব্যবহার করতে দেয় না।

কামাল বলল, 'কুয়াশা তাহলে ঢাকায় নেই।'

শহীদ বলল, 'আমার সন্দেহ সত্যি হলে কোলকাতাতেও নেই সে।'

কামাল বলল, 'ঢাকায় নেই, কোলকাতায় নেই—নিশ্চয়ই সে তাহলে বর্ডারে আছে!'

শহীদ বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু যা মনে হয় কুয়াশার বেলায় তা সচরাচর সত্যি হয় না।'

তিন

পনেরো দিন পরের ঘটনা।

সতেরোই মে। সকালবেলার খবরের কাগজে এহসান চৌধুরীর ছবি উঠল। সেই সাথে খবর ছাপা হলো ঃ আজ দুপুর থেকে এহসান চৌধুরীর বদান্যতায় এবং তত্ত্বাবধানে মেট্রোপলিটান ঢাকার সাতটি এলাকায় সাতটি লঙ্গরখানা খোলা হচ্ছে। প্রতিটি লঙ্গরখানায় এক সীটিঙে নয়শো লোককে খাওয়ানো হবে···।

ব্রেকফাস্ট সেরে সবেমাত্র দ্বিতীয় কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে শহীদ, এমন সময় কামালের প্রবেশ, 'কাগজ দেখেছিস? এহসান চৌধুরীর ছবি ছাপা হয়েছে।'

শহীদ বলল, 'ছবি দেখে কিন্তু সন্দেহ দূর হয়ে গেছে আমার। এহসান চৌধুরী কুয়াশা নয়।'

কামাল বসতে বসতে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু তবু একবার সামনে থেকে নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।'

'এহসান চৌধুরী কুয়াশা নয়। এ ব্যাপারে আমি বাজি রাখতে পারি। তবে লোকটা আমাদের পরিচিত কেউ হতে পারে।'

'তারমানে? পরিচিত কেউ—কে রে?'

'এখনই নামটা বলব না। আগে শিওর হয়ে নিই।'

'শিওর হতে হলে গিয়ে দেখে আসতে হবে। সাভারের লঙ্গরখানায় যাবি?

'যাবার দরকার নেই। আমার বিশ্বাস, খবর পাব এখানে বসেই।'

কামাল বোকার মত তাকিয়ে রইল। বলল, 'হেঁয়ালি ছাড় তো! কে খবর পাঠাবে ভাবছিস?'

'ধৈর্য ধরো, বৎস! আমার অনুমান সহজে মিথ্যে প্রমাণিত হয় না···।' কথা শেষ হলো না শহীদের, ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল ফোনটা।

রিসিভারটা ছোঁ মেরে তুলে নিল কামাল, 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে মি. সিম্পসনের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কামাল বলছ?'

'ইয়েস, মি. সিম্পসন।'

'শহীদ কোথায়?'

'আমার মুখোমুখি সোফায়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আচ্ছা, মি. এহসান চৌধুরী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি বলো তো?'

কামাল বলল, 'আমাদের দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল এহসান চৌধুরী কুয়াশাই। কিন্তু আজকের কাগজে ছবি দেখে সে ধারণা ভুল···।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমারও তাই সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখছি···।'

'আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সাভারের লঙ্গরখানা থেকে। মি. এহসান চৌধুরীর সাথে পরিচয় হয়েছে। না, কুয়াশা হতে পারেন না তিনি। বয়স খুবই কম। তবে খুব স্মার্ট। ইউরোপে ছিলেন অনেক দিন। বিদেশে ওর বাবার প্রচুর টাকা আছে। সেই টাকার সামান্য কিছু নিয়ে এসে এখানে ব্যবসা করছেন···।'

কামাল বলল, 'লঙ্গরখানায় কোনরকম গোলমালের আশঙ্কা করছেন আপনি, মি. সিম্পসন?'

'পরিস্থিতি এখানে তো খুবই শান্ত। কিন্তু একটা কথা সরাতে পারছি না মন থেকে। এত টাকার চাল যে পাচার করার চেষ্টা করছিল সে কি চুপ করে বসে আছে? অবশ্য প্রচুর সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটি লঙ্গরখানায়। তবে মি. এহসান চৌধুরী নির্ভয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেরাচ্ছেন। বডিগার্ড দিতে চেয়েছি, নেবেন না তিনি।'

কামাল বলল, 'শুধু টাকা আছে তাই নয়, উদার একটা মনও আছে, সেই সাথে আছে প্রচণ্ড সাহস···।'

'এত সব দোষ বা গুণ আছে দেখেই তো সন্দেহ করেছিলাম এ লোক কুয়াশা না হয়ে যায় না। আমি জানতাম, এ সন্দেহ তোমাদের মনেও জাগবে। তাই ফোন করে ভুলটা ভেঙে দিলাম। যাক, এদিকে কিন্তু একটা গুজব ভীষণভাবে ছড়িয়েছে।'

'গুজব?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ। লঙ্গরখানায় দলে দলে অভুক্ত নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ আসতে শুরু করেছে। তারা কি বলছে জানো?'

'কি বলছে?'

'তারা বলছে, এহসান চৌধুরীই কুয়াশা। কুয়াশা ছাড়া এমন গরীবের বন্ধু আর কেউ নেই।'

'আশ্চর্য!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। যাক, এখন ছাড়ি, কামাল।'

কামাল বলল, 'ঠিক আছে। একটা কথা, কিছু ঘটলে অবশ্যই জানাবেন।'

'অফকোর্স জানাব।'

সেদিনেরই ঘটনা।

সাভারের লঙ্গরখানা। শয়ে শয়ে অভুক্ত নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ ঘেরা এলাকার ভিতর চাটাইয়ের উপর অধীর অপেক্ষায় বসে আছে। খাদ্য বিতরণকারীরা দৌড়ো-দৌড়ি ছুটোছুটি করে বড় বড় গামলায় ভাত, মাংস এবং ডাল নিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও পরিবেশন করা হয়নি। ক্ষুধার্ত পশুর মত লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সবাই সেদিকে।

এহসান চৌধুরী স্বয়ং তদারক করছেন। লাউডস্পীকারে ঘোষণা করা হচ্ছে দু'একমিনিট পরপরই ঃ 'অধৈর্য হবেন না। এখুনি পরিবেশনের কাজ শুরু হবে।'

পরিবেশনের কাজ শুরু হলো। প্রচুর ভলানটিয়ার নিযুক্ত আছে এ কাজে। ফলে কম বেশি নয়শো লোককে প্রায় একত্রে পরিবেশন করা কঠিন হলো না। খাওয়া যেন সবাই একসাথে শুরু করে একসাথে শেষ করতে পারে তার দিকে বিশেষ নজরও রাখা হয়েছে। কারণ প্রথম ব্যাচ উঠে গেলে দ্বিতীয় ব্যাচ বসবে। তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যাচ।

পরিবেশনের কাজ শুরু হলো। বেশ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে কাজ। এহসান চৌধুরী ঘড়ি দেখলেন। মি. সিম্পসন সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে আছেন।

'নারায়ণগঞ্জের খবরটা পেলাম না এখনও। একবার যেতে চাই।' এহসান চৌধুরী বললেন।

মি. সিম্পসন বললেন, 'এখানে আর কোন অসুবিধে হবে না। যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি যদি আপত্তি না করেন তাহলে সাথে আমি যেতে পারি? আপনার জীবনের ওপর হামলা আসার আশঙ্কা···।'

মুচকি হাসলেন এহসান চৌধুরী। বললেন, 'আপনি অকারণে দুশ্চিন্তা করছেন, মি. সিম্পসন। নিজেকে রক্ষা করার মত যোগ্যতা আমার আছে। তাছাড়া আমার ধারণা, কোন রকম বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আপনাকে আমি

অহেতুক কষ্ট করতে দেব না। আমি একাই মুভ করব।'

গাড়িতে গিয়ে চড়লেন এহসান চৌধুরী। মৃদু হাসলেন মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে। হাত নাড়লেন। বললেন, 'আবার দেখা হবে।' স্টার্ট দেয়া গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে গেল সামনে থেকে।

এই প্রথম একটা সন্দেহ জাগল মি. সিম্পসনের মনে। এহসান চৌধুরী কথা বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে। ইউরোপে অনেকদিন থাকার ফলে অনেকে এই রকম চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এহসান চৌধুরীর কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল, অথচ চিনতে পারা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক নিজের প্রকৃত কণ্ঠস্বর গোপন রাখার জন্যে অমন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন না তো?

চার

শহীদের ড্রয়িংরুম।

ক্যারম খেলছিল কামাল আর মহুয়া। শহীদ একটা বিশাল উপন্যাসের অতলতলে নিমজ্জিত। এমন সময় বেডরুম থেকে শব্দ ভেসে এল, 'ক্রিং ক্রিং···।'

'ফোন।' মহুয়া কথাটা বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে। যাবার সময় কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'গুটি গোনা আছে আমার, চুরি কোরো না!'

তিন মিনিট পর সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিয়ে প্রায় টলতে টলতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল মহুয়া। ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল সে। তারপর পা বাড়াল। ভাঙা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'শহীদ···!'

'মহুয়াদি!' কামাল মুখ তুলে মহুয়ার অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তড়াক করে সিধে হয়ে দাঁড়াল শহীদ কার্পেটের উপর, 'কি হলো!'

'দাদা···খুন করেছে···সাভারের লঙ্গরখানায়···নয়শো লোক···সবাই মারা গেছে···মি. সিম্পসন কথা বলবেন তোমার সাথে···।'

'মহুয়া!' ছুটল শহীদ। ছুটল কামাল। কিন্তু ওরা মহুয়ার কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই মহুয়া জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল কার্পেটের উপর।

'তুই দেখ ওকে। আমি কথা বলি মি. সিম্পসনের সাথে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল শহীদ। কামাল মহুয়ার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'সন্দেশ! লেবু!'

অকুস্থলে পৌঁছল ওরা বিকেল পাঁচটারও কিছু পরে।

দুটো গ্রামের মধ্যবর্তী মস্ত মাঠের মাঝখানে বেড়া দিয়ে ঘেরা লঙ্গরখানা। ভিড়

ঠেলে এগোনোই মুশকিল। গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল শহীদ। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে কামাল বলল, 'মি. সিম্পসনকে দেখছি না কিন্তু।'

'মি. সিম্পসন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মি. ওবায়দুল হককে নিয়ে ব্যস্ত, সম্ভবত। দেখছিস না, ভদ্রলোকের গাড়ি দেখা যাচ্ছে।'

'আরে, তাই তো!'

ভিড় ঠেলে এগোল ওরা। আশপাশের গ্রাম থেকে লোক এসেছে ঘটনার কথা শুনে। মুখেমুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। শুধু আশপাশের গ্রামে নয়, সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্ভাগা নয়শো লোকের খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত মৃত্যু সংবাদ।

পুলিস কর্ডন দিয়ে রেখেছে লঙ্গরখানা। কেউ ভিতরে ঢুকতে পারছে না। ভিতরে অবশ্য ভলানটিয়ার এবং তদারককারীরা রয়েছে এখনও। পুলিস তাদের সাথে কথা বলবে বলে কাউকে বেরুবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

গেটের কাছে মি. সিম্পসনকে পেল ওরা। তিনি একা নন, তাঁর সাথে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মি. ওবায়দুল হক ছাড়াও রয়েছেন উচ্চ পদস্থ পুলিস অফিসার, ডেপুটি কমিশনার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি, প্রখ্যাত ডাক্তার মি. আহাদ খান, মি. জাফরউল্লাহ, মি. শেখ আবদুস সবুর এবং আরও অনেকে।

ওদের দু'জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হলো না কারও। ওঁরা সবাই শহীদ এবং কামালকে চেনেন।

'শহীদ, মাই বয়…!' মি. সিম্পসন এগিয়ে এসে শহীদের কাঁধে হাত রেখে সাথে করে নিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মি. ওবায়দুল হকের সামনে। শহীদের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা শক্ত করে ধরলেন মি. ওবায়দুল হক। কিন্তু কোন কথা না বলে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন শহীদকে।

সকলের কাছ থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। মি. ওবায়দুল হক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'চিঠিতে কুয়াশা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। সাংবাদিকরা বাইরে দল বেঁধে অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমরা এখনও চিঠির কথা ওদেরকে বলিনি।'

মি. সিম্পসন শহীদকে ফোনে আগেই জানিয়েছিলেন কুয়াশা একটা চিঠি লিখে স্বীকার করে গেছে যে নয়শো লোককে সে সজ্ঞানে হত্যা করেছে। কারণ হিসেবে সে বলেছে—বাংলাদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেছে এবং লোকসংখ্যা এত বেশি বলেই দেশের আর্থিক অবস্থা এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান মানুষকে মেরে ফেলা। প্রচুর মানুষ মেরে ফেলার পর যারা বেঁচে থাকবে তারা বেশ আনন্দেই থাকবে। তাদের কোন অভাব থাকবে না। এই কথা ভেবেই সে হত্যাযজ্ঞে নেমেছে।

শহীদ বলল, 'আপাতত চিঠির কথাটা প্রকাশ করা উচিত হবে না। চিঠিটা আমি

পরীক্ষা করে দেখব। তার আগে আমি জানতে চাই, অন্যান্য লঙ্গরখানা থে
দুঃসংবাদ এসেছে কিনা।'

'এখনও আসেনি। তবে আমি নির্দেশ দিয়েছি সব লঙ্গরখানা ইমিডিয়েটলি ব
করে দিতে। তার আগেই মারা পড়ল কিনা কে জানে!'

শহীদ বলল, 'মি. এহসান চৌধুরী কোথায়?'

'সে-ই তো কালপ্রিট। আমার বিশ্বাস সে কুয়াশারই অনুচর। নারায়ণগঞ্জে
লঙ্গরখানায় যাবার নাম করে এখান থেকে কেটে পড়ে সে চারটের দিকে। ওর খোঁ
পেলেই ওকে অ্যারেস্ট করবার হুকুম দিয়েছি।'

শহীদ জানতে চাইল, 'লাশ গোনা হয়েছে?'

'নয়শো বত্রিশটা লাশ।'

শহীদ ঢোক গিলল, 'ফুড পয়জনিং?'

'হ্যাঁ। তবে এমন একটা বিষ যার সাথে স্থানীয় হোমড়া-চোমড়া ডাক্তারর
পরিচিত নন। মৃত্যুর কারণ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে। খাবারগু
পরীক্ষা করে কেমিক্যালস পাওয়া গেছে অবশ্য। ডাক্তার আহাদ খান বলে
ভিকটিমদের হার্ট রহস্যজনক কোন কারণে সাডেনলি স্টপ হয়ে গেছে।'

শহীদ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হুঁ।'

এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মি. সিম্পসন। 'স্যার! সর্বনাশ হ
গেছে! ঢাকার কন্ট্রোলরুম জানাচ্ছে প্রত্যেকটা লঙ্গরখানা থেকেই এসে
মৃত্যুসংবাদ। লাশের মোট সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার!'

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওরা দু'জন সিম্পসনের মুখের দিকে। সংবিত ফি
পেয়ে ওবায়দুল হক বললেন, 'মাই গড! ইমপসিব্‌ল্! সবাই মারা গেছে?'

'সবাই।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিম্পসন।

ওবায়দুল হক বললেন, 'মি. শহীদ, এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের জন্যে দায়ী যে
হোক, আমরা চাই অপরাধী ধরা পড়ুক এবং চরম শাস্তি পাক। অপরাধী কে
আগে জানতে হবে আমাদের, তারপর তাকে গ্রেফতারের প্রশ্ন। ব্যক্তিগতভা
আমি চাই, এই মস্ত দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। অতীতে আপনার মূল্যবান সাহা
আমরা পেয়েছি, আশা করি আজকের এই মহা বিপদের দিনেও বঞ্চিত হব না। আ
অফিশিয়ালি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব! পুলিসবাহিনী আপনাকে সবরক
সাহায্যের জন্যে তৈরি থাকবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' শহীদকে নিয়ে মি. ওবায়দুল হক ফিরে এলেন সব
মাঝখানে।

শহীদ মৃদুস্বরে, অনেকটা আপন মনে বলল, 'ঠিক যেন মিলছে না!'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'কি মিলছে না, শহীদ?'

'না ও কিছু না। আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা, মি. সিম্পস

লাশগুলোর কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?'

প্রখ্যাত ডাক্তার আহাদ খান শহীদের মুখোমুখি হলেন, 'মি. শহীদ, লাশগুলোর ব্যাপারে আমার একটা বক্তব্য আছে।'

চোখ ফিরিয়ে তাকাল শহীদ ডাক্তার আহাদ খানের দিকে। 'আমার বিশ্বাস, খাদ্যে এমন একটা রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়েছে যা শরীরের অভ্যন্তরে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনরকম ক্ষতি সাধন না করে কেবলমাত্র হার্টকে অচল করে দিয়েছে। অকস্মাৎ থামিয়ে দিয়েছে ওটাকে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে আশ্চর্য এক ধরনের কেমিক্যাল পাওয়া গেছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সব লাশের পাকস্থলিতে ওই একই জিনিস পাওয়া যাবে। নিশ্চিত হবার জন্য কোন লাশের পেট কেটে দেখার ঘোর বিরোধী আমি।'

শহীদ এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বৃদ্ধ ডাক্তার আহাদের দিকে। ডাক্তার আহাদ আবার বলতে শুরু করলেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে এইরকম সমস্যার কথা উল্লেখ নেই। তবু, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কোন মেডিসিন বা ম্যাসেজের সাহায্যে যদি একবার হার্টকে চালু করা যায় তাহলেই বেঁচে যাবে এই নয়শো বত্রিশ জন মানুষ।'

'নয়শো বত্রিশ নয় ড. আহাদ, খবর এসেছে, মোট লাশের সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার।'

অন্যান্য ডাক্তাররা ফিসফিস করে আলোচনা করছে। তারা সবাই একমত হলো, বুড়ো ডাক্তার আহাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে ফুড পয়জনিং হয়ে ঘন্টা দেড়েক আগে মারা গেছে যারা তাদেরকে বাঁচাবার কথা ভাবে কি করে?

ডাক্তার আহাদ কিন্তু বলেই চলেছেন, 'আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। আপনারা আমাকে যদি একটি লাশ দেন, অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি···।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তুমি কি বলো, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'ডাক্তার আহাদের যখন চেষ্টা করার ইচ্ছা হয়েছে, তখন আমাদের বাধা দিয়ে লাভ কি?'

ডাক্তার আহাদ হাসলেন। বললেন, 'ধন্যবাদ। আমি এখুনি লাশ নিয়ে চলে যেতে চাই। ব্যবস্থা করে দিন। আর হ্যাঁ, লাশগুলো যেন কঠোর পাহারায় রাখা হয়। নাড়াচাড়া করার দরকার নেই। পোস্ট মর্টেমের জন্যে কোথাও যেন পাঠানো না হয়। আমার বিশ্বাস ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমার কাছ থেকে রিপোর্ট পাবেন···'

মি. সিম্পসন ডাক্তার আহাদকে নিয়ে চলে গেলেন। অকুস্থল থেকে বিদায় নিলেন আরও অনেকে। কামালকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শহীদ তার কানে কানে কি যেন বলল।

ছানাবড়ার মত হয়ে উঠল কামালের চোখ দুটো। পরমুহূর্তে পকেটে হাত

ঢুকিয়ে রিভলভারটা বের করে কামাল দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'কই, কোন্ দিকে গেল?'

হেসে উঠল শহীদ। বলল, 'ওর নাম শুনেই খেপে গেলি যে? বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে? তাছাড়া আমার ধারণা…' মি. সিম্পসন এদিকে আসছেন দেখে চুপ করে গেল শহীদ।

মি. সিম্পসন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন এগিয়ে আসতে আসতে, 'শহীদ, আর এক কাণ্ড ঘটেছে!'

কামাল লুকিয়ে ফেলল রিভলভারটা। বলল, 'কি ঘটল আবার?'

'লাশ চুরি হয়েছে একটা। চুরি, ঠিক নয়, ছিনতাই।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। একটা ভ্যানগাড়ি লঙ্গরখানার পশ্চিমদিকে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ থেকে। পুলিসরা ভেবেছিল, কোন ভদ্রলোক নিয়ে এসেছেন ওটা। খানিক আগে হঠাৎ ভ্যান থেকে পাঁচজন সশস্ত্র লোক বেরিয়ে এসে পাহারারত এগারোজন পুলিসকে বেঁধে ফেলে। বেড়ার পাঁচিল টপকে তারা লঙ্গরখানার ভেতরে ঢুকে একটা লাশ নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'রহস্যময় ব্যাপার!' কামাল কথাটা বলে তাকাল শহীদের দিকে।

কি যেন চিন্তা করছে শহীদ। মুখ তুলে বলে উঠল হঠাৎ, 'ইয়েস, ভেরি মিসটিরিয়াস অ্যাণ্ড ইন্টারেস্টিং।'

মি. সিম্পসন চেয়ে আছেন শহীদের দিকে, 'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভেরি মিসটিরিয়াস অ্যাণ্ড ইন্টারেস্টিং, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন, আপনার এখানের কাজ শেষ হলে চলুন, বাড়ি ফিরি। ফেরার পথে বলব।'

কামাল বলল, 'চিঠিটা দেখা যাক আগে।' মি. সিম্পসন পকেটে হাত দিলেন।

শহীদ বলল, 'কুয়াশার চিঠিটা তো? থাক। দেখার আর দরকার নেই আমার। নিশ্চয়ই টাইপ করা চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'এ চিঠি কুয়াশার নয়।'

মি. সিম্পসন স্তম্ভিত। 'কুয়াশার নয়! বলো কি! তুমি জানলে কি করে?'

শহীদ বলল, 'চিঠিটার বক্তব্য শুনেছি। শুনেই বুঝেছি ও চিঠি কুয়াশার হতে পারে না। মানুষের জীবন নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলার লোক আর যেই হোক, কুয়াশা নয়। লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে বলে লোককে খুন করে কমাতে হবে এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর। একমাত্র উন্মাদ কোন লোক এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তোমার ধারণা কুয়াশার ঘাড়ে সব দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে কেউ…।'

'হ্যাঁ। আমার তাই ধারণা।'

'কাকে সন্দেহ করিস তুই, শহীদ?' জানতে চাইল কামাল।

'সন্দেহ আমি কাউকে করি না। তবে চাল পাচার করতে যাচ্ছিল যে লোক তার কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের। মার খেয়ে মার হজম করার লোক সে না-ও হতে পারে। এহসান চৌধুরীর সুনাম ধ্বংস করার জন্যে সে লোক খাদ্যে মারাত্মক কোন বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'না, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সে লোক দোষটা কুয়াশার ঘাড়ে চাপাতে চাইবে কেন? কুয়াশার সাথে তার কি সম্পর্ক?'

শহীদ গাড়ির দিকে পা বাড়াল। বলল, 'কুয়াশার সাথে কি সম্পর্ক জানব কি করে? তবে, সে লোক হয়তো চাল পাচার করতে পারেনি কুয়াশা বাধা দেয়াতেই।'

'অর্থাৎ!' কামাল বলল, 'অর্থাৎ এহসান চৌধুরী...'

'কুয়াশা?' শহীদ হাসল। বলল, 'না এহসান চৌধুরী যে কুয়াশা নয় তা তার ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছি। তবে এহসান চৌধুরী হয়তো কুয়াশার পরিচিত, কুয়াশা হয়তো চাল পাচার করার কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে এহসান চৌধুরীর সাহায্যে। সবই হয়তো করেছে কুয়াশা স্বয়ং, কিন্তু পিছনে থেকে। নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য এহসান চৌধুরীকে ব্যবহার করেছে সে।'

কামাল বলল, 'আমি কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবছি। চাল যে পাচার করার চেষ্টা করছিল, সে কে? কি তার পরিচয়? প্রতিশোধ বশত এই এতগুলো লোককে খুন করার কথা কল্পনা করতেও ভয় লাগেনি তার?'

'সে লোক নিশ্চয়ই এমন কেউ যে ভয় পায় না। সম্ভবত উন্মাদ কোন লোক,' শহীদ বলল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'সাধারণ কেউ সে নয়। এমন একটা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেছে যার সাথে পরিচয় নেই রসায়নবিদদের। আমার মনে হয় কোন মিস গাইডেড সাইন্টিস্ট...মাই গড। শহীদ, এ লোক...?'

শহীদ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মি. সিম্পসন, সন্দেহ আমার আপনার আগেই হয়েছে। আমার ধারণা প্রায় একযুগ পর আবার প্রফেসর ওয়াই বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন।'

'মাই গড!' লাফিয়ে উঠলেন মি. সিম্পসন। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে তাঁর মুখের চেহারা, 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, আরাম হারাম হয়ে যাবে জীবন থেকে। জান কবচ করে ছাড়বে শয়তানটা...।'

শহীদের গাড়িতে উঠে বসল ওরা তিনজন। কামাল স্টার্ট দিল গাড়ি। কি যেন বলতে গিয়ে ক্ষান্ত হলেন মি. সিম্পসন। শহীদ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। ওকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

মীরপুর ব্রিজ পেরিয়ে এল ওদের গাড়ি।

মি. সিম্পসন বললেন, 'কামাল, সামনের পেট্রল পাম্পে গাড়ি থামিয়ো। ফোন করব। ডাক্তার আহাদ লাশ নিয়ে গেছেন তা প্রায় একঘণ্টা তো হয়ে গেল।'

শহীদ বা কামাল কেউ কোন কথা বলল না। খানিক পর পেট্রল পাম্পের সামনে গাড়ি থামাল কামাল। মি. সিম্পসন নেমে গেলেন দরজা খুলে।

মিনিট পাঁচেক পর জুতোর মচমচ শব্দ তুলে দ্রুত ফিরে এসে গাড়িতে উঠলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'কি যে ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কেন, আবার কি ঘটল?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'চোখের মাথা আমরা সবাই খেয়ে বসে আছি, শহীদ, তা না হলে—যাক, কি ঘটেছে শুনবে? ফোন করেছিলাম ডাক্তার আহাদের বাড়িতে। ফোন ধরেছিলেন ডাক্তার স্বয়ং। লাশের কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, গত সাতদিন ধরে তিনি অসুস্থ, বাড়ি থেকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও বের হননি। আজকে বের হবেন কিনা ভাবছেন।'

শহীদ বলল, 'ডাক্তার আহাদ মিথ্যে বলেননি।'

'হোয়াট!'

শহীদ বলল, 'অকুস্থলে যাকে আমরা দেখলাম, যে লাশ চেয়ে নিয়ে গেল সে আসলে ডাক্তার আহাদ নয়, ডাক্তার আহাদের ছদ্মবেশধারী।'

'কি বলছ তুমি!' মি. সিম্পসন বিমূঢ়।

শহীদ শান্তভাবে বলল, 'ঠিকই বলছি। লোকটা আসলে কে জানেন, মি. সিম্পসন?'

'কে?'

'স্বয়ং কুয়াশা।'

মি. সিম্পসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাই গড!'

শহীদের গুলশানের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সাদা ফোক্সওয়াগেনটা। গাড়ি থেকে নামার সময় ওরা লক্ষ করল একটা ট্যাক্সি গেটের কাছ থেকে বাঁক নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

'তোমার বাড়িতে কেউ এসেছে মনে হচ্ছে, শহীদ,' মি. সিম্পসন বললেন।

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা সত্যি হলে নির্ঘাৎ এহসান চৌধুরী এসেছে আমার সাথে কথা বলতে।'

পাঁচ

ড্রয়িংরুমে ঢুকে কিন্তু ওরা কাউকে দেখতে পেল না।

'কোথায় তোর এহসান চৌধুরী?' কামাল সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ বলল, 'তোরা বস। ভিতরটা দেখে আসি আমি।'

বেডরুমে মহুয়াকে পেল শহীদ। শহীদকে দেখে হাসি পেলেও সেটা প্রকাশ করল না মহুয়া। চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলে বলল, 'কি খবর গো?'

'ভাল নয়।'

'দাদা…!'

'না সে দায়ী নয়।'

মহুয়া বলল, 'এদিকে এক কাণ্ড…।'

'কি?'

'এহসান চৌধুরী, যার ছবি ছাপা হয়েছে আজকের পত্রিকায়, তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

শহীদ স্বাভাবিক ভাবে জানতে চাইল, 'কোথায় সে?'

'ছাদে। তুমি ছাড়া আর কারও সাথে দেখা করতে রাজি না, ড্রয়িংরুমে বসতে চাইছিলেন না, তাই আমি ছাদে একটা চেয়ার পেতে দিতে বললাম সন্দেশকে।'

শহীদ হাসল, 'হয়েছে, আর অভিনয়ের দরকার নেই। ভাবখানা দেখাচ্ছ, এই এহসান চৌধুরী কে তা জানো না।'

'তুমি জানো আসলে কে ও?'

শহীদ বলল, 'জানব না? এই লাইনে কম দিন তো কাটালাম না। আমি ছবি দেখেই সন্দেহ করেছিলাম। তারপর ঘটনার সাথে ঘটনা মিলিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারি কে এই এহসান চৌধুরী।'

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল শহীদ। ছাদে উঠে শহীদ দেখল চেয়ারে বসে আছে এহসান চৌধুরী। সংবাদপত্রের ছবিতে দেখা চেহারার সাথে পুরোপুরি মিল দেখা যাচ্ছে।

'কি হে, এহসান চৌধুরী! অমন মন খারাপ করে বসে আছো কেন?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এহসান চৌধুরী। বলে উঠল, 'শহীদ ভাই! কখন এলেন? আমি জানতাম, আপনি ঠিকই চিনে ফেলবেন আমাকে।'

এহসান চৌধুরী উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

শহীদ একটু গম্ভীর হলো, 'সব কথা ব্যাখ্যা করে বলো তো, রাসেল। আমি যা ভেবেছি তার সাথে সব মেলে কিনা দেখি।'

এহসান চৌধুরী আসলে দুঃসাহসী যুবক রাসেল ছাড়া আর কেউ নয়। দ্রুত এবং সংক্ষেপে সব কথা বলল রাসেল।

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'যা ভেবেছি সব মিলে যাচ্ছে। কুয়াশা প্রফেসর ওয়াইকে চোখে চোখে রাখছিল, সে বাংলাদেশে পা দেবার পর থেকেই। একদল

মওজুতদার বিশ্বাসঘাতক প্রফেসর ওয়াইকে প্রস্তাব দেয় তাদের প্রায় এক হাজার টন চাল বর্ডারের ওপারে পৌঁছে দেবার, প্রফেসর ওয়াই সাথে সাথে তা গ্রহণ করে—এ খবর কুয়াশা জানতে পারে। প্রফেসর ওয়াইয়ের প্রচুর টাকা দরকার, সে ভেবেছিল চাল বর্ডারের ওপারে নিয়ে গিয়ে প্রস্তাবকারীদের প্রতিনিধিদের হাতে তা তুলে না দিয়ে নিজের লোকদের দিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেবে, ঠকাবে প্রস্তাবকারীদের। কুয়াশা ঠিক করে বর্ডারে বাধা দেবে সে। এবং নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য তোমাকে সে ব্যবহার করে—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

শহীদ বলল, 'ডাক্তার আহাদের ছদ্মবেশে কুয়াশা যে লাশ নিয়ে গেল—কাজ হবে বলে মনে করো?'

'ঠিক জানি না। তবে আশার আলো না দেখলে কুয়াশা যে কোন কাজে হাত দেন না তা তো আপনি জানেন।'

'নিচে চলো, রাসেল। মি. সিম্পসন সব শুনতে চাইবেন তোমার মুখ থেকে।'

রাসেল আঁতকে উঠল, 'অসম্ভব, শহীদ ভাই। মি. সিম্পসন এসব কথা শুনলে ভাববেন আমি কুয়াশার সহকারী, নির্ঘাৎ গ্রেফতার করতে চাইবেন। তাছাড়া কাজও আছে অনেক। এখন সমস্যা হলো ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাই কি করে···।'

শহীদ বলল, 'পালাবার রাস্তা আছে। বাতলে দেব। কিন্তু সত্যিই ওঁর সাথে দেখা করতে চাও না?'

'না।'

'বেশ। তাহলে শোনো···'

শহীদের মুখে সব কথা শুনে মি. সিম্পসন বললেন, 'সত্যিই তাহলে শয়তান প্রফেসর ওয়াই বাংলাদেশে আবার ফিরে এসেছে!'

শহীদ বলল, 'এখন আর কোন সন্দেহ নেই।'

কামাল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা প্রফেসর ওয়াই শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে সাড়ে ছ'হাজার লোককে হত্যা করেনি। কোন মেডিসিন পরীক্ষা করার ইচ্ছাও তার ছিল। হয়তো কোন এক্সপেরিমেন্ট···।'

শহীদ বলল, 'আমারও তাই ধারণা। তবে কুয়াশার ওপর দোষ চাপানোও আর এক উদ্দেশ্য। প্রফেসর ওয়াই বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, একথা কুয়াশাও স্বীকার করেছে অতীতে। বিজ্ঞান চর্চার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তবে বদ্ধ উন্মাদ, মিসগাইডেড।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'লাশ হাইজ্যাক নিশ্চয়ই ওই শয়তানের চেলাদেরই কাণ্ড।'

শহীদ বলল, 'ঠিক ধরেছেন। লোকগুলোকে মেরে ফেলেছে এক্সপেরিমেন্ট

করতে গিয়ে, এখন তাদেরকে বাঁচাবার জন্যে এক্সপেরিমেন্ট চালাবে।'

ক্রিং··· ক্রিং··· ক্রিং···। ফোনের শব্দ ভেসে এল। কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেল কামাল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'গতবার শয়তান প্রফেসর ওয়াইয়ের টিকি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারিনি আমরা, মনে আছে, শহীদ? একের পর এক খুন, ডাকাতি, লুঠ করে গেছে সে। আমরা অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ অবধি তার প্রকৃত চেহারা কেমন দেখিনি আমরা। প্রতিদিন সে নতুন নতুন ছদ্মবেশ নেয়। আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম না শয়তানটার জন্ম স্থান কোথায়, মাতৃভাষা কি! এমনকি তার নামটা পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। কেউ বলে প্রফেসর ইয়াহ্। কেউ বলে প্রফেসর ইয়াঙ্কী, কেউ বলে প্রফেসর যোগী, কেউ বলে প্রফেসর ইয়াকুব—স্ট্রেঞ্জ!'

কামাল ফিরে এল ড্রয়িংরুমে, 'অজ্ঞাত পরিচয়ের ফোন। লঙ্করখানাগুলো থেকে লাশগুলো সরাতে নিষেধ করল। নিষেধ অমান্য করলে শাস্তি দেয়া হবে—মৃত্যুদণ্ড!'

টপ করে বসল কামাল সোফায়।

'এ নিশ্চয়ই শয়তান প্রফেসর ওয়াইয়ের হুমকি!' মি. সিম্পসন মন্তব্য করলেন।

কামাল বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

শহীদ বলল, 'দুই প্রতিভা নিহত লোকগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। দেখা যাক কে সফল হয়। কিংবা আদৌ কেউ হয় কিনা। মরা মানুষকে বাঁচানো তো আর ছেলেখেলা কথা নয়!'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফোন এল। মি. সিম্পসনের ফোন, অফিস থেকে করেছে তাঁর সেক্রেটারি।

ফোনে আলাপ করে মি. সিম্পসন ড্রয়িংরুমে ফিরে এলেন। বললেন, 'শহীদ, কুয়াশার কোন আড্ডা আছে কিনা জানো শান্তিনগর এলাকায়?'

'আছে বলে শুনেছি। কেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'একটা লাশ পাওয়া গেছে শান্তিনগর এলাকায়। ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেছে কেউ। বুক চেরা, পেট চেরা লাশ। বাহুতে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে তার চিহ্নও পাওয়া গেছে। আমার মনে হয় কুয়াশা যে লাশ নিয়ে গেছে সাভার থেকে এটা সেটাই। পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে সে। লোকগুলোকে বাঁচানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সহকারীদের ফেলে দিতে বলায় সহকারীরা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেছে···'

কামাল বলল, 'প্রফেসর ওয়াই যে লাশটা হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে এটা সেই লাশও তো হতে পারে।'

ক্রিং··· ক্রিং··· ক্রিং···।

কামাল সোফা ত্যাগ করতে করতে বলল, 'ড্রয়িংরুমের ফোনটা ভাগ্যগুণে আজই খারাপ হয়ে গেল!'

কামাল অদৃশ্য হয়ে যেতে মি. সিম্পসন বললেন, 'কে আবার কি খবর দেয় দেখো।'

একটু পরই ফিরে এল কামাল, 'ডাক্তার আমিনুল ইসলাম তোর সাথে আলাপ করতে চাইছেন, শহীদ।'

'ডাক্তার আমিনুল ইসলাম! আমার সাথে আলাপ করতে চান কেন?'

কামাল বলল, 'তিনি নাকি নিহত সমস্ত লোককে বাঁচাতে পারবেন। যদি কয়েকটা শর্ত পূরণ করা হয়।'

'বলিস কি!' শহীদ উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল বেডরুমের দিকে।

মি. সিম্পসন বললেন, 'লোকটা নিশ্চয়ই আমিনুল ইসলাম নয়! হয় কুয়াশা, নয় শয়তান প্রফেসর ওয়াই। কি শর্ত পূরণ করতে হবে?'

কামাল বলল, 'লাশগুলো পৌঁছে দিতে হবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। এবং তিনি যতক্ষণ কাজ করবেন ততক্ষণ আশপাশে যাতে কোনরকম হাঙ্গামা না হয়, অবাঞ্ছিত লোকের সমাগম না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

শহীদ ফিরল পাঁচ মিনিট পরই। রীতিমত উত্তেজিত ও। বলল, 'প্রফেসর ওয়াই নয়, কুয়াশাও নয়। ডাক্তার আমিনুল ইসলামই ফোন করেছিলেন। উঠুন, মি. সিম্পসন। লাশগুলো মেডিক্যাল কলেজে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আর, গোটা হাসপাতালটা আর্মড ফোর্স মোতায়েন করে ঘিরে রাখতে হবে···'

'ডাক্তার আমিনুল ইসলাম গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন? মরা মানুষগুলোকে তিনি বাঁচাতে পারবেন?'

'বলছেন পারবেন। ওঁর বক্তব্য হচ্ছে—আসলে মানুষগুলো মরেনি। ওদের শরীর অক্ষত এবং পরিপূর্ণ সুস্থ আছে। আশ্চর্য এক ওষুধের প্রভাবে কেবল মাত্র অচল হয়ে গেছে হার্ট। অতি সামান্য প্রাণ স্পন্দন নাকি এখনও রয়েছে। সেই অচল হার্টকে সচল করতে পারলেই তারা আবার বেঁচে উঠবে।'

'অচল হার্টকে সচল করার পদ্ধতি বা মেডিসিন কি তা তিনি জানেন?'

শহীদ বলল, 'একটু পরই জানেন কি জানেন না প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে তিনি দাবি করছেন জানেন বলে।'

কামাল বলল, 'কিন্তু কুয়াশা এমন চুপচাপ কেন? তার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া শব্দ না আসাটা কেমন?'

শহীদ বলল, 'দেরি করছি শুধু শুধু আমরা। পচতে শুরু করার আগেই সবগুলো মরা মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। পচতে শুরু করলে কোন ওষুধেই বা কোন পদ্ধতিতেই আর কোন কাজ হবে না।'

মি. সিম্পসন দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'শহীদ, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডাক্তার আমিনুল ইসলামের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নিয়েছ। মরা মানুষগুলোকে বাঁচানো সম্ভব, তোমার বিশ্বাস?'

শহীদ বলল, 'সম্ভব আর অসম্ভবের প্রশ্ন এখন নেই, মি. সিম্পসন। আমার অনুমান কি জানেন? আমিনুল ইসলাম কুয়াশা নয়, তবে কুয়াশার অনুরোধে এই কাজ করছেন তিনি। কুয়াশা, আমার বিশ্বাস, ডাক্তার আমিনুল ইসলামের চোখের সামনে একজন মৃত লোককে বাঁচিয়ে তুলেছে। সে নিজে প্রকাশ্যে কাজ করতে সম্মত নয় বলে মেডিসিন এবং পদ্ধতি কি জানিয়ে দিয়ে মানুষগুলোকে বাঁচাবার দায়িত্ব দিয়েছে ডাক্তার আমিনুল ইসলামের ওপর। আপনি ফোনে ব্যবস্থা করে ফেলুন, তারপর রওনা হওয়া যাক।'

মি. সিম্পসনের টেলিফোন করা হয়ে যেতেই গাড়িতে উঠে বসল ওরা। কামাল বসেছে স্টিয়ারিং হুইলে। তীরবেগে বেরিয়ে গেল সাদা ফোক্সওয়াগেন ফিফ্‌টিন হাণ্ডরেড। মি. সিম্পসন তখনও হজম করতে পারেননি শহীদের কথাগুলো।

গাড়ি তীরবেগে ছুটছে মেডিকেল কলেজের দিকে।

মি. সিম্পসন আপন মনে বলে উঠলেন, 'মাই গড! মরা মানুষকে জ্যান্ত করে ফেলেছে—এ আবার কি শুনি! মাই গড!'

কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর আর অবিশ্বাস্য রইল না ব্যাপারটা। শহীদ, কামাল আর মি. সিম্পসনের চোখের সামনে ডাক্তার আমিনুল ইসলাম নিহত লোকদের একজনকে বাঁচিয়ে তুললেন!

রটে গেল বিস্ময়কর এই খবর সারা পৃথিবীতে। কিন্তু ডাক্তার আমিনুল ইসলাম কারও অভিনন্দন বাণীই গ্রহণ করলেন না। সাংবাদিকরাও ব্যর্থ হলো তাঁর সাথে দেখা করতে।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে সবগুলো মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হলো। ডাক্তার আমিনুল ইসলাম মেডিসিন সাপ্লাই দিলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন তাঁর বিশজন ডাক্তার বন্ধু।

ডাক্তার আমিনুল ইসলামের দাড়িভর্তি মুখটা সবসময় গম্ভীরই রইল। চশমার ভিতর চোখ দুটো দেখে মনে হলো কি যেন চিন্তা করছেন তিনি। কারও কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। সরাসরি কারও দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইতস্তত করতে দেখা গেল তাঁকে।

ছয়

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

ভিজে রাত।

বিরামহীন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামছে তো নামছেই।

টয়েনবি সার্কুলার রোড প্রায় ডুবু ডুবু, পীচ দেখা যাচ্ছে না। লোক নেই পথে। ল্যাম্পপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। নিচের ভিজে ফুটপাথে আলো পড়ে চকচক করছে। ফুটপাথের পাশে প্রকাণ্ড গ্যারেজের গেটটা খোলা। উঠানের চারদিকে নানারকম যানবাহন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে বৃষ্টিতে। জায়গার অভাবে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর।

ল্যাম্পপোস্টের ঠিক নিচে ছোট্ট একটা লাল ফিয়াট দেখা যাচ্ছে। গাড়িটার দরজা খোলা। ডাক্তারের পোশাক পরা একজন প্রৌঢ় দরজা দিয়ে মাথাটা গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন করছেন। তার পিছনে একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে, উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে ডাক্তারের কাজকর্ম। কনস্টেবলের মাথার উপর একটা ছাতা। তার পিছনে রেনকোট পরা স্বাস্থ্যবান একজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে একজন মেকানিকের সাথে।

এমন সময় দুটো হেডলাইট দেখা গেল রাস্তার বাঁকে। একটা গাড়ি আসছে দ্রুতবেগে।

কাছাকাছি আসতে রেনকোট পরা লোকটা হাত নাড়ল গাড়িটার উদ্দেশে। সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন থেমে দাঁড়াল রেনকোট পরা লোকটার পাশে।

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বের না করেই শহীদ জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, মতি?'

মতি এই গ্যারেজের মালিক। এখানে গাড়ি মেরামত করা হয়, গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়, যাদের গ্যারেজ নেই তারা রাতের বেলা এখানে গাড়ি রেখে যেতে পারে সামান্য দু'এক টাকার বিনিময়ে। শহীদ এখানেই প্রয়োজনে গাড়ি মেরামত করায়। মতির সাথে দীর্ঘ দিনের পরিচয় ওর। ছেলেটা পরিশ্রমী এবং সৎ। সাধারণ একজন হেলপার থেকে আজ সে এত উঁচুতে উঠেছে শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রম এবং সততাকে মূলধন করে।

ফোক্সওয়াগেনের জানালার সামনে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল মতি, 'লাল ফিয়াটে একটা লাশ পাওয়া গেছে, স্যার। মোড় থেকে একজন কনস্টেবলকে ডেকে এনেছি। সে-ই ফোন করে ডাক্তার সাহেবকে আনিয়েছে। ভয় করছে। খামোকা ঝামেলায় ফেলবে কিনা ভাবছিলাম···।'

গাড়ির শব্দ পেয়ে পুলিস কনস্টেবলটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। রেনকোট পরা ঋজু, লম্বা শহীদ খানকে গাড়ি থেকে বেরুতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল সে। স্যালুট মারল সামনে দাঁড়িয়ে, বলল, 'আপনি, স্যার!'

'কি ব্যাপার বলো তো? জ্ঞান হারিয়েছে বুঝি কেউ?'

কনস্টেবল বলল, 'না, স্যার। সুইসাইড করেছে লোকটা। ডাক্তার সাহেব তো তাই বলছেন। গাড়ির ভিতর শিশি রয়েছে একটা···।'

'তাই নাকি!' শহীদ মতির দিকে তাকাল, 'কে লোকটা? তোমার চেনা কেউ?'

'না, স্যার। আগে কখনও দেখিনি। কাপড়চোপড় দেখে মনে হয় গরীব মানুষ, বেকার। মরবার জায়গা খুঁজে পায়নি,—এই গাড়িতে এসে বিষ খেয়েছে।'

শহীদকে ম্লান দেখাল, 'বেচারা! লাশ কে দেখে প্রথম?'

মতি যে মেকানিকের সাথে খানিক আগে কথা বলছিল সে শহীদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমি, স্যার। হর্ন কাজ করছে না, এই বলে এক ভদ্রলোক গাড়িটা রেখে চলে যান। আমি চেক করার জন্যে দরজা খুলতেই দেখি সীটের ওপর একটা কম্বল। কম্বলের নিচে কিছু একটা বড়সড় আছে বুঝতে পারলেও তখনও সন্দেহ করিনি···যাকগে, হঠাৎ দেখি কম্বলের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে একটা জুতো পরা পা। ভীষণ ভয় পাই আমি। কেউ কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমুচ্ছে কিনা অনুমান করার চেষ্টা করি। দু'বার "এই যে সাহেব", "এই যে সাহেব" করে ডাকাডাকিও করি। উত্তর না পেয়ে কম্বলটা ধরে টান দেই। মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারি, বেঁচে নেই—সাথে সাথে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে থাকি সবাইকে···।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে।' কথাটা বলে ফিয়াটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। সরকারী ডাক্তার তাঁর পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এতক্ষণে। ঘাড় ফিরিয়ে না তাকিয়েই বললেন, 'হ্যালো, মি. শহীদ। রহস্যের গন্ধ ঠিকই পান আপনারা, কেমন? দেখুন, লাশটা দেখুন ভাল করে।'

একপাশে সরে দাঁড়ালেন ডাক্তার। শহীদ গাড়ির ভিতর উঁকি মেরে দেখল লোকটা শুয়ে আছে অনেকটা বসার ভঙ্গিতে। দরজার গায়ে হেলান দেয়া, জানালার উপর মাথাটা, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা, কোমরটা সীটের উপর। হাত দুটো বুকের কাছে পড়ে রয়েছে শান্ত ভঙ্গিতে। লোকটার মুখের রঙ ফ্যাকাসে। চোখ দুটো আধবোজা। একটা চোখের মণি নেই। মণির বদলে পাথর অর্থাৎ কৃত্রিম পাথরের মণি বসানো রয়েছে। ওটা ডান চোখ। শহীদের দৃষ্টি এড়াল না, ডান চোখটা একটু ফুলে রয়েছে। পরনে সস্তা খদ্দরের হাওয়াই শার্ট, অনেক জায়গায় ছেঁড়া। খাকী ট্রাউজারটাও ছেঁড়া।

'স্ট্রিকনিন!' ডাক্তার বললেন ওষুধের একটা শূন্য এবং লেবেলহীন শিশি উঁচু করে তুলে ধরে। 'মি. শহীদ, লাশের মুখে বাঁকা মত একটু হাসির আভাস লক্ষ করছেন? খুবই তাৎপর্যময় ব্যাপার। The risus sardonicus, we call it. মাংসপেশীগুলো পিচবোর্ডের মত শক্ত হয়ে গেছে। বেশ কয়েক ঘন্টা আগে মারা গেছে লোকটা। গাড়িটা এখানে এসেছে কখন?'

'সন্ধ্যা সাতটারও পরে।' জানাল মতি, 'এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিয়ে আসেন

গাড়িটা। বললেন, 'গাড়ির হর্ন কাজ করছে না কেন বুঝতে পারছি না। দেখে ঠিক করে রাখবেন, আমি একসময় এসে নিয়ে যাব। ভদ্রলোক এসে এই কাণ্ড দেখে থতমত খেয়ে যাবেন একেবারে।'

শহীদ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার কোন পরিচয় জানা গেছে?'

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন, 'পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা—"দিনের পর দিন না খেয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। অথচ আমাকে একটা চাকরি দিতে রাজি না কেউ। বেকারত্বের অভিশাপ সহ্য করতে না পেরে আমি আমার জীবনের সমাপ্তি টানলাম।" না, নাম নেই। পকেটে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যা দেখে লোকটা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়।'

কথাগুলো বলে ডাক্তার গাড়ির দিকে আবার ঝুঁকে পড়লেন। জোরে জোরে শ্বাস নিলেন দু'বার। বললেন, 'আশ্চর্য! গাড়ির ভিতর থেকে কিসের যেন একটা গন্ধ আসছে। স্ট্রিকলিনের নয়।'

মিষ্টি একটা গন্ধ শহীদের নাকেও ঢুকেছে।

ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতেই শহীদ হ্যাট পরিহিত রেনকোটে আবৃত লম্বা চওড়া মি. সিম্পসনকে এগিয়ে আসতে দেখল। মি. সিম্পসনের পিছনে একজন লোক। লোকটার কালিমাখা প্যান্ট শার্ট দেখে বোঝা গেল, গ্যারেজেরই একজন মেকানিক সে।

'শহীদ—তুমি?'

শহীদ হাসল, 'এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। মতি দেখে হাত নেড়ে থামাল।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঝটিকা সফরে বেরিয়েছিলাম। রমনা থানায় হঠাৎ খবর গেল, একটা গাড়িতে লাশ পাওয়া গেছে। খবর শুনে নিজেই চলে এলাম।'

মি. সিম্পসন গাড়ির খোলা দরজার কাছে এসে নুয়ে পড়ে ভিতরটা দেখতে শুরু করলেন। লাশ দেখে গম্ভীর হলেন তিনি। কয়েকটা প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে। লাশের শার্টের পকেট থেকে পাওয়া চিঠিটা নিলেন, পড়লেন। ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। তাকালেন শহীদের দিকে। 'বিদঘুটে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, শহীদ?'

মৃদু হেসে ঘাড় কাত করল শহীদ।

মি. সিম্পসন বললেন, 'বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে হাঁটতে এ লোক এই গাড়িতে এসে ওঠে, তারপর আত্মহত্যা করে—হাস্যকর! এখান থেকে থানা—এইটুকু মাত্র রাস্তা হেঁটে এসেছি, অথচ ট্রাউজারের নিচের অংশ কাদায় একাকার হয়ে গেছে। কই, অজ্ঞাত পরিচয় এই লোকের ট্রাউজারে কাদা কই? গোটা ট্রাউজারটাই দেখা যাচ্ছে ভিজে, কিন্তু কাদা নেই এক ফোঁটাও।'

শহীদ বলল, 'স্ট্রিকলিন ভয়ঙ্কর ধরনের বিষ। স্ট্রিকলিন পয়জনিঙে যে লোক মারা যায় সে রীতিমত যন্ত্রণায় জবাই করা মুরগীর মত লাফালাফি করে, তাই না? কিন্তু লাশটা দেখুন। মরার আগে ছটফট করেছে বলে মনে হয়? রীতিমত যত্ন করে

কম্বল চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।'

মি. সিম্পসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাই গড! শহীদ তুমি বলতে চাইছ এটা আত্মহত্যা নয়—মার্ডার!'

উত্তর না দিয়ে শহীদ কনস্টেবলের হাত থেকে চার ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে আলো ফেলল লাশের মুখে। তারপর প্রশ্ন করল, 'মি. সিম্পসন, লাশের ডান কানে কিছু লেগে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন?'

মি. সিম্পসন আরও নুয়ে পড়লেন, 'ইয়েস। মনে হচ্ছে সাবান জাতীয় কিছু।'

শহীদ বলল, 'সাবানই। শেভিং সোপ।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল শহীদ। মুঠো করে ডান হাতটা খুলল। বলল, 'দেখুন।'

শহীদের হাতে দু'তিনটে সাদা-কালো চুল দেখা গেল। 'এগুলো আমি লোকটার শার্টের কলারে পেয়েছি। মি. সিম্পসন, জোরে কয়েকবার শ্বাস নিন তো। একটা গন্ধ পাবেন।'

শ্বাস নিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'ইয়েস, অফকোর্স! কিন্তু গন্ধটা ঠিক চিনতে পারছি না···।'

শহীদ বলল, 'হেয়ার ডাই।'

মি. সিম্পসন চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ···?'

শহীদ বলল, 'আমি বলতে চাইছি ছেঁড়া শার্ট-ট্রাউজার দেখে লোকটাকে কপর্দকহীন মনে হলেও আসল ব্যাপার ঠিক তার উল্টো। চিঠিতে যা লেখা আছে তাও সত্যি নয়। এ লোক বেকার ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন ইনি। মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি ছিল ভদ্রলোকের। চশমাটা গাড়িতে নেই কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি চশমা পরতেন ভদ্রলোক। ডান চোখের গহ্বরে কৃত্রিম পাথর বসানো হয়েছে, আমার বিশ্বাস, মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে। সম্ভবত মারা যাবার পর কেউ তার চোখের মণি বের করে কৃত্রিম পাথরের মণি বসিয়ে দিয়েছে। এবং এই ভদ্রলোক বৃষ্টি মাথায় করে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িতে এসে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেননি। মৃত অবস্থায় তাঁকে এই গাড়িতে করে এনে রেখে যাওয়া হয়েছে।'

'মার্ডার, কেমন?' মি. সিম্পসনের প্রশ্ন। পরমুহূর্তে হাইহিলের শব্দ শোনা গেল।

যুবতী একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল সবাই। মেয়েটি বলে উঠল, 'ইউ হ্যাভ গট মাই কার ব্যাক দেন!'

সাত

মেয়েটা ইউরোপিয়ান। স্কার্টের উপর কোট পরেছে কিন্তু মাথায় টুপি নেই। এগিয়ে আসতে দেখে শহীদ এবং মি. সিম্পসন সরে দাঁড়ালেন একটু। মেয়েটা সোজা

গাড়ির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে সাপ দেখার মত চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল সে। শহীদ ধরে ফেলল মেয়েটার একটা বাহু।

'ইটস্...ইটস্ হরিবল! কে, কে ও আমার গাড়ির ভিতর অমন মড়ার মত পড়ে রয়েছে?'

থানার ইন্সপেক্টর লম্বা লম্বা পা ফেলে অকুস্থলে হাজির হলেন। মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'উনি মিস ভেরা শ্লেড। আজ বিকেলে উনি গাড়ি চুরির কথা জানিয়ে যান থানায়। আপনি, স্যার, এখানে আসার জন্যে থানা থেকে বেরুবার পর আমি লক্ষ্য করি মিস ভেরার গাড়ির সাথে এখানে যে গাড়িটায় লাশ পাওয়া গেছে তার নাম্বার মিলে যাচ্ছে। সাথে সাথে আমি মিস ভেরাকে ফোন করে জানাই ব্যাপারটা।'

মি. সিম্পসন মিস ভেরার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'গাড়িটা আপনার বলে সনাক্ত করছেন?'

'অবশ্যই এটা আমার গাড়ি! ঢাকা ক্লাবে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম দুপুর বেলা। খেয়েদেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি গাড়ি নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম মি. ইসলাম নিয়ে গেছেন গাড়িটা কোন জরুরী কাজে, কিন্তু...।'

'মি. ইসলাম কে?'

মিস ভেরা বলল, 'ওই ভদ্রলোকের সাথেই লাঞ্চ খাচ্ছিলাম আমি। খাওয়ার সময় কেউ ডাকে ভদ্রলোককে। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে থাকেন তিনি। তা প্রায় পনেরো বিশ মিনিট তো হবেই। তারপর ফিরে আসেন। আমাকে বলেন, বাকি খাবারের জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন না বলে দুঃখিত। বিদায় নিয়ে চলে যান তিনি। আমি আরও অনেকক্ষণ থাকি ক্লাবে। চিঠি লিখি, কফি খাই। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর বাইরে এসে দেখি গাড়ি নেই।'

'মি. ইসলাম গাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

'না!'

মি. সিম্পসন আবার প্রশ্ন করলেন, 'লাঞ্চ খাবার সময় মি. ইসলাম টেবিল ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন কেন জানেন?'

'না। একজন বেয়ারা এসে বলল, এক ভদ্রলোক ডাকছে। মি. ইসলাম সাথে সাথে বেয়ারার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কেন ডেকেছিলেন, তার পরিচয় কি—পরে আর জিজ্ঞেস করতে সময় পাইনি আমি।'

'গাড়ি চুরি যাবার পর মি. ইসলামের সাথে আপনার আর দেখা হয়নি?'

'দেখা হবার কথাও নয়। আজকের সন্ধ্যার ফ্লাইটে বৈরুত যাবার কথা মি. ইসলামের।'

এতক্ষণে মুখ খুলল শহীদ, 'মি. ইসলাম—কে এই ভদ্রলোক? সম্পূর্ণ নাম কি?'

মিস ভেরা শ্রাগ করল। বলল, 'ক্লাবেই গত হপ্তায় পরিচয় ভদ্রলোকের সাথে

আমার। সম্পূর্ণ নাম জানার সুযোগ ঘটেনি।'

শহীদ সন্তুষ্ট হলো না মিস ভেরার উত্তরে। কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেও তা প্রকাশ করল না। প্রশ্ন করল আবার, 'ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'মুখ ভর্তি দাড়ি, কাঁচা-পাকা। চশমা পরেন। বয়স প্রায় চল্লিশ।'

শহীদ এবং মি. সিম্পসনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'গাড়িটা এখানে কখন আনা হয়?'

মতি একজন মেকানিককে সামনে ঠেলে দিল। এই মেকানিকই থানায় খবর দিতে গিয়েছিল খানিক আগে। সে বলল, 'সোয়া সাতটার দিকে এক ভদ্রলোক গাড়িটা আনলেন। ভদ্রলোকের পরনে ছিল নীল রঙের স্যুট। খুব বেশি ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় বলে গেলেন রাত সাড়ে দশটার দিকে ফিরবেন তিনি গাড়ি নিতে। ভদ্রলোকের ডানদিকের গালে কাটা দাগ ছিল, বড় বড় চুল মাথায়, চুরুট ছিল হাতে।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

কিন্তু মতি বলল, 'না, একা ঠিক নয়। আমি রেস্তোরাঁয় চা খেতে যাচ্ছিলাম তখন। ভদ্রলোকের পিছু পিছু যাই আমি, রেস্তোরাঁটা ওদিকেই। মোড়ের কাছে গিয়ে দেখি আর এক ভদ্রলোকের সাথে মিলিত হলেন তিনি। মোড়ে অপেক্ষা করছিলেন এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক, মনে হলো। বয়স খুব বেশি নয়, বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ হবে। তবে স্বাস্থ্যটা ভাল, বিরাট লম্বা চওড়া। একটু যেন খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।'

নিস্তব্ধতা নামল। একটানা, একঘেয়ে বৃষ্টিপাতের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। রাত প্রায় এগারোটা বাজতে যাচ্ছে।

শহীদ মিস ভেরার দিকে ফিরল, আপনার গাড়িতে মৃত এই লোকটাকে আপনি চেনেন? আগে কখনও দেখেছেন?'

'জীবনে দেখিনি।'

'তবু, ভাল করে লক্ষ্য করুন আর একবার।'

শহীদ টর্চের আলো ফেলল গাড়ির ভিতর। মিস ভেরা নুয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল নিহত লোকটাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল তারপর, বলল, 'না, দেখিনি।'

মি. সিম্পসন কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, শহীদ তাঁর পায়ে চাপ দিল জুতাসহ পা তুলে দিয়ে। মি. সিম্পসন ইঙ্গিতটা বুঝে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। শহীদ বলল, 'মিস ভেরাকে অহেতুক কষ্ট দেবার কোন মানে হয় না। মতি, একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করো···।'

ট্যাক্সি ডেকে আনা হলো পাঁচ মিনিটের মধ্যে। মিস ভেরা ট্যাক্সিতে উঠলেন। মি. সিম্পসন বললেন, 'মিস ভেরা, আগামীকাল সকালে আপনার সাথে দেখা করব আমি।'

'নিশ্চয়ই।'

মিস ভেরা উঠে বসল। ছেড়ে দিল ড্রাইভার ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে যেতে মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'পায়ের ওপর ত চাপ দিলে কেন, শহীদ।'

শহীদ বলল, 'মেয়েটা চিনতে পেরেছে গাড়ির ভিতর নিহত ভদ্রলোককে। চেনার ভান করছে যখন তখন জেরা না করে ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

মি. সিম্পসন হাঁ করে চেয়ে রইলেন শহীদের দিকে।

শহীদ বলল, 'আমি চললাম। কাল সকালে আলাপ হবে।' নিজের গাড়ির দি পা বাড়াল শহীদ।

মুখের ভিতর বৃষ্টি পড়ছে, তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করে ফেললেন মি. সিম্পস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি শহীদের গমন পথের দিকে।

পরের দিন সকাল। ব্রেকফাস্ট শেষে শহীদ কামালকে বলল, 'ডক্টর আমিনুল ইস খুন হয়েছেন।'

গত মাসখানেক ধরে কামাল শহীদের বাড়িতেই আছে। কফির কাপটা একটু হলে পড়ে যেত কামালের হাত থেকে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হোয়াট!'

গত রাতের ঘটনা খুলে বলল শহীদ। সবশেষে বলল, 'অকুস্থল থেকে ত বাড়ি না ফিরে ডক্টর আমিনুল ইসলামের বাড়িতে যাই। ভদ্রলোক বিয়ে করেন একা একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ওখানে গিয়ে দেখা পাই ডি. কস্টার।'

'সে কি করছিল ওখানে?'

শহীদ বলল, 'আমি জানতাম কুয়াশার কোন লোককে আশপাশে পাব। কস্টা কি করছিল? ডক্টরের অপেক্ষায় ছিল সে। কুয়াশা ওকে নিযুক্ত করে ডক্টর পাহারা দেবার জন্যে। কুয়াশা আশঙ্কা করেছিল, ডক্টরকে হত্যা করার চেষ্টা হ পারে। যাক, ডি. কস্টা গতকাল দুপুর থেকে হারিয়ে ফেলে ডক্টরকে।'

'ডক্টরের বাড়িতে কি দেখলি?'

'দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখলাম আমার আগেই কেউ তালা খুলে ভি ঢুকেছিল। চেয়ার টেবিল উল্টোপাল্টা করে ছড়ানো চারদিকে। খাটের গদি ছেঁ ড্রয়ারগুলো মেঝেতে পড়ে আছে, বুক কেসের বইগুলোর অবস্থাও তাই—মোটা কেউ তন্ন তন্ন করে কিছু একটা খুঁজেছে বুঝতে পারলাম।'

কামাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শহীদের দিকে।

শহীদই মুখ খুলল আবার, 'ডক্টর আমিনুল ইসলামের কাছ থেকে কেউ আশা করেছিল। সেটার খোঁজেই গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। সম্ভবত পায়নি। পা বলেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

জুতোর শব্দ শুনে কান খাড়া করল কামাল। শহীদ বলল, 'মি. সিম্প

গেলেন।'

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন মি. সিম্পসন। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, 'গুড মর্নিং, বয়েজ। টেলিফোনটা কি…?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ, সেরে গেছে ব্যারাম।'

মি. সিম্পসন টেলিফোনের দিকে এগুলেন। কিন্তু রিসিভার ধরতে হাত বাড়াতেই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল সেটা।

রিসিভার তুললেন মি. সিম্পসন, 'হ্যালো?'

পাঁচ সেকেণ্ড পর শহীদের দিকে তাকালেন তিনি, 'তোমার ফোন, শহীদ। মিস ভেরা কথা বলতে চাইছেন তোমার সাথে। তুমি কথা বলে নাও, তারপর আমি বলব।'

শহীদ উঠে গিয়ে মি. সিম্পসনের হাত থেকে রিসিভার নিল। মিনিট তিনেক মিস ভেরার সাথে কথা বলে রিসিভারটা মি. সিম্পসনের হাতে দিল ও। ফিরে এসে বসল সোফায় আবার। মি. সিম্পসনও দু'মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে শহীদের মুখোমুখি বসলেন একটা সোফায়। জানতে চাইলেন, 'কি বলল মিস ভেরা?'

শহীদ সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল চিন্তিতভাবে। বলল, 'সকালের কাগজে মেয়েটা দেখেছে গতরাতের মার্ডার কেসের তদন্তের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। খুব খুশি হয়েছে, বুঝতে পারলাম। আজ রাতে ডিনার খাওয়াতে চায় আমাকে।'

কামাল মন্তব্য করল, 'সাবধান, শহীদ। মিস ভেরার যে বর্ণনা খানিক আগে তুই আমাকে দিলি তাতে মনে হলো মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। ফাঁদে পড়ে যাসনি যেন!'

মুচকি হাসলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ বলল, 'ফাঁদে পড়তে না জানলে ফাঁদে কাউকে ফেলা যায় না রে।'

'অর্থাৎ?'

'ব্যাখ্যা চাস? পরে শুনিস। তা, মি. সিম্পসন, বলুন তো সাংবাদিকরা কিভাবে জানল যে আমি গতরাতের মার্ডার কেসের তদন্তের ভার নিয়েছি?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কি করে বলব বলো। আমি কারও সামনে টুঁ শব্দটিও করিনি। আমার মনে হয় একাজ তোমাদের সেই মতির। রিপোর্টাররা অকুস্থলে গিয়েছিল তুমি চলে আসার পর, তখন মতিই হয়তো ওদেরকে কথাটা বলে থাকবে।'

শহীদ মুচকি হেসে বলল, 'না। আসলে ফোন করে রিপোর্টারদেরকে কথাটা আমিই জানাই।'

'সে কি! কেন?'

শহীদ বলল, 'কারণ তো অবশ্যই একটা আছে। পরে শুনিস, কামাল। তার আগে কয়েকটা ঘটনার কথা বলি মি. সিম্পসনকে। তুইও শোন।'

সন্দেশ দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। কামাল বলল, 'তিঃ তিঃ ...'

শহীদ সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে। কি যেন ভাবছে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রইল ও। তারপর শুরু করল, 'আজ থেকে চার মাস অ আত্মহত্যা করেন বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা কেমিস্ট মি. সায়িদ, মনে অ তো?' মি. সায়িদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন এবং এমন এ এক্সপেরিমেন্টের কাজে নিযুক্ত ছিলেন যা সফল হলে মানুষের শরীরের যাব দূষিত পদার্থকে একটি মাত্র ইঞ্জেকশন দিয়ে ঠিক করে দেয়া সম্ভব হত। মি. সা আত্মহত্যা করেন, কারণ আজও অনাবিষ্কৃত। শুধু একটি ব্যাপার জানা গে যেদিন তিনি আত্মহত্যা করেন সেদিন সকালে তাঁর সাথে একজন রাশিয়ান ভদ্রলে দেখা করতে যান। রাশিয়ান ভদ্রলোককে পরে আর কোথাও পাওয়া যায়নি। জ গেছে, ভদ্রলোক সামান্য খোঁড়া ছিলেন।

দম নিয়ে শহীদ আবার শুরু করল, 'মাস তিনেক আগে শান্তিনগর এলা পাওয়া যায় মেজর জেনারেল মুহম্মদ আলীর বুলেটবিদ্ধ লাশ। মেজর জেনা রিটায়ার করেছিলেন, সবাই জানে, কিন্তু আসলে তিনি সরকারের বিশেষ অনুরে বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হত্যাকারীকে আজও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। বিকেল বেলা মেজর জেনারে দেখা যায় একটি ক্লাবে। তাঁর সাথে এক ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে যারা ক্লাব থেকে ওঁদের দু'জনকে বেরিয়ে যেতে দেখে তাঁরা বলেছেন মেজর জেনারেলের সঙ্গী ভদ্রলোক হাঁটছিলেন সামান্য খুঁড়িয়ে।'

'মাই গড!' দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে শব্দ দুটো উচ্চারণ করলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা ধরাল, বলতে করল আবার। 'এরপর ঘটে আরও মর্মান্তিক ঘটনা। বিজ্ঞানী শহীদ মাহ রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লাইনের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে ট্রেন সাথে সাথে তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বিজ্ঞানী শ মাহমুদের সাথে যে লোকটা ছিল সে হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এবং এই ধর একটা ঘটনা ঘটে গতরাতেও। যে লোক মতির গ্যারেজে লাল ফিয়াট রেখে যায় মোড়ে গিয়ে মিলিত হয় একজন খোঁড়া লোকের সাথে। মি. সিম্পসন, প্রতিটি ঘ তাৎপর্যপূর্ণ নয়? প্রতিটি ঘটনাতেই আমরা একজন খোঁড়া লোককে পাচ্ছি কিন্তু ঘ ঘটে যাবার পর তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। গতরাতে ডক্টর আমিনুল ইসলাম হয়েছেন। গাড়িটা মতির গ্যারেজে রেখে যায় কে জানেন?'

'কে?'

'চেহারার বর্ণনা শুনে আমার ধারণা, প্রফেসর ওয়াইয়ের ডান হাত কুখ মাতবর ছাড়া কেউ নয় সে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তারমানে শয়তান প্রফেসর ওয়াই নির্বিঘ্নে একটার

একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে—আমরা তার কেশও স্পর্শ করতে পারছি না। একদিন সকালে হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখব—আমি নেই, শয়তান প্রফেসর ওয়াই আমাকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে বাড়ির পিছনের নর্দমায়!'

কামাল বলল,'কথাটা অস্বীকার করে লাভ নেই, আমরা প্রফেসর ওয়াইয়ের নাগাল পাচ্ছি না। তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারছি না।'

শহীদ গম্ভীরভাবে বলল, 'তার কাছে আমরা যেতে পারছি না সত্যি। সেক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে আমাদের কাছে আসে। আমার পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করি এবার···কামাল, দেখ তো তোর সেই তিনকাপ চা হলো কিনা। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে কথা বলব আমরা।'

সেদিনই সন্ধ্যার খানিক পরের ঘটনা।

পুরানো ঢাকা শহরের চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থাইফা। মিস ভেরার অনুরোধে শহীদ এই প্রথম পা ফেলছে এখানে। কেবিন রিজার্ভ করা ছিল আগে থেকেই। নির্দিষ্ট সময়ে এসে শহীদ মিস ভেরাকে পেয়েছে কেবিনে।

খেতে খেতে গল্প করছিল ওরা।

'তদন্তের কাজ কতদূর এগোল, মি. শহীদ? যেহেতু দুর্ভাগা লোকটার লাশ আমার গাড়িতে পাওয়া গেছে সেহেতু, স্বভাবতই, আমি এই কেসের ফলাফল জানতে উৎসাহী।'

শহীদ হাসল নিঃশব্দে। বলল, 'কেসটা জটিল। এই হত্যাকাণ্ডের ভিতর প্রচুর রহস্য আছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি আমি। চমকপ্রদ খবর দিতে পারব, আশা করছি।'

'আমাকে বলবেন না?'

আবার হাসল শহীদ, 'দুঃখিত।'

মিস ভেরাও হাসল, 'আপনারা, আইমিন, প্রাইভেট ডিটেকটিভরা নিজের ওয়াইফকেও বিশ্বাস করেন না। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের প্রতি ভীষণ দুর্বলতা আছে আমার। অনেক বই পড়েছি, এদের কাণ্ডকারখানা সত্যি বিস্ময়কর লাগে আমার কাছে। বইয়ের ডিটেকটিভ আর বাস্তবের ডিটেকটিভ—পার্থক্য নেই! পেটের কথা আদায় করা মুশকিল। যাক, আচ্ছা, ডিটেকটিভরা নাকি কোন ঘটনাকেই ছোট করে দেখেন না, কোন চরিত্রকেই সন্দেহের উর্ধ্বে বলে মনে করেন না। সত্যি নাকি?'

'সত্যি।'

মিস ভেরা হাসছে, 'আমাকেও তাহলে সন্দেহ করেন আপনি?'

হেসে উঠল শহীদ।

মিস ভেরা ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'নিশ্চয়ই আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন ইতিমধ্যে? আচ্ছা, বলুন তো, কোথায় থাকি আমি? কি কাজ করি? বলতে পারলে মেনে নেব আপনি সত্যি কাজের ডিটেকটিভ, নাম-কা ওয়াস্তে নন।'

শহীদ রিস্টওয়াচ দেখল, 'আপনি বিদেশী একটা ব্যাঙ্কে স্টেনোটাইপিস্টের চাকরি করেন। ঢাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করেছেন, ওপর তলায় থাকেন, নিচের তলা দুটো ভাড়া দিয়েছেন। আপনার দেশ সুইডেনে। বাবা নেই, মা আছেন কিন্তু তিনি বিয়ে করেছেন আবার...'

'ওয়াণ্ডারফুল! সত্যি, আমি স্যাটিসফায়েড! পাস করেছেন আপনি।'

আবার রিস্টওয়াচ দেখল শহীদ।

'বারবার সময় দেখেছেন। কোথাও যাবার কথা আছে নাকি?'

শহীদ বলল, 'আমার সহকারী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ওকে গতকালকের মার্ডার কেস সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে কয়েক জায়গায় যেতে বলেছিলাম, এতক্ষণে ফিরেছে সে। তথ্য কিছু পেল কিনা জানার ইচ্ছা হচ্ছে।'

মিস ভেরা বলল, 'আপনি তো গাড়ি আনেননি।'

'না। পুরানো শহরে গাড়ি আনি না।'

মিস ভেরা বলল, 'আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে চাই না। আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে ধন্যবাদ। বাড়ি ফিরবেন কিসে বলুন তো?'

'ট্যাক্সি নেব।'

মিস ভেরা বলল, 'ট্যাক্সি নেবেন কেন? আমার গাড়ি রয়েছে, চলুন পৌঁছে দিই আপনাকে। কোথায় থাকেন আপনি?'

'গুলশানে। অনেক দূর।'

মিস ভেরা হাসল, 'দূর না ছাই। আপনার মত স্বনামধন্য লোকের সঙ্গ পেলে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারি। এক মিনিট বসুন, আমি ফোন করে জানিয়ে দিই বাড়ি ফিরতে দেরি হবে রাতে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার বান্ধবী শ্যারনের কাছে যাব। অনেকদিন দেখা নেই। ও গুলশানেই থাকে।'

মিস ভেরা কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। ফোনে কথা বলে পাঁচ মিনিট পরই কেবিনে ফিরল সে। বলল, 'চলুন।'

মিস ভেরার গাড়িতে এসে উঠল ওরা। শহীদ সিগারেট ধরাল।

অনর্গল কথা বলল, সুন্দরী ভেরা। কোন্ রোমাঞ্চোপন্যাসে কোন্ ডিটেকটিভ কি করেছিল, কিভাবে ধরেছিল ক্রিমিন্যালকে— এই সব গল্প।

গাড়ি ছুটছে। পশু হাসপাতাল পেরিয়ে গেল। হাইকোর্টের কাছে এসে মোড় নিল গাড়ি।

'ব্রেকটা ঠিক মত কাজ করছে না যেন!' মিস ভেরা বিরক্তির সাথে কথাটা বলে ব্রেক প্যাডেলে পা দিয়ে চাপ দিল। স্পীড কমছে গাড়ির, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

পরমুহূর্তে বাইরে থেকে একজন লোক গাড়ির দরজা খুলে ফেলল এক ঝটকায়।

লোকটা যেন গাড়ি থামার অপেক্ষায় ছিল।

লাইট পোস্টের আলোয় শহীদ দেখল লোকটার হাতে চকচক করছে কালো একটা পিস্তল।

'নড়েছ কি মরেছ, শহীদ খান। লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে এসো বাইরে।'

শহীদ দেখল গাড়ির চারদিকেই লোক রয়েছে। মিস ভেরা ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মি. শহীদ...একি ঘটছে...!'

'চুপ! একটা কথা বলেছ কি খুন করে ফেলব!'

উপায় নেই, এমনভাবে হাসল একটু শহীদ। বেরিয়ে এল গাড়ির ভিতর থেকে লক্ষ্মী ছেলের মতই।

সামনেই একটা নীল টয়োটা দাঁড় করানো রয়েছে। সেদিকে হাঁটতে বলা হলো শহীদকে। নিঃশব্দে টয়োটার দিকে এগোল শহীদ। পিছনে মিস ভেরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, শুনতে পেল ও।

টয়োটায় উঠল শহীদ। পিছু পিছু উঠল মিস ভেরা। স্টার্ট দেয়াই ছিল গাড়িতে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। তীরবেগে ছুটল গাড়ি। মোট তিনজন লোক গাড়িতে। শহীদের হাত বেঁধে ফেলা হলো। বাঁধা হলো ওর চোখ।

মিস ভেরা সারাক্ষণ কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

টয়োটা শহরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না শহীদের খানিক পর। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও কিন্তু ট্রাফিকের শব্দ পাচ্ছে না বিশেষ।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর থামল টয়োটা। দরজা খোলার শব্দ শুনল শহীদ। ইতিমধ্যে পা দুটোও বেঁধে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

যে লোকটা ওকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ঘনঘন হাঁপাতে দেখে শহীদ বুঝতে পারল সিঁড়ির ধাপ টপকে উপরে উঠছে লোকটা। একসময় থামল লোকটা। তালা খোলার শব্দ হলো। খট্ করে শব্দ হলো সুইচ টিপে আলো জ্বালার। একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে। কেউ ওর হাতের বাঁধন স্পর্শ করল না। তবে খুলে দিল একজন ওর পায়ের বাঁধন। তারপর খোলা হলো ওর চোখের রুমাল।

উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। খানিক পর মিট মিট করে চোখ মেলে তাকাল আবার শহীদ।

সামনে একটা নিচু ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। ডেস্কের ওধারে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে প্রকাণ্ড চেহারার একজন লোক।

প্রফেসর ওয়াইকে চিনতে পারল শহীদ। উন্মাদগ্রস্ত এক প্রতিভা ওর দিকে চেয়ে আছে খ্যাপাদৃষ্টিতে।

আট

চারকোনা বিরাট রুমের দেয়াল ঘেঁষা একটা চেয়ারে বসে আছেন প্রফেসর ওয়াই। নিচু ডেস্কে রীডিং ল্যাম্প জ্বলছে। ল্যাম্পটার সবুজ শেড এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে সব আলো পড়েছে শহীদের দিকে। প্রফেসর ওয়াই বসে আছেন ছায়াতে।

প্রফেসর ওয়াইকে চিনতে পারল শহীদ তার বিরাট বিশাল শরীর দেখে। ছদ্মবেশধারী প্রফেসর ওয়াইয়ের এক চেহারা দ্বিতীয় বার কেউ কোনদিন দেখেনি।

ঘন কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে লাল দুটো চোখ। মাথায় টাক। চোখে চশমা। লোমশ হাত দুটো ডেস্কের উপর বিছানো। সামনের দিকে ঝুঁকে ক্লিনশেভ্ড্ প্রফেসর ওয়াই নিঃশব্দে দেখছেন শহীদকে। হাতের পাইপ থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে।

পুরো এক মিনিট তিনি নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন, 'মেরা খুশনসীব! তুম মেরে মেহমান হো!'

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতে কথা বলতে পারেন প্রফেসর ওয়াই। কোনটা তার মাতৃভাষা আজও কেউ তা জানে না।

শহীদ চুপ করেই রইল। প্রফেসর ওয়াইয়ের পিছনের দেয়ালে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্য করতে ভুল করল না ও।

'যাদেরকে হত্যা করব তাদের তালিকায় তোমার নাম আছে, তুমি জানো। কিন্তু, মি. টিকটিকি, তোমাকে কিভাবে হত্যা করব তা এখনও ভেবে ঠিক করার সময় পাইনি। কিছু মনে কোরো না, আমি তোমার সাথে মন খুলে খোলাখুলি আলাপ করছি।'

পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রফেসর ওয়াই। আবার কথা বলে উঠলেন তিনি, 'যতদূর মনে পড়ে, আগে তুমি কথাবার্তা একটু বেশি পরিমাণে বলতে। আজকাল কম কথা বলো, না, ভয়ে কথা বেরুচ্ছে না?'

শহীদ মৃদু হাসল। বলল, 'আমার ভয় পাবার কোন কারণ ঘটেনি। ভয় পাবেন আপনি। পুলিস আপনাকে অসংখ্য খুনের অপরাধে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই তারা আপনার হাতে হাতকড়া পরাবে। দিন আপনার শেষ হয়ে এসেছে, প্রফেসর ওয়াই। আপনার পাগলামি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, আপনি ধরা পড়লেন বলে।'

'শাট আপ!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর ওয়াই, 'তোমার মত ছেলেমানুষের মুখে অমন কথা এর আগেও অনেক শুনেছি আমি। পুলিস গ্রেফতার করবে আমাকে—ফুহ্! জানো, আমার ল্যাবরেটরিতে ভ্যানিশিং রে মউজুদ আছে? ক'হাজার পুলিস আছে বাংলাদেশে? ভ্যানিশিং রে ব্যবহার করলে দশলাখ পুলিসকে আমি বাতাসের সাথে

মিশিয়ে গায়েব করে দিতে পারি মুহূর্তে। বড় বড় কথা বলো আমার সামনে বসে! দেখাব মজা? আমার ড্রিলিং মেশিনটা··· মাথার মাঝখান দিয়ে নামিয়ে দেব ইস্পাতের বিটটা?'

বাঘের মত ফুঁসছেন প্রফেসর ওয়াই।

হঠাৎ শহীদ দেখল ওর চেয়ারের পিছন থেকে একজন লোক এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বাঁ দিকের দেয়ালের কাছে।

নীল স্যুট পরা লোকটার ডান গালে কাটা দাগ। পেশীবহুল শরীর। কদাকার, কুৎসিত চেহারা।

শহীদ বলল, 'এই লোকই ডক্টর আমিনুল ইসলামকে খুন করে গাড়ির ভেতর ফেলে রেখে আসে। আপনার ডান হাত, মাতবর। তাই না, প্রফেসর?'

'খামোশ!' গর্জন করে উঠলেন প্রফেসর, 'আমাকে প্রশ্ন করার সাহস দেখাচ্ছ! বড় বেশি বেড়ে গেছ তুমি, ছোকরা! আমি বাংলাদেশে থাকতে কাউকে বেশি বাড়াবাড়ি করতে দেব না, স্মরণ রেখো। প্রস্তুত হও, বীর পুরুষ, মৃত্যু ঘটবে তোমার পাঁচ মিনিটের মধ্যে। মাতবর!'

'জ্বী, হুজুর!'

'ভ্যানিশিং রে! নিয়ে এসো জলদি!'

'জ্বী, হুজুর!' দ্রুত একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কুৎসিতদর্শন মাতবর।

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন প্রফেসর।

শহীদ বলল, 'আমাকে খুন করে রেহাই পাবেন না, প্রফেসর ওয়াই। আমাকে কিডন্যাপ করে খুন করাটাই হবে আপনার ধ্বংসের মূল কারণ।'

ডেস্কের উপর থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন প্রফেসর ওয়াই। হঠাৎ গলা ছেড়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

শিউরে উঠল শহীদ। কী ভয়ঙ্কর হাসি! কেঁপে ওঠে অন্তরাত্মা!

দ্রুত আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল শহীদ রুমের চারদিকে। বড়সড় একটা ডাইনিং টেবিল পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ফার্নিচার বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। তিনটে দরজা মোট। একটা দরজা প্রফেসর ওয়াইয়ের চেয়ারের ঠিক পিছনে।

গোটা বাড়িটায় বিরাজ করছে কবরের নিস্তব্ধতা। বাইরে থেকে এতটুকু শব্দ আসছে না। সম্ভবত সাউণ্ড প্রুফ রুম এটা। ওয়ালক্লকটা শুধু সারাক্ষণ টিকটিক, টিকটিক করছে। সাড়ে দশটা বাজতে আর মাত্র মিনিট দুয়েক বাকি।

শহীদ কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে প্রফেসর ওয়াই বলে উঠলেন, 'কান পেতে কোন লাভ হবে না, ছোকরা। সন্ধ্যার পর এখানে কোন শব্দ আসে না। শব্দ শুধু যে আসে না তাই নয়, এখান থেকে কোন শব্দ বাইরে বেরুতেও পারে না। পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। গতকালকের কথাই ধরো না।

ডক্টর আমিনুল ইসলাম "বাঁচাও" "বাঁচাও" করে কি কম চিৎকার করল? স্ট্রিকলিন হুইস্কির সাথে পেটে পড়তেই সে কি হাত-পা খেঁচা তার। স্ট্রিকলিন পেটে পড়লে ভিক্টিম অমন আকাশ ফাটায়—কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক, কোন অসুবিধেই ঘটেনি। বাইরে থেকে শুনতে পায়নি কেউ তার গলা।'

শহীদ ওয়ালক্লক থেকে চোখ নামিয়ে বলল, 'একজন নিরীহ লোককে হত্যা করে কি লাভ হলো আপনার?'

খেপে গেল প্রফেসর ওয়াই, 'নিরীহ লোক? এই আমিনুল ইসলাম? ঠাট্টা করছ তুমি আমার সাথে?'

'কি তার অপরাধ শুনি?'

'টাকা সাধলাম, অনুরোধ করলাম, ভিক্ষা চাইলাম—কেন বলল না সে আমাকে বন্ধ হয়ে যাওয়া মানুষের হার্টকে আবার চালু করার ওষুধটার নাম? গোপন রেখে কি লাভ হল তার? কোন কাজে লাগাতে পারল সে জিনিসটা? ওটা পেলে আমি কি করতে পারতাম তা জানো? মৃত মানুষ পচে যায়, জানো তো? আমি দেশী গাছ-গাছড়া দিয়ে এমন একটা কেমিক্যাল তৈরি করেছি যা মাখিয়ে দিলে মৃত মানুষ পচবে না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন ছিল জীবিত অবস্থায় তেমনি থাকবে মরে গেলেও। ধরো, একজন লোক সিদ্ধান্ত নিল সে এখন মরে যাবে স্বেচ্ছায়,—কিন্তু এক হাজার কি পাঁচ হাজার বছর পর আবার জীবিত হবে। অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হচ্ছে? না-না-না, মোটেই অবাস্তব নয়। লোকটার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব। হার্টকে অকস্মাৎ বন্ধ করে দেবার উপায় আমার জানা আছে। সাভারের লোকগুলোর হার্ট কেমন অচল করে দিলাম, দেখলে তো? ইচ্ছা করলে ওদের দেহ না পচবার ব্যবস্থাও করতে পারতাম আমি। সে যাকগে, যা বলছিলাম—লোকটার হার্ট অচল করে দিয়ে সেই কেমিক্যাল মাখিয়ে দিলাম, ধরে নাও। এক হাজার বা পাঁচ হাজার বছর পর আবার যদি তার হার্ট চালু করা যায় তাহলেই সে জীবিত হতে পারে আবার। ঠিক তো? তবেই দেখো, ব্যাপারটা অবাস্তব মোটেই নয়। কিন্তু ঘাপলা সৃষ্টি করল ওই আমিনুল ইসলাম। কোনমতেই ওষুধটা তৈরির নিয়ম প্রকাশ করতে রাজি হলো না।'

শহীদ জানতে চাইল, 'সাভারের লোকগুলোকে হত্যা করার···!'

'হত্যা? ছোকরা, তুমি দেখছি বোকার হদ্দ। হত্যা আমি করিনি। ওদের হার্ট অচল করে দিয়েছিলাম মাত্র।'

'কিন্তু অচল হার্টকে সচল করার উপায় আপনি জানতেন না। ডক্টর আমিনুল ইসলাম যদি ওদের হার্ট সচল করতে ব্যর্থ হতেন তাহলে ওরা সবাই মারা যেত!'

'আমি হার্ট সচল করার ওষুধ তৈরি করেছিলাম। কিন্তু প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলাম, কাজ হচ্ছে না। যাক, স্বীকার করি, ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হয়নি। তবে কি জানো ছোকরা, এত লোক বেঁচে রয়েছে বলেই তো এত সমস্যা—কিছু মরলে

মন্দের চেয়ে ভালই হয়। তবে, কাজটা করেছিলাম আমি রাগে।'

'রাগে?'

'হ্যাঁ! রেগে গেলে আমি কি করি না করি খেয়াল থাকে না। তাই তো বারবার বলি, আমাকে রাগিয়ো না। বিপদ ঘটিয়ে দেব আমাকে রাগালে। এমন বিপদ যা ঘটলে কেউ প্রাণে বাঁচবে না তোমরা…।'

একদিকের দরজা খুলে গেল আচমকা। ভিতরে ঢুকল কুৎসিত দর্শন মাতবর। তার হাতে অদ্ভুতদর্শন একটা যন্ত্র। যন্ত্রটা দেখতে দেড় হাত লম্বা টর্চের মত। খুব ভারি নিশ্চয়। মাতবর দুই হাত দিয়ে ধরে নিয়ে এল। মুখের দিকটা বড়সড়, অনেকটা গোলাকার।

'দাও ওটা আমাকে,' প্রফেসর ওয়াই বললেন, 'ছোকরাকে বাতাসে মিলিয়ে দিই।'

মাতবর ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রমাদ গুনল শহীদ। ঘামছে ও। বুকের ভিতর জমাট বেঁধে গেছে মৃত্যুভয়। দ্রুত ওয়ালক্লকের দিকে আর তাকাল ও। দশটা বেজে বত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে…।

প্রচণ্ড ধাক্কা মারল সারা শরীরে অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ ওয়ার্নিং বেলের শব্দ। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শহীদ ডেস্কের উপর রাখা বেলটার দিকে।

প্রফেসর ওয়াই হাত বাড়িয়েছিলেন মাতবরের হাত থেকে ভ্যানিশিং মেশিনটা নেবার জন্যে, বেলের শব্দ শুনে থমকে গেছেন তিনি।

পরমুহূর্তে ধাক্কা মারল কেউ দরজায়। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজা সেই প্রচণ্ড ধাক্কায়।

মি. সিম্পসনের ভারি গলা শোনা গেল সাথে সাথে, 'হ্যাণ্ডস আপ, শয়তান প্রফেসর…।'

মি. সিম্পসনের কথা শেষ হবার আগেই পিস্তলের শব্দে কানে তালা লাগার অবস্থা হলো। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল রুমটাকে।

শহীদ চেঁচিয়ে উঠল, 'মি. সিম্পসন, ডেস্কের পিছন দিকে একটা দরজা আছে। প্রফেসর ওয়াই ওই পথেই পালাচ্ছেন…।'

কামাল পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। প্রফেসরের পিছনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ দেখা গেল।

রুমের ভিতরে প্রফেসর ওয়াই নেই। তার ডান হাত মাতবরকেও দেখা গেল না।

'দরজাটা ভেঙে ফেলতে হবে।' কামাল এবং মি. সিম্পসন এক যোগে দৌড়ে দরজার গায়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলেন। ভেঙে পড়ল দরজা। দেখা গেল একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

'কামাল তুমি থাকো এখানে। তোমরা এসো।' সশস্ত্র কনস্টেবল তিনজনকে

নিয়ে ঝড়ের বেগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেলেন মি. সিম্পসন।

শহীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল কামাল।

'এত দেরি করলি কেন তোরা?'

কামাল বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম প্রফেসরের ডান হাত বাঁ হাত কাউকে পাকড়াও করতে পারব। কিন্তু কাউকে পাইনি কোথাও। তুই যে কোন্ রুমে আছিস তা আবিষ্কার করতেই দেরি হয়ে গেল।'

'মিস ভেরাকেও পাসনি?' কামাল অবাক হলো।

'না।'

শহীদ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হারামজাদী পালিয়েছে! ওকে আমি গতকালই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কে ও?'

'প্রফেসর ওয়াইয়ের অ্যাডাপটেড ডটার। দশ বারো বছর আগে দেখেছি, তখন অনেক ছোট ছিল।'

মি. সিম্পসন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন খানিক পর, 'পালিয়েছে শয়তানটা!'

নয়

এক হপ্তা পরের কথা।

বিকেল চারটে। শহীদ এবং কামাল ড্রয়িংরুমে বসে আছে। মহুয়া অন্দরমহল থেকে এসে কামালের পাশে বসল।

শহীদ বলল, 'কই গো, তোমার বান্ধবী মিসেস খান কোথায়?'

গোল, ফর্সা হাত তুলে ছোট্ট রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল মহুয়া, 'তাই তো! চারটে বেজে গেছে। ট্রাফিকের জন্যে লেট হচ্ছে হয়তো। জরুরী দরকার বলল, আসবে তো অবশ্যই।'

কামাল বলল, 'মহুয়াদি, মিসেস খান তোমার কেমন বান্ধবী বলো তো? একদিনও মহিলাকে দেখলাম না কেউ আমরা?'

মহুয়া বলল, 'দেখার কথা নয়, আমার বিয়ের আগেই স্বামীর সাথে নিউইয়র্কে চলে যায় ও। ফিরেছে মাত্র তিন মাস হলো। ঢাকায় এখন থাকবে ওরা স্থায়ীভাবে। শ্যামলির—ওকে আমি ওর ডাক নাম ধরে ডাকি—শ্যামলির স্বামী গতমাসে ফিরে গেছে আবার নিউইয়র্কে। ওখানে ওদের বিরাট ব্যবসা।'

কলিংবেলের শব্দ হলো। উঠে দাঁড়াল মহুয়া, 'ওই এসেছে শ্যামলি।'

বেরিয়ে গেল মহুয়া ড্রয়িংরুম থেকে। খানিক পরই ফিরল অপরূপ সুন্দরী ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স্কা নাভীর নিচে নীল শাড়ি পরিহিতা বব-কেশী এক

মহিলাকে সাথে নিয়ে। শহীদ এবং কামালকে দেখিয়ে মহুয়া বলল, 'ওরা দু'জন যথাক্রমে আমার স্বামী এবং দেওর। আর, এ শ্যামলি, আমার বান্ধবী। গাছে চড়ে একবার নদীতে লাফ দিয়ে দু'জনেই ডুবে যাচ্ছিলাম···।'

'মহু! থাম।'

শহীদ বলল, 'বসুন।'

মহুয়া মিসেস খানকে নিয়ে বসল একটা সোফায়। বলল, 'পরশুদিন ফোন করে যেতে বলেছিলি, যেতে পারিনি বলে রাগ করিসনি তো? সংসারের ঝামেলায়···।'

মিসেস খান বলল, 'সংসার বৈকি! এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি—একে আবার সংসার বলে নাকি?'

'তোর কটা বাচ্চারে?' মহুয়া জানতে চাইল।

হেসে ফেলল মিসেস খান। 'একটাও না।'

'কথা বল তোরা। আমি চা দিতে বলি।'

উঠে দাঁড়াল মহুয়া। কাজের কথার সময় মহুয়া শহীদকে বিরক্ত করে না কখনও।

মিসেস খান শহীদের দিকে তাকাল। বলল, 'সংক্ষেপে সারব, না, কোন কথা বাদ না দিয়ে সবটাই বলে যাব?'

শহীদ বলল, 'আমার কোনও ব্যস্ততা নেই। তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে বলাই ভাল।'

মিসেস খান শুরু করলেন, 'মহুয়া সম্ভবত আপনাকে জানিয়েছে, আমি মূর্তি সংগ্রহ করি। বলতে পারেন, এটা আমার হবি। সংগ্রহ আমি হরেক রকম জিনিসই করি। তবে যে কোন ধরনের মূর্তির ওপর বিশেষ দুর্বলতা আছে আমার। নিউইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডন, ভিয়েনা যেখানেই উল্লেখযোগ্য কোন মূর্তি বিক্রির জন্যে আসুক, ডিলারদের কেউ না কেউ আমাকে খবর দেবেই। সম্ভব হলে ঝট্ করে চলে যেতাম প্লেনে করে মূর্তিটা দেখার জন্যে। পছন্দ হয়ে গেলে কিনতাম, পছন্দ না হলে কিনতাম না।'

মিসেস খান দম নিয়ে বলতে লাগল, 'ঢাকায় এসেছি মাত্র মাস তিনেক হলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই এখানকার এজেন্ট এবং ডিলারদের কাছে আমি বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছি। ডিলারদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের এবং বিশ্বস্ত বলে মনে করি আমি জনাব তবারক হোসেনকে। গতকাল তবারক হোসেন ফোন করে আমাকে জানায় যে একটি রাশিয়ান আইকন (Ikon)—আইকন বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, ধর্মীয় মূর্তি অর্থাৎ দেবতাদের পবিত্র মূর্তি যা রাশিয়ান চার্চ বা বাসভবনে সযত্নে রাখা হয়—নীলাম হবে রেজিস্টার্ড নীলামকারী মি. কুদ্দুসের অফিসে। তবারক হোসেন আমাকে জানায় জিনিসটা দেখতে খুবই সুন্দর। নীল আর সবুজ রঙের ম্যাডোনা এবং তার সন্তান। সিলভারের আচ্ছাদনের ওপর ওই দুই রঙের এনামেল। সম্ভবত

টুয়েলফ্‌থ্‌ বা থারটিনথ্‌ সেঞ্চুরীর কাজ। তবারক হোসেন জানাল, হাজার খানেক টাকার বেশি দাম উঠবে না, আমার হয়ে সে নীলামে যোগ দিতে চায়। কিন্তু নীলামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পছন্দ করি আমি। তাই অনুষ্ঠানের বেশ খানিক আগে মি. কুদ্দুসের অফিসে হাজির হই। আইকনটা ওখানেই প্রথম দেখলাম আমি। দেখেই ওটার প্রেমে পড়ে গেলাম। জিনিসটা ছোটখাট, নয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি সম্ভবত, কিন্তু আকারের তুলনায় বেশ ভারী।'

সন্দেশ এবং লেবু দুটো ট্রে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। চা এবং বৈকালিক নাস্তা। কামাল বলল, 'আগে খেয়ে নিন, মিসেস খান।'

পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে মিসেস খান বলতে লাগল, 'খানিক পর ওখানে এল আমার ডিলার তবারক হোসেন। সে জানাল আইকনটা একজন রাশিয়ান কাউন্টের মিউজিয়মে ছিল। কাউন্টের নামটা ভুলে গেছি আমি। মিউজিয়ম থেকে আইকনটা নাকি চুরি যায় উনিশশো উনিশ সালে। তারপর নানা দেশ ভ্রমণ করে ওটা এসে ঠেকেছে ঢাকায়। যাক, নীলাম অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় আমরা বহু লোক বেলা চারটের পরও বসে রইলাম। শুরু হবার কথা বেলা দুটোয়। অধৈর্য হয়ে বেশির ভাগ লোক চলে গেল। বেলা সাড়ে চারটের সময় আইকনটা নিয়ে আসা হলো। শুরু হলো ডাক। একশো টাকা থেকে শুরু হলো ডাক। আমরা তিন কি চারজন ছিলাম ওটা কেনার জন্যে। এগারোশো টাকা পর্যন্ত উঠে চতুর্থ ব্যক্তি খসে গেলেন? রইলাম বাকি তিনজন। আমি, একজন রোগা পটকা হ্যাট পরা অ্যাংলো এবং চশমা পরা স্বাস্থ্যবান আর এক লোক। অ্যাংলোটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেইনি আমি। হাবভাব-সর্বস্ব সদা-সতর্ক ধড়িবাজ লোক বলে মনে হচ্ছিল। একটু পাগলাটে বলেও মনে হয়। মুচকি মুচকি হাসে, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, পুরক্ষণে অশান্ত হয়ে ওঠে, কায়দা করে সিগারেট ধরায়—হাস্যকর। মাথা ঘামাচ্ছিলাম দ্বিতীয় লোকটাকে নিয়ে। লোকটা রঙিন গ্লাসের চশমা পরে ছিল। প্রকাণ্ড শরীর। ডান গালে কাটা দাগ। দেখতে, মানে, চেহারাটা ঠিক···কি বলব, লোকটাকে দেখে প্রথম থেকেই ভয় লাগছিল আমার।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'ঠিক লক্ষ্য করেছেন আপনি, ডান গালে কাটা দাগ ছিল?'

'ছিল। আমি ভুল দেখিনি।'

শহীদ এবং কামাল দৃষ্টি বিনিময় করল।

মিসেস খান শুরু করল আবার, 'দ্বিতীয় লোকটা যে সহজে পরাজয় স্বীকার করবে না তাও আমি বুঝতে পারছিলাম। তবারক হোসেনকে পাঠালাম, লোকটার পরিচয় জানার জন্য। তবারক হোসেন ফিরে এসে আমার কানে কানে বলল, লোকটার নাম মহাদেব। পুরো নাম কেউ জানে না। আগে কেউ দেখেনি তাকে।'

'তারপর?'

'অ্যাংলো লোকটাকে আগে গ্রাহ্য না করলে কি হবে, সেও ভাবিয়ে তুলল

আমাকে। ইতিমধ্যে আড়াই হাজারে পৌঁছে গেছে ডাক। অ্যাংলো একলাফে তিন হাজারে চলে গেল। মহাদেব বলল, তিন হাজার একশো। বিরক্তি লাগছিল আমার। জেদ কাজ করছিল আমার মধ্যে। তাছাড়া জিনিসটা আমার খুবই ভাল লেগে গেছে। দাম যতই পড়ুক, না কিনে ছাড়ব না। সবাইকে চমকে দেবার জন্য কাণ্ড করলাম একটা, পুরো চার হাজার টাকা অফার করলাম। আমি চার হাজার বলতেই চমকে উঠল মহাদেব ভদ্রলোক। কিন্তু আমাকে চমকে দিল অ্যাংলোটা। সে এক লাফে উঠে গেল পাঁচ হাজারে।'

'মোস্ট ইন্টারেস্টিং,' কামাল সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে।

'মহাদেব বলল, ছয় হাজার। অ্যাংলো উত্তর দিল, সাত হাজার। আমি নির্বাক দর্শকের মত ওদের দু'জনের কাণ্ড দেখছি তখন। দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। কে কাকে টেক্কা দিতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। হঠাৎ চমকে উঠলাম, শুনলাম অ্যাংলো বলছে—বাইশ হাজার!'

'বাইশ হাজার একটা আইকনের দাম?' কামাল চোখ কপালে তুলল।

মিসেস খান বলছেন, 'তবারক হোসেনকে আবার পাঠালাম। ফিরে এসে ও জানাল, অ্যাংলোর নাম···।'

শহীদ বলে উঠল, 'স্যানন ডি. কস্টা।'

মিসেস খান সবিস্ময়ে জানতে চাইল, 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

'চেহারার বর্ণনা শুনে। আপনি বলে যান।'

মিসেস খান আবার শুরু করল, 'আমি দাম হাঁকার সময়ই পেলাম না, ডাক উঠে গেল পঁয়ত্রিশ হাজারে। অ্যাংলোকে বিচলিত দেখলাম। অকশনারকে সে জিজ্ঞেস করল, চেক গ্রহণ করা হবে কিনা। গ্রহণ করা হবে না জানানো হলো তাকে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর বিদায় হয়ে গেল সে। রইলাম আমি আর মহাদেব ভদ্রলোক। সত্যি কথা বলতে কি, তখন বিচার বিবেচনা বোধ ছিল না আমার। একটা আইকন অত টাকায় কেনার কোন মানে হয় না। টাকার কথা নয়, টাকা আমার আছে। কিন্তু টাকা থাকলেই যা তা কিনে অপচয় করা উচিত নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, জিনিসটাকে আমি যা তা ভাবতে পারছিলাম না। রীতিমত জাদু করেছিল আমাকে আইকনটা। আমি বললাম, চল্লিশ। মহাদেব ভদ্রলোক খুবই ধীর গলায় বললেন, একচল্লিশ।'

দম নিল মিসেস খান। তারপর শুরু করল, 'পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠলেন ভদ্রলোক। আমি একান্ন বললাম। ফোন করবার জন্য অনুমতি চাইলেন তিনি। লক্ষ্য করলাম মহাদেব ভদ্রলোকের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল আমাদের তবারক হোসেন।'

'তারপর!'

'মাত্র দু'মিনিট পর ফিরে এসে তবারক হোসেন প্রলাপ বকতে শুরু করল আমার কানের কাছে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দেখলাম তার মুখের চেহারা।

মহাদেব ভদ্রলোক আইকনটা কিনবেন কারণ তিনি একজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সেই রাশিয়ান ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ নাকি ছিলেন এই আইকনের মালিক, এটা পারিবারিক সম্মানের প্রতীক—সে এক লম্বা ইতিহাস। অর্থাৎ তবারক হোসেন বলতে চাইল আইকনটা মহাদেব ভদ্রলোককেই কিনতে দেয়া হোক। কিন্তু ওর একটা কথাও আমার কানে যাচ্ছিল না। যে জিনিস আমার পছন্দ হয়েছে সে জিনিস আমিই কিনব, দাম যতই পড়ুক। অথচ তবারক হোসেন আমাকে বারবার সেই একই কথা বলছে,—এক হাজার টাকার জিনিস পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকায় কেউ কেনে না, এর চেয়ে ভাল জিনিস কিনিয়ে দেব আপনাকে আমি, ইত্যাদি। অকশনার টেবিলে হাতুড়ি ঠুকতে আমি তবারক হোসেনকে সরিয়ে দিলাম সামনে থেকে, বললাম, পঞ্চান্ন হাজার। মহাদেব ভদ্রলোক বললেন, মে আই সে ফিফটি সিক্স থাউজ্যাণ্ড? আমি বললাম, সিক্সটি থাউজ্যাণ্ড। মাহদেব ভদ্রলোক বললেন, অ্যাণ্ড ফাইভ হাণ্ড্রেড। অকশনার আমার দিকে তাকাল, বলল, সিক্সটি থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ফাইভ হাণ্ড্রেড? ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। তবারক হোসেন চাপা উত্তেজনায় কাঁপছিল। ইতিমধ্যে উপস্থিত লোকেরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে একদল আমার দিকে, একদল মহাদেব ভদ্রলোকের দিকে দাঁড়িয়েছে। রুমের ভেতর পিন ড্রপ সাইলেন্স। তবারক হোসেন চাপা গলায় আমাকে বলছে, 'ছেড়ে দিন, মিসেস খান। ও-ই নিয়ে যাক ওটা। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি এর চেয়ে ভাল আইকন কিনিয়ে দেব।' আবার আমি লোকটাকে সরিয়ে দিলাম হাতের ধাক্কায়। মহাদেব ভদ্রলোক সত্তর হাজারে পৌঁছে গেছেন এক লাফে। মাথাটা ঘুরছিল আমার। কি করছি না করছি খেয়াল ছিল না তখন। ফস করে বলে বসলাম, ওয়ান লাখ!'

'এক লাখ!' মিসেস খান হাসলেন। বললেন, 'আমি এক লাখ বলতেই মহাদেব ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন হলরুম থেকে। আইকনটা আমার হলো।'

বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কামাল।

'তবারক হোসেন এরপর আর কোন কথা বলল না আমার সাথে। আমাকে সেখানে রেখেই বেরিয়ে গেল সে। মাত্র ওইটুকু সময়ে সম্পূর্ণ বদলে গেল লোকটা। যাক, আইকনটা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম আমি।'

'তারপর কি ঘটল!'

মিসেস খান বলল, 'আজ সকালে, ঘুম থেকে ওঠার আগেই, তবারক হোসেন বাড়িতে গিয়ে হাজির। ব্যাপার কি? না, ওর এক ক্লায়েন্ট আইকনটা কিনতে চায়, দাম দেবে দেড় লক্ষ টাকা। তবারককে বললাম, ওটা আমি বেচবার জন্য কিনিনি। তা সত্ত্বেও সে জানতে চাইল, কত দাম চাই আমি। বললাম, আইকন আমি বিক্রি করব না। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক এই তবারক হোসেন। আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সে দাম দিতে চাইল এরপর দু'লক্ষ টাকা, তারপর, তিন লক্ষ। তার বক্তব্য,

তার ক্লায়েন্ট নাকি ভীষণ আগ্রহী আইকনটা পাবার জন্য। কারণ আইকনটা এককালে তার পরিবারের সম্পদ ছিল।'

'আপনি কি বললেন এরপর?'

'বললাম, যদি আইকনটা তোমার ক্লায়েন্টের পরিবারের সম্পদ ছিল একথা প্রমাণ করতে পারো তাহলে আমি ভেবে দেখব। প্রমাণ করতে না পারলে তিন কেন তিন চারে বারো লক্ষ টাকাতেও এটা আমি বিক্রি করব না।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'রাশিয়ান ক্লায়েন্টের নাম বলেনি তবারক হোসেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি নাম। কিন্তু তবারক হোসেন বলল, নাম প্রকাশ করা সম্ভব না। অবশ্য নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আসলে পাইনি আমি। তবারক হোসেন চলে যাবার খানিক পর তার ক্লায়েন্ট স্বয়ং গিয়ে হাজির হলো আমার বাড়িতে।'

'তাই নাকি!'

'চাকর এসে খবর দিতে জানিয়ে দিলাম, আমি এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না। কিন্তু রাশিয়ান ভদ্রলোক খবর পাঠালেন, তিনি অপেক্ষা করবেন। অগত্যা, দু'একটা কথায় আইকন বিক্রি করব না জানিয়ে দিয়ে আপদ বিদায় করব ভেবে, দেখা করলাম। ভদ্রলোককে দেখে গলা শুকিয়ে গেল আমার। প্রকাণ্ড শরীর। লাল টকটকে সূর্যের মত মুখ। বগলে ক্রাচ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কথা বললেন আমার সাথে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। বললেন, 'আমার প্রতিনিধি মহাদেব এক নম্বর বোকা, তাই সে টাকার মায়া করে আইকনটা কেনেনি। যাক, তার এই ভুলের জন্য আমি মাসুল দিতে প্রস্তুত। মিসেস খান, আপনি চার লক্ষ টাকায় আইকনটা আমার কাছে বিক্রি করুন।' কথাগুলো বলে রাশিয়ান ভদ্রলোক পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন এবং ব্যাঙ্কের চেক বই বের করলেন।'

'আপনি কি বললেন?'

'সেই একই কথা বললাম, আইকন বিক্রির জন্য কিনিনি। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আরও বেশি দাম চান? আমি বললাম, না, দাম বেশি পেলেও বিক্রি করব না। এটা আমি কিনেছি আমার শো-কেসে সাজিয়ে রাখব বলে। কিন্তু কার কথা কে শোনে! ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে, পুরো পাঁচ লাখই দেব, তবু আইকনটা আপনি আমাকে দিন।'

'কী সাংঘাতিক!'

কামাল ঢোক গিলল, 'একটা আইকন, পাঁচ লাখ টাকা তার দাম!'

মিসেস খান বলল, 'রীতিমত আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটছিল ভদ্রলোকের সাথে আমার। জীবনে অনেক রকম লোকের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব, এমন চেহারা আর চোখে পড়েনি। যাক, ভদ্রলোকের সাত লক্ষ টাকার প্রস্তাবও যখন আমি অগ্রাহ্য করলাম তখন তিনি সেই ধীর গলাতেই বললেন, 'মিসেস খান. আমার হৃদয়

বাঁধা পড়ে গেছে আইকনটার সাথে। আপনার উচিত ওটা আমাকে দিয়ে দেয়া।' আমি বললাম, দুঃখিত আমি। কিন্তু আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক বললেন, 'ভুল করছেন আপনি। পরে হয়তো আফসোস করবেন এই ভুলের জন্য।' আমি বললাম, আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকব। দ্য আইকন ইজ নট ফর সেল। মি. শহীদ, এরপর ভদ্রলোক কি করলেন কল্পনা করতে পারেন?'

'কি করলেন?'

'ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রাগে কাঁপছেন থরথর করে। চোখ দুটো জ্বলছে অঙ্গারের মত। হঠাৎ ক্রাচটা বগল থেকে সরিয়ে এনে উপর দিকে তুললেন, যেন মারবেন আমাকে, তারপর কি মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। ভয়ে আমি নিষ্প্রাণ পুতুলের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ। এরপর···।'

দ্রুত জিজ্ঞেস করল শহীদ, 'আইকনটা বাড়িতে রেখে আসেননি তো মিসেস খান?'

'না, রেখে আসিনি। আপনাকে দেখাব বলে ওটা সাথে করেই নিয়ে এসেছি।'

কোলের উপর থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলল সেটা মিসেস খান। ভিতর থেকে খয়েরী রঙের একটা পার্সেল বের করে বাড়িয়ে দিল শহীদের দিকে।

পার্সেলটা নিয়ে আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। আইকনটা গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করল ও। কয়েকবার হাত উঁচু-নিচু করে জিনিসটার ওজন অনুভব করার চেষ্টা করল।

মিসেস খান বলল, 'আমার প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য এত কথা বললাম, মি. শহীদ। বলুন দেখি, আইকনটা পাবার জন্য রাশিয়ান ভদ্রলোক এমন উন্মাদের মত আচরণ করলেন কেন? জিনিসটা দেখতে সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সাত-লক্ষ টাকা এর দাম হতে পারে না। আমি যে দামে কিনেছি তার একশো ভাগের এক ভাগ দামও এটার জন্য বেশি···।'

কিন্তু শহীদ ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তখন কামালের সাথে।

শহীদ বলছিল, 'কিন্তু তুই যাই বলিস কামাল, নিশ্চিত হওয়া দরকার আমাদের। ফোন করে ওকে বল, আমি এক্ষুণি একবার ওর সাথে দেখা করতে চাই।'

কামাল টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল! মিসেস খান ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার! ওটা তো তবারক হোসেনের ফোন নাম্বার।'

শহীদ হাত তুলে মিসেস খানকে চুপ করতে বলল।

কামাল রিসিভার মুখে ঠেকিয়ে বলছিল, 'আমি তবারক হোসেনের সাথে কথা বলতে চাই।'

পুরো একমিনিট চুপচাপ অপর প্রান্তের বক্তার কথা শুনল কামাল। বিস্ময় ফুটে

উঠল তার চোখেমুখে। রিসিভার নামিয়ে রেখে কামাল শহীদের দিকে তাকাল। বলল, 'বেলা দুটোর সময় তবারক হোসেনের লাশ পাওয়া গেছে তার অফিসে।'

'মারা গেছে তবারক হোসেন?' মিসেস খান বিমূঢ়।

'গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে,' বলল কামাল।

গম্ভীর শহীদ মাথার চুলে দ্রুত আঙুল চালাতে চালাতে পায়চারি করতে শুরু করল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ও বলে উঠল, 'অসহ্য! এর একটা বিহিত না করলেই নয় আর!'

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল সন্দেশ। তার ঠিক পিছনে লেবু। সন্দেশ বলল, 'দা-দা-দা…'

লেবু 'দাদামণি' শব্দটার অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করার চেষ্টা করল, 'ম-ম-ম-ণি…।'

কামাল ধমকে উঠল, 'কি বলতে চাস একজন বল।'

লেবু বলল, 'আ-আ-মরা মা-মার্কে-টে যা-যা-যা…'

সন্দেশ যোগ করল, 'যা-যা-যা-যাচ্ছি! দি-দি-দি…'

কামাল বলল, 'দিদিমণির সাথে মার্কেটে যাচ্ছিস, এই তো?'

লেবু এবং সন্দেশ দু'জনেই বলল, 'হ্যাঁ।'

'যা, ভাগ।'

মিসেস খান হঠাৎ বলল, 'কিন্তু আমি যে বিশ্বাসই করতে পারছি না তবারক হোসেন আত্মহত্যা করেছে।'

কামাল শহীদের দিকে ফিরে বলল, 'ফোন ধরেছিলেন মি. সিম্পসন। তিনি জানালেন তবারক হোসেনের অফিসে একটা গোড়ালিহীন পায়ের জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে…'

শহীদ বলল, 'থাক। আর বলতে হবে না।'

দশ

মিনিট পাঁচেক পর পায়চারি থামিয়ে শহীদ বলল, 'মিসেস খান, আমি আপনার কাছ থেকে এক বা দু'ঘণ্টার জন্য আইকনটা ধার চাইছি। কোন আপত্তি…।'

'আপত্তি? আপত্তি কেন থাকবে? আমি রহস্যের মীমাংসার জন্যে এসেছি, মি. শহীদ।'

শহীদ কামালের দিকে ফিরল, 'কামাল, তুই মিসেস খানকে পৌঁছে দিবি। আর, মিসেস খান, কামাল আজকের রাতটা আপনার বাড়িতে থাকবে, অ্যাজ এ গার্ড…।'

'গার্ড? কেন, কিছু ঘটতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন নাকি?'

শহীদ বলল, 'ভয় পাচ্ছি না মানে? মিসেস খান, আইকনটা কেনার পর থেকে আপনি প্রতি মুহূর্তে বিপদের মধ্যে রয়েছেন। যে-কোন মুহূর্তে আপনার জীবনের ওপর হামলা হতে পারে।'

মিসেস খান বেশ শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'মি. শহীদ, আপনি আমাকে মিছেমিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন!'

'মোটেই না। ওই যে, টেলিফোন রয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি আপনার বাড়িতে ফোন করে জেনে নিন আপনার অনুপস্থিতিতে সেখানে কিছু ঘটেছে কিনা।'

শহীদকে সিরিয়াস দেখে মিসেস খানের মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে।

ফোনে কথা বলার সময় কালো হয়ে গেল মিসেস খানের মুখের চেহারা। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে একটু পরই।

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কি খবর?'

মিসেস খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। আমার বেডরুমের জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়ে গেছে কেউ। স্টাডি রুমের আলমারির কাঁচ ভেঙে ফেলেছে। ড্রয়িংরুমের শো-কেসও কারা যেন...'

শহীদ বলল, 'মিসেস খান, আপনাকে আমি সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। যে-কোন মুহূর্তে আপনার প্রাণের ওপর হামলা আসতে পারে। আশা করি আমার কথা আর অবিশ্বাস করবেন না।'

'মি. শহীদ, কে এই লোক, আমার পিছনে কেন সে...'

কামাল জানালার ধার থেকে আচমকা শস্‌স্‌স্‌স্‌ করে শব্দ তুলল ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে।

চুপ করে গেল ওরা।

কামাল ফিস্‌ফিস করে বলল জানালা দিয়ে নিচের দিকে চোখ রেখে, 'শহীদ, মাতবর বাড়ির দিকে নজর রেখেছে।'

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। উঁকি দিয়ে দেখল সত্যি একজন লোককে দেখা যাচ্ছে নিচের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে। ছদ্মবেশে আছে, কিন্তু লোকটা যে প্রফেসর ওয়াইয়ের ডান হাত কুখ্যাত মাতবর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'দাঁড়া, আমি আসছি।' কথাটা বলে ড্রয়িংরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল শহীদ।

বাড়িটা দুই রাস্তার মোড়ে অবস্থিত এবং শহীদের বেডরুমের জানালা দিয়ে নিচের সাইড রোডটা দেখা যায়। বেডরুমে ঢুকল শহীদ। পর্দা সরিয়ে জানালা পথে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাতেই ফুটপাথের উপর আর একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর লোকটাকে চিনতে পারল শহীদ। লোকটা মটরসাইকেল চালাতে ওস্তাদ। নাম, জর্মন শেখ। প্রফেসর

ওয়াইয়ের বাঁ হাত। রাস্তার একধারে প্রকাণ্ড একটা ঝকঝকে মটরসাইকেলও দেখল শহীদ।

রাস্তার শেষ প্রান্তে আর একজন লোককে দেখল শহীদ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপন মনে বাদাম বা ছোলা ভাজা জাতীয় কিছু খাচ্ছে। লোকটার মাথায় অস্বাভাবিক লম্বা একটা হ্যাট। লোকটা যে ডি. কস্টা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'সাইডরোডেও প্রফেসর ওয়াইয়ের লোক আছে,' ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে বলল শহীদ। তাকাল মিসেস খানের দিকে, 'মিসেস খান, আপনি আজ ডিনারটা আমাদের সাথেই খাবেন। আপনার বান্ধবী মার্কেটে গেছে সেই কথা ভেবেই।'

মিসেস খান বলল, 'কিন্তু আপনি যে বললেন আপনার সহকারী মি. কামাল আহমেদ আমার বাড়িতে থাকবেন আজ রাতে?'

ফোনের রিসিভার তুলে নিতে নিতে শহীদ বলল, 'সাইডডোর বা মেইনডোর—কোন পথেই বাইরে বেরুবার উপায় নেই।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করল শহীদ, 'হ্যালো? আমি মি. আলাজিভটাকরাভস্কির সাথে কথা বলতে চাই।'

খানিক পর অপর প্রান্তে বাঞ্ছিত ভদ্রলোক এলেন। শহীদ বলল, 'কেমন আছেন, প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি? শহীদ খান বলছি, ইয়েস। হাতে খুব কাজ নাকি? একবার আসুন না আমার বাড়িতে—হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজন···তাই নাকি! ওয়াইফের অসুখ? ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়েছে? দুঃখিত···ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমাকেই যেতে হবে আপনার কাছে···হ্যাঁ, এই ধরুন বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছুব আমি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ ক্রেডলে।

'কোথায় যাবেন আপনি?'

শহীদ বলল, 'আপনার আইকনটা একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনি। কামাল, মিসেস খানকে দেখবি তুই! কাজ সেরেই ফিরব আমি। ছাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।'

মহামূল্যবান আইকনটা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল শহীদ ড্রয়িংরুম থেকে।

সন্ধ্যা নেমেছে খানিক আগে।

অন্দর মহলে ঢুকল কামাল মিসেস খানকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে। একটু পরই ফিরল ও। বলল, 'কী বিদঘুটে ব্যাপার বলুন তো, মহুয়াদি সাথে করে চাকর-বাকর সবাইকে নিয়ে গেছে মার্কেটে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেছে সাইডডোর।'

মিসেস খান কথা বলল না, কি যেন ভাবছে।

'কি ভাবছেন?'

'বেচারা তবারকের কথা আমি ভুলতে পারছি না। গতকাল তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আসলে লোক হিসেবে খারাপ ছিল না সে। দুঃখ লাগছে বড় ওর জন্য। কেন সে আত্মহত্যা করল?'

কামাল বলল, 'আত্মহত্যা সে স্বেচ্ছায় করেনি, মিসেস্ খান। হয় সে খুন হয়েছে, নয়ত, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।'

'আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে মানে!'

'কেউ যদি আপনার বুকের উপর পিস্তল ধরে বলে এই মুহূর্তে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস পরাও, আপনি কি করবেন?'

'কিন্তু···কে তবারককে এ কথা বলল? কেন বলল? কি তার অপরাধ?'

কামাল বলল, 'আমাদের দৃষ্টিতে হয়তো সে কোন অপরাধ করেনি। কিন্তু প্রফেসর ওয়াইয়ের চোখে সে অপরাধী। আমার ধারণা প্রফেসর ওয়াই তাকে আইকনটা যে ভাবে হোক আপনার কাছ থেকে আদায় করার হুকুম দিয়েছিল। হুকুম পালন হয়নি বলে শাস্তি দিয়েছে।'

'কে এই প্রফেসর ওয়াই? লোকটা সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে, মি. কামাল।'

কামাল বলতে শুরু করল প্রফেসর ওয়াই সম্পর্কে।

শুনতে শুনতে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল মিসেস খানের চোখে মুখে। বলল, 'কি বলছেন এসব আপনি? একজন উন্মাদের ভয়ে সবাই কাহিল হয়ে পড়েছেন? দেশে কি পুলিস নেই? আইন নেই? আপনারা থাকতে···'

কামালের আর উত্তর দেয়া হলো না। তার মুখ খোলার আগেই ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

'হ্যালো?' অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল ভারি কণ্ঠস্বর, 'কামাল নাকি?'

কামাল চমকে উঠল, 'কুয়াশা!'

অপর প্রান্ত থেকে আবার সেই ভারি গলা বলল, 'শহীদ কোথায়?'

'একটু আগে বিশেষ দরকারে বাইরে গেছে।'

অপরপ্রান্ত থেকে ভারি কণ্ঠস্বর বলল, 'কামাল, শহীদ যখন নেই, তুমিই একবার চলে এসো আমার মগবাজারের বাগান বাড়িতে। বিশেষ জরুরী একটা আলাপ আছে।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কামালকে চিন্তিত দেখে মিসেস খান জানতে চাইলেন, 'কে ফোন করেছিলেন? চিন্তায় পড়ে গেলেন মনে হচ্ছে?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ। বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে বাইরে যেতে হবে আমাকে এখুনি। ভাবছি, আপনাকে একা রেখে যাওয়া উচিত হবে কিনা। মহুয়াদিও ফিরল না এখনও···।'

হেসে ফেলল মিসেস খান। বলল, 'একা থাকতে ভয় পাব ভাবছেন? মি. কামাল, আমি আমেরিকায় বহু বছর কাটিয়েছি। একা আমি সমুদ্রে ছিলাম তিন দিন, ভেলার ওপর। আরিজোনা মরুভূমিতে দু'বার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি···ভয় বলে কোন জিনিসের সাথে আমি পরিচিত নই। আপনি প্রফেসর ওয়াইয়ের যে গল্প আমাকে শোনালেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি, ভয় পাইনি। আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে একা রেখে বাইরে যেতে পারেন। বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু ভয় পাব না।'

কামালের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'সত্যি তো? নাকি লজ্জায় স্বীকার করছেন না···?'

খিলখিল করে হেসে উঠল মিসেস খান। বলল, 'হাসালেন দেখছি। ভয় পেলে স্বীকার করতে লজ্জা কিসের?'

কামাল বলল, 'তবে আমি যাই। কাজ সেরেই এসে পড়ব। এক কাজ করুন, আমি বেরিয়ে গেলেই দরজাটা বন্ধ করে দিন ভিতর থেকে।'

'ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি মনে করে মিসেস খান জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দাটা একটু ফাঁক করে নিচের দিকে তাকাল সে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা এখনও।

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মিসেস খান। তারপর হঠাৎ দেখল, লোকটা রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটছে।

দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল লোকটা। মিসেস খান বুঝতে পারল লোকটা কামালকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে সোফায় বসল মিসেস খান। মনটাকে কেন যেন স্থির রাখতে পারছে না সে। সকালবেলার ঘটনাটা মনে পড়ছে। প্রকাণ্ডদেহী রাশিয়ান লোকটাই তাহলে প্রফেসর ওয়াই। বাপ্‌রে, কী ভয়ঙ্কর চেহারা! চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।

মনে পড়ল, কারা যেন তার বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়ে গেছে। আবার কিছু ঘটেনি তো বাড়িতে? মিসেস খান হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

কি ব্যাপার! শব্দ নেই কেন রিসিভারে!

ক্রেডলে রিসিভার রেখে চিন্তা করতে লাগল মিসেস খান। কখন খারাপ হলো ফোনটা? কলিংবেলের বোতামের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল তার। মহুয়া কি ফিরেছে? বোতামে চাপ দিল সে।

একি! শব্দ নেই কোন। তারমানে কলিংবেলও কাজ করছে না···

পাশের রুমে আর একটা ফোন আছে, মনে পড়ল। দ্রুত পায়ে পাশের রুমে

গেল সে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল—সর্বনাশ! এটাও ডেড!

ভয়ের একটা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে মিসেস খানের। দ্রুত পায়ে ড্রয়িংরুমে ফিরে এল সে।

পিছন দিকে শব্দ হলো দরজা খোলার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গিয়ে ভাবল মিসেস খান, যাক, বাঁচা গেল, মহুয়া ফিরেছে শেষ পর্যন্ত···

ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস খান দেখল দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাণ্ডদেহী প্রফেসর ওয়াই।

তীক্ষ্ণ এক চিৎকারের জন্যে মুখ হাঁ করল মিসেস খান।

এগারো

অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা। হাঁ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে যাচ্ছিল মিসেস খান। কিন্তু তিন গজ দূর থেকে গরিলাসদৃশ প্রফেসর ওয়াই বিদ্যুৎবেগে রুমের ভিতর প্রবেশ করলেন। অমন ভারি দেহ নিয়ে চোখের পলকে তিনগজ দূরত্ব অতিক্রম করা এককথায় বিস্ময়কর হলেও পরমুহূর্তে দেখা গেল প্রফেসর ওয়াই মিসেস খানের মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার বের হবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

খ্যাপা দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন প্রফেসর। সরে গেলেন ধীরে ধীরে এক পাশে। গর্জে উঠলেন ভারি বাজখাঁই গলায়, 'মিসেস খান, হুঁশিয়ার! চেঁচালে কোন লাভ হবে না তোমার। সাবধান করে দিয়েছিলাম তোমাকে, মনে আছে তো? এবার দাও, ছিনিয়ে নিতে এসেছি আমি আইকনটা। সাত লক্ষ টাকা দাম দিতে চেয়েছিলাম, দাওনি। এখন একটা নয়া পয়সাও পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে। আইকনটা কোথায়?'

'সেটা···সেটা আমি···বাড়িতে রেখে এসেছি!'

বগলের ক্রাচ তুললেন প্রফেসর সবেগে মিসেস খানের মাথার উপর। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলেছ কি গুঁড়িয়ে দেব মাথা! টিকটিকি শহীদ খানের কাছে নিয়ে এসেছ তুমি আইকনটা। আমার সাথে চালাকি করে কেউ কোন দিন পার পায়নি, মিসেস খান। তোমার বাড়ির এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সন্ধান চালানো হয়নি। নেই সেখানে আইকন। আমি শেষবার জানতে চাই···কোথায় সেটা?'

মিসেস খান ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবছে।

ক্রাচটা নামিয়ে নিলেন প্রফেসর। ঝট্ করে ধরলেন লোমশ হাতে মিসেস খানের একটা হাত, 'বলবে না? বেশ! তাহলে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও···'

'প্রফেসর ওয়াই, মিসেস খানের হাতটা ছেড়ে দিন। ব্যথা পাচ্ছেন ভদ্রমহিলা।'

বিকট শব্দে গর্জে উঠে প্রফেসর ওয়াই সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন রুমের তৃতীয়

দরজার দিকে। চোখের পলকে বের করে ফেলেছেন পকেট থেকে বিরাটাকার অটোমেটিক রিভলভারটা।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, শহীদ খান!' হিংস্র হয়ে উঠেছেন প্রফেসর ওয়াই।

শহীদ বলল, 'কিন্তু আমার হাতের পার্সেলটা ফেলে দিলে ভেঙে যাবে যে···।'

'গুলি করব আমি। তোলো বলছি,মাথার ওপর হাত!'

মাথার উপর হাত তুলল শহীদ। মিসেস খানের দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'দুঃখিত, মিসেস খান। কামাল যদি এখন থাকত এখানে···'

'জর্মন শেখ!' প্রফেসর হাঁক ছাড়লেন। বেডরুম থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল সাথে সাথে। জর্মন শেখ এবং মাতবর।

প্রফেসর ওয়াই শহীদের দিকে তাকালেন। বেশ একটু শান্ত দেখাচ্ছে এখন তাকে, 'কামাল, না? সে কুয়াশার জরুরী টেলিফোন পেয়ে বেরিয়ে গেছে আধঘণ্টা আগে, তাই না মিসেস খান?'

কথাটা বলে চেয়ার টেবিল কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে শুরু করলেন প্রফেসর ওয়াই।

শহীদ মিসেস খানের উদ্দেশ্যে বলছিল, 'আমি একা, ওরা তিনজন—করার কিছু নেই, মিসেস খান। স্বপ্নেও ভাবিনি এরা এখানে ঢুকতে সাহস পাবে। আগে থেকে জানলে জিনিসটা নিয়ে ঢুকতাম না এখানে···।'

'জর্মন শেখ, টিকটিকির হাতের প্যাকেটটা আনো!' প্রফেসর ওয়াই হুকুম করলেন। বিজয়ীর হাসি তাঁর সারা মুখে। জর্মন শেখ প্যাকেটটা শহীদের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে প্রফেসর ওয়াইয়ের হাতে দিল।

কাগজের মোড়ক খুলে আইকনটা বের করলেন প্রফেসর ওয়াই। নেড়েচেড়ে দেখলেন সেটা খানিকক্ষণ। আবার উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। আইকনটা ওভারকোটের পকেটে ভরে রাখলেন সযত্নে।

শহীদের দিকে তাকালেন প্রফেসর, 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার স্বভাব আমার নয়। এক-একবারে এক-একটা কাজ করি আমি। তোমাকে আছাড় দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলার সাধ ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে পূরণ করতে পারি আমি। কি, পারি না? কিন্তু, না, তোমাকে এখন খতম করব না। জানি, আমার কেশ স্পর্শ করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। পারবে না জেনেও অকারণে আমার সাথে লাগতে আসো—লজ্জা নেই তোমাদের। এখন ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যতে ছাড়ব না, জেনো। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। তোমরা আমাকে ধরার জন্যে মাঝে মধ্যে এমন তড়াক তড়াক করে লাফাও, এমন ছুটোছুটি দৌড়ো-দৌড়ি করো—বেশ মজা লাগে দেখতে। তোমরা না থাকলে কোত্থেকে পেতাম এমন মজা? যাক, সময় নেই আমার। কাজ হাসিল হয়েছে, চললাম।'

ড্রয়িংরুম থেকে করিডরে বেরিয়ে গেল প্রফেসর ওয়াই। পিছু পিছু বেরিয়ে গেল তার দুই সহকারী। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই মিসেস খান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মি. শহীদ···আপনি···আপনি একটা কাপুরুষ! আমি ভেবেছিলাম আপনি সত্যিকার পুরুষমানুষ একজন, সাহসী! আমি ধারণাই করিনি এতটুকু বাধা না দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আইকনটা আপনি একটা ডাকাতকে দিয়ে দেবেন···।'

শহীদ মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, 'পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে, মিসেস খান। আমি সব ব্যাখ্যা করব।'

'কে শুনতে চায় আপনার ব্যাখ্যা? লোকটা আমার আইকন নিয়ে চলে গেল—এর আবার ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা শুনে আমার লাভই বা কি হবে?'

শহীদ ড্রয়িংরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। রহস্যময় হাসিটা লেগে আছে তখনও ওর ঠোঁটের কোণে।

খানিক পরেই ফিরে এল ও। বলল, 'প্রফেসর ওয়াই দলবল নিয়ে কেটে পড়েছেন। এবার সব কথা বলা যায় আপনাকে। তার আগে এক ভদ্রলোকের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।' কথাগুলো বলে শহীদ রুমের তৃতীয় দরজার দিকে তাকাল, 'মি. আলাজিভটাকরাভস্কি!'

ছোটখাট একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন।

শহীদ বলল, 'আসুন, প্রফেসর। মিসেস খান, ইনি প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি। রাশান এমব্যাসীতে চাকরি করেন। আমার বন্ধু।'

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল ঝড়ের বেগে কামাল, 'মিসেস খান, কোন বিপদ ঘটেনি তো?'

মুচকি হেসে শহীদ বলল, 'কি রে, কেন ডেকেছিল কুয়াশা?'

কামাল চেঁচিয়ে উঠল, 'বোকা বানিয়েছে প্রফেসর ওয়াই আমাকে। বুঝতেই পারিনি। কুয়াশার সাথে দেখা হয়নি, ডি. কস্টা বলল কুয়াশা ঢাকায় নেই···। তা, কি ঘটেছে বল্ তো এখানে?'

মিসেস খান বলল, 'কি আবার ঘটবে! মি. শহীদ কাপুরুষের মত আমার আইকনটা সেই ডাকাতের হাতে তুলে দিয়েছেন!'

'হোয়াট! প্রফেসর ওয়াই এসেছিল এখানে?'

মিসেস খান বলল, 'এসেছিল এবং আইকনটা নিয়ে গেছে। মি. শহীদ এতটুকু বাধা দেননি তাকে।'

'শহীদ···!' কামাল হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। চোখ দুটো কপালে উঠল তার। মিসেস খান অন্যদিকে চেয়ে আছেন।

কামাল বলে উঠল, 'কে বলল প্রফেসর ওয়াই আইকনটা নিয়ে গেছেন? আমি তো দেখতে পাচ্ছি শহীদের হাতে রয়েছে সেটা।'

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল মিসেস খান। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে সে দেখল শহীদ মিটি মিটি হাসছে। ওর হাতে রয়েছে আইকনটা।

'একি!' মিসেস খান ঢোক গিলল।

শহীদ প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কির দিকে ফিরল, 'প্রফেসর আপনি এবার ব্যাখ্যা করে আইকনটা সম্পর্কে বলুন, প্লীজ।'

শহীদের হাত থেকে আইকনটা নিয়ে প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি বলতে শুরু করলেন মিসেস খানের দিকে তাকিয়ে, 'ম্যাডাম, আপনি সত্যি ভাগ্যবতী। রাশিয়ান চার্চের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি আজ আপনার হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে। এই আইকনটা সাধারণ আর সব আইকনের মত দেখতে হলেও আসলে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটি অন্য সবগুলোর চেয়ে লক্ষকোটি গুণ বেশি মূল্যবান। অত্যন্ত পুরানো এই আইকন। এভানজেলিস্ট স্বয়ং এতে রঙ লাগিয়েছিলেন।'

প্রফেসর সিগার ধর বার জন্য বিরতি নিলেন।

'মি. শহীদ প্রফেসর ওয়াইকে চেনেন। ওঁর সন্দেহ, প্রফেসর ওয়াই ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কারণে আইকনটা হস্তগত করতে চাইছেন না। এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে। আমার কাছে তিনি নিয়ে যান আইকনটা পরীক্ষা করবার জন্য। খুবই সাধারণ আইকন এটা। এটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটুকু তা বোঝার মত জ্ঞান সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, আমারই নেই। আমি আইকনটা নিয়ে গিয়ে দেখাই ভ্লাদিমির তুখোমভকে। আপনারা সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন হয়তো, তুখোমভ বর্তমানে বাংলাদেশে ভ্রমণ করছেন। তিনি আইকনটা পরীক্ষা করে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।'

প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি হাসলেন। তারপর বললেন, 'আইকনটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে জেনেও আমার বন্ধু মি. শহীদ খান সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অগত্যা আইকনটা আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার পরীক্ষা করতে বসলাম। এবার পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম···।'

প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি আইকনটা উল্টো করে ধরে সবাইকে দেখালেন পিছন দিকটা। দেখা গেল নিচের কাঠের সাথে আটকানো চারটে স্ক্রু। স্ক্রু চারটে খুলতেই কাঠের ঢাকনিটা আলগা হয়ে গেল। সেটা সরিয়ে ফেললেন প্রফেসর আলাজিভটাকরাভস্কি। এরপর দেখা গেল চারটে গভীর গর্তে চারটে টিউব ঢোকানো রয়েছে। একটা টিউবের গায়ে জড়ানো অতি পুরাতন একটুকরো কাগজ।

টিউবগুলো ধাতব পদার্থের। একটা একটা করে খোপ থেকে বের করে সেগুলো রাখা হলো টেবিলের উপর।

'কি আছে টিউবগুলোয়?'

সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল শহীদ, 'রেডিয়াম।'

কারও মুখে কথা ফুটল না। বোকার মত চেয়ে আছে মিসেস খান শহীদের

দিকে। কামাল হতভম্ব।

শহীদ বলে উঠল, 'প্রফেসর টাকরাভস্কি চিঠিটা অনুবাদ করে বাংলায় পড়ুন আপনি।'

প্রফেসর পড়তে শুরু করলেনঃ

'আই, প্রফেসর চেগেরভ, প্রফেসর অব কেমিস্ট্রি ইন দ্য ইউনিভার্সিটি অব মস্কো, বীইং ইন ইমিনেন্ট ডেঞ্জার অভ অ্যারেস্ট বাই দ্য এক্সট্রা অর্ডিনারি কমিশন অব সোভিয়েট গভর্নমেন্ট হ্যাভ কনসিলড ফর সেফ কাস্টডি ইন দ্য ব্লেসেড আইকন অব আওয়ার লেডি অফ স্পোলেনস্ক ফোর গ্রামস অভ রেডিয়াম, প্রপার্টি অভ দ্য মস্কো কেমিক্যাল ইন্সটিটিউট, হুইচ আই টেক উইথ মি ইন মাই ফ্লাইট টু সেভ ফর সায়েন্স।'

কামাল আঁতকে উঠে বলল, 'কী সাংঘাতিক! চার গ্রাম রেডিয়াম—মাথা ঘুরছে আমার হিসেব করতে গিয়ে! চলতি বাজারদর অনুযায়ী চার গ্রাম রেডিয়ামের দাম কমপক্ষে আড়াই লক্ষ ব্রিটিশ পাউণ্ড···। প্রফেসর ওয়াই সাধে কি এর পিছনে ছুটছিলেন!'

মিসেস খান ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'কিন্তু প্রফেসর ওয়াই যে আইকনটা নিয়ে গেল···?'

উত্তর দিলেন প্রফেসর টাকরাভস্কি, 'ম্যাডাম, একটি কথা বোধহয় আপনারা জানেন না। কথাটা হলো এই যে আজও রাশিয়ায় আইকনের কদর আছে। এর পবিত্রতা রক্ষা করি আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মতই। রাশিয়ার প্রায় সব বাড়িতে এবং গির্জায় একাধিক আইকন পাবেনই আপনি। উন্মাদ প্রফেসর ওয়াই যেটা নিয়ে গেলেন সেটা আসলে আমার বাড়ির আইকন, শহীদ খান ওটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন।'

শহীদ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওটা আপনার বাড়িতে রেখে আসব গোপনে, মিসেস খান। প্রফেসর ওয়াই আবার আইকনের খোঁজে আপনার বাড়িতে গেলে ওটা পাবে এবং আসল আইকন মনে করে নিয়ে যাবে সাথে করে—এই রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। কিন্তু ছাদ থেকে নিচে নেমে ড্রয়িংরুমে ঢুকতে গিয়ে শুনি প্রফেসর ওয়াই কথা বলছেন আপনার সাথে। দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না···।'

মিসেস খান বলল, 'বুঝেছি। মি. টাকরাভস্কির আইকনটা নিয়ে গেছে প্রফেসর ওয়াই। মি. শহীদ, আমি দুঃখিত! অনেক অপ্রীতিকর কথা বলেছি না বুঝে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!

শহীদ হাসল। বলল, 'ওসব কথা ছাড়ুন। আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছিল বলুন তো?'

সবাই হেসে উঠল একসাথে।

শহীদ বলল, 'পাগলা প্রফেসর ওয়াই কিন্তু আইকনটা পরীক্ষা করে ভয়ানক খেপে যাবে। কারণ…'

'কারণ?'

শহীদ হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, 'নকল আইকনের পিছনটা খুলে আমি এক টুকরো কাগজ পুরে দিয়েছি ভিতরে। তাতে প্রফেসর ওয়াইয়ের উদ্দেশ্যে হাস্যরসাত্মক কথা লেখা আছে দু'একটা।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সবাই। হাসি থামতে কামাল বলল, 'আচ্ছা, চিঠির লেখক এই প্রফেসর চেগেরভ কে? লোকটা বিপ্লবের বিরোধী ছিল বোঝা যাচ্ছে…।'

প্রফেসর, টাকরাভস্কি বললেন, 'প্রফেসর চেগেরভ ছিল তখনকার মস্কোর আতঙ্ক। পণ্ডিত এবং প্রতিভাবান ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতিটা ছিল ক্রিমিন্যালের মত। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করত সে। শোনা যায়, মানুষকে দীর্ঘজীবী করার এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বহু নিরীহ লোককে হত্যা করে সে…।'

মিসেস খান বলল, 'রেডিয়ামসহ আইকনটা বাংলাদেশে এল কেমন করে?'

শহীদ বলল, 'সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে।'

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভিতরে মহুয়া। ফিসফিস করে বলল সে, 'তোমরা এখানে গল্প করছ এখনও! এদিকে এসো সবাই, দেখো কি কাণ্ড হচ্ছে!'

'কি কাণ্ড হচ্ছে!' উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত কামাল।

'আস্তে! সবাই পা টিপে টিপে এসো আমার সাথে। খুনোখুনি কাণ্ড…।'

সবাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল মহুয়ার পিছু পিছু ড্রয়িংরুম থেকে। রয়ে গেলেন শুধু প্রফেসর টাকরাভস্কি। আইকনের নিচের খোলে রেডিয়ামের টিউব চারটে সযত্নে ঢুকিয়ে রাখছেন তিনি।

পা টিপে টিপে ওরা সবাই কিচেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিচেনের জানালায় গিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সবাই দেখল সন্দেশ এবং লেবু সশস্ত্র অবস্থায় শত্রুকে পাহারা দিচ্ছে।

রুমের দুটো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সন্দেশ এবং লেবু। সন্দেশের হাতে ধারাল একটা দা, লেবুর হাতে মোটা একটা লোহার রড। কিচেনরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাট পরা স্যানন ডি. কস্টা। বক্তৃতার ভঙ্গিতে কিছু বলছে সে।

লেবু বলে উঠল, 'টাকা মে-মে-মে…।'

সন্দেশ বলল, 'মেরে বো-বো-বো…।'

লেবু বলল, 'বোকা বানি য়ে-য়ে-য়ে…।'

'বানিয়েছিলে আমা-মা-দেরকে…। আজ তো…তো—'

লেবু বলল, 'তোমার রক্ষা নে-নে-নেই!'

ডি. কস্টা বলছে, 'এগেন অ্যাণ্ড এগেন এক কঠা টোমাডেরকে বলিটে ভাল লাগিটেছে না হামার। টোমাডের বস হামার ফ্রেণ্ড। বসের ফ্রেণ্ডকে টোমরা ইনসাল্ট করিটে পারো না। টাছাড়া, টোমরা হানড্রেড টাইমস্ ট্রাই করিলেও হামার কোন ক্ষটি করিটে পারিবে না। হামি মি. কুয়াশারও ফ্রেণ্ড। ইচ্ছা করিলেই টোমাডেরকে কারাটের কোপ মারিয়া সেন্সলেস করিয়া ডিটে পারি···।'

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠল কামাল।

শহীদ বলল, 'এই কাণ্ড দেখবার জন্য ডেকে আনলে তুমি আমাদেরকে?'

মহুয়া হাসতে লাগল।

মিসেস খান বলে উঠল, 'কে ওই হ্যাট পরা লোকটা? গতকাল নীলাম ডাকার সময় ওই তো ছিল আমার দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী···।'

শহীদ বলল, 'ওর নাম স্যানন ডি. কস্টা। কুয়াশার লোক।'

'কুয়াশা কে?'

শহীদ বলল, 'কেন, আপনার বান্ধবী কুয়াশার কথা কখনও বলেনি আপনাকে।'

'না তো!'

মহুয়া বলল, 'দাদার কথা আমি সচরাচর কাউকে বলি না। কে কি মনে করে।'

'তোর দাদার নাম কুয়াশা?'

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

শহীদ বলল, 'তার কথা আর একদিন শুনবেন, মিসেস খান। একদিনে বেশি লোকের কথা শুনে হজম করতে পারবেন না।'

ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়াল শহীদ, মিসেস খান এবং মহুয়া। কামাল ডি. কস্টা বনাম সন্দেশ ও লেবুর ঝগড়ার মীমাংসা করে দিতে ব্যস্ত কিচেনে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকেই শহীদ আঁতকে উঠল, 'প্রফেসর 'টাকরাভস্কি গেলেন কোথায়?'

রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে মিসেস খান কাউকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেই!'

মহুয়া বলল, 'এই তো ভদ্রলোককে দেখে গেলাম···।'

মিসেস খান বলে উঠল, 'দরজাটা খোলা···মি. শহীদ, আপনার বন্ধু আমার আইকনটা নিয়ে পালিয়ে যাননি তো?'

শহীদ হঠাৎ লাফ মারল সোফাগুলোর দিকে।

দেখা গেল সোফার পিছনে প্রফেসর 'টাকরাভস্কির অজ্ঞান দেহটা পড়ে রয়েছে।

'মহুয়া, ডাক্তারকে খবর দাও···' শহীদ দ্রুত বলল।

মহুয়া ফোনের দিকে এগোতে মিসেস খান বলে উঠল, 'ফোনের লাইন কাটা।'

'কামালকে ডাকছি আমি।' মহুয়া ছুটে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে।

শহীদ পাল্‌স দেখল প্রফেসর 'টাকরাভস্কির। ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্ঞান হারিয়েছেন প্রফেসর ক্লোরোফর্মের প্রভাবে। মিষ্টি গন্ধটা চিনতে ভুল হয়নি শহীদের।

হঠাৎ টেবিলের উপর নজর পড়ল শহীদের। আইকনটা কোথায়?

টেবিলে নেই আইকন। টেবিলের উপর ওটা কি, পেপার ওয়েট চাপা দেয়া একটুকরো কাগজ না।

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল শহীদ। পেপার ওয়েট সরিয়ে তুলে নিল কাগজের টুকরোটা।

একটা চিঠি!

হাতের লেখাটা চিনতে পারল শহীদ প্রথম দর্শনেই।

চিঠিটা হুবহু এইরকম ঃ

প্রিয় শহীদ,

কুশল জেনো। ডি. কস্টা জিনিসের গুরুত্ব বোঝে না তাই আইকনটা গতকাল হাতছাড়া করে সে। যে-কোন মূল্যে ওটা সংগ্রহ করতে বলছিলাম ওকে। যাক, মিসেস খান প্রচুর টাকার মালিক, এইরকম বহু আইকন সে কিনতে পারবে। সে যদি গ্রহণ করতে সম্মত হয় তাহলে আমি একজোড়া আইকন পাঠিয়ে দেব তার বাড়িতে। এটা তার কোন কাজে লাগবে না বলে নিয়ে যাচ্ছি।

ইতি
কুয়াশা।

কুয়াশা ৪৫

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৭৫

এক

বহুদূর থেকে আসছে শব্দটা। দ্রিম-দ্রিম, ডুম-ডাম—দ্রাম—দ্রিম-দ্রিম, ডুম ডাম—দ্রাম—দ্রিম দ্রিম···। কান পাতলে মনে হয় দূরে কোথাও মেঘ ডাকছে। উপর দিকে বৃথাই তাকাল আবিদ। ঘন সন্নিবেশিত মহীরুহের শাখাপ্রশাখা আর পাতায় ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ। সূর্য কিরণ এখানে প্রবেশের অনুমতি পায় না। প্রবেশ নিষেধ এখানে বহিরাগতদের। সে বহিরাগত যেই হোক—মানুষ বা পশু, জংলী ভূত বা হিংস্র সিংহ—এখানে একবার পথ ভুলেও যদি কেউ প্রবেশ করে তবে তার আর রক্ষে নেই। আবিদের গরিলাবাহিনী নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। শেষ শত্রুটির হাত পা বিচ্ছিন্ন করে হৃৎপিণ্ড বের করে আনবে বুকের ভিতর থেকে, তবে শান্ত হবে তারা।

বিচিত্র এই দেশ। অদ্ভুত এখানকার পরিবেশ। আবিদ এই মহাদেশের ইংরেজি নামের ছয়টি অক্ষরের ছয়টি অর্থ আবিষ্কার করেছে। A দিয়ে আতঙ্ক, F দিয়ে ফাঁদ, R দিয়ে রক্ত, I দিয়ে ইতর, C দিয়ে কালো এবং সর্বশেষ অক্ষর A দিয়ে হয় অগম্য, অন্ধকার, অশনি, অমঙ্গল, আশ্চর্য···।

সত্যি, আতঙ্কের দেশ আফ্রিকা। প্রতি পদে এখানে ফাঁদ। প্রতি মুহূর্তে এই গহীন দুর্গম অরণ্যে ঝরছে লাল তাজা রক্ত। সভ্য দুনিয়ার চোখে এখানকার কালো অসভ্যরা ইতর প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ সহজ কথা নয়। অন্ধকারে অমঙ্গল আছে ওত পেতে, এতটুকু আভাস না দিয়ে ঘাড়ে পড়বে লাফ দিয়ে। সিংহ যদি তোমায় দেখে, বাঘ যদি তোমায় পায়, অসভ্যদের মধ্যে যদি তুমি গিয়ে পড়ো—ধরে নিতে পারো তুমি নেই, মারা গেছ!

থমথমে হয়ে ওঠে আবিদের মুখ। শব্দটা এতক্ষণে পরিচিত মনে হচ্ছে তার। জংলীদের কাফেলা! প্রতি বছরের মত এবছরও তাহলে জংলীরা আসছে।

রহস্যপুরীতে প্রতি বছর যাচ্ছে একটা করে জংলীদের কাফেলা। হাজার, দু'হাজার জংলী ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে রহস্যপুরীর দিকে প্রতি বছরই যায়। রহস্যপুরীতে আবিদও গেছে দু'বার। না, ভিতরে ঢোকেনি সে। ভিতরে ঢুকলে বেঁচে ফিরে আসতে হত না

তাকে। জংলীরা যায়, ফিরেও আসে। কিন্তু সভ্য মানুষরা গেলে ফেরে না।

কি আছে দক্ষিণ-পশ্চিমের এই রহস্যপুরীতে তা আজও জানতে পারেনি আবিদ। জংলীরা দলবদ্ধ ভাবে যায়। সাথে থাকে বন্দিনী নারী, খাঁচার ভিতর বাঘ, ভালুক, হরিণ, বুনো ছাগল, ঘোড়া, মোষ, শূকর। প্রায় প্রত্যেক জংলীর সাথে থাকে সের-দু'সের করে হলুদ ধাতব পদার্থ—স্বর্ণ। গোল গোল সোনার ভারি অলঙ্কার জংলীদের পায়ে গলায় শোভা পায়। এইসব অসভ্যরা বহু দূরের কোন গহীন জঙ্গলে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে বছর বছর ধরে তারা যত স্বর্ণ সংগ্রহ করে, তার প্রায় সবটুকু নিয়ে আসে রহস্যপুরীর জন্য। কিন্তু ফেরার সময় ফেরে তারা শূন্য হাতে।

মাইল তিরিশেক হবে এখান থেকে রহস্যপুরী। জংলীদের একটা কাফেলাকে অনুসরণ করে প্রথমবার গিয়েছিল আবিদ। সাথে ছিল লিজা এবং গরিলাবাহিনী।

গহীন জঙ্গলের পর একটা মস্ত মাঠ। মাঠে নামেনি ওরা। জঙ্গলের ভিতর থেকে ওরা দেখে মাঠের অপর প্রান্তে শত-সহস্র মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উলঙ্গ। সবাই গা ঘষাঘষি করে, লাইনবন্দী হয়ে।

মাঝখানের তিনজন মানুষ পাহাড়ের মত এক-একজন। আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে তাদের মাথা। হাতের আঙুলগুলোই প্রকাণ্ডদেহী এক একটা গরিলার মত। মাথাগুলো প্রকাণ্ড এক একটা পাহাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই তিনজন মানুষের দুপাশেও দাঁড়িয়ে আছে বহু মানুষ। ক্রমশ ছোট হতে হতে সাধারণ মানুষের মত আকার-আকৃতি পেয়েছে মানুষগুলো। দু'প্রান্তে, যতদূর দৃষ্টি যায়, দাঁড়িয়ে আছে তারা গায়ে-গা ঠেকিয়ে।

উঁচু পাঁচিলের মত দেখায় দূর থেকে।

মানুষগুলো যে জ্যান্ত নয়, ওগুলো যে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তা বুঝতে বেশ একটু সময় লাগে আবিদের। দেখতে হুবহু জ্যান্ত মানুষের মতই। মাঝখানের তিনজন মানুষের চোখ কি দিয়ে তৈরি কে জানে। সব সময় লাল আলো বেরিয়ে আসছে সেই চোখগুলো থেকে।

জংলীরা সেই তিন প্রকাণ্ড মূর্তির সামনে গিয়ে নতজানু হয়। এমন সময় ভারি বজ্রকণ্ঠে মন্ত্রপড়ার মত শব্দ হয় কোথা থেকে যেন। মধ্যস্থানের প্রকাণ্ড তিন মূর্তির তিন দু'গুণে ছয়টি পা। একজোড়া পায়ের কাছ থেকে অপর জোড়ার দূরত্ব পঞ্চাশ হাতের মত। মধ্যবর্তী জায়গায় একটি করে প্রকাণ্ড গেট। দুটো গেটই এরপর খুলে যায়। জংলীরা প্রবেশ করে রহস্যপুরীতে।

অপেক্ষা করতে থাকে আবিদ। জংলীরা প্রবেশের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে বিশাল লোহার গেট। ক্রমে রাত নামে। রাতটা ওখানেই থেকে যায় আবিদরা। সকাল হয়। জংলীদের দেখা নেই। নেই কোন সাড়াশব্দ। তারপর ঠিক দুপুরে গেট খুলে যায় রহস্যপুরীর। আনন্দে উন্মাদের মত দেখায় জংলীদেরকে। পাগলের মত মাথা নাড়তে নাড়তে, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে রহস্যপুরী থেকে বেরিয়ে আসে

তারা। আবিদ গাছের উঁচু ডালে বসে লক্ষ্য করে জংলীদের সাথে সেই বন্দিনী নারীরা নেই, নেই খাঁচার বাঘ, ভালুক, ঘোড়া, হরিণ। নেই সেই মণ মণ স্বর্ণালঙ্কার।

তবে জংলীরা রহস্যপুরীতে ঢোকে কালো শরীর নিয়ে, ফেরে লাল শরীর নিয়ে। সর্ব অঙ্গে তাজা লাল রক্ত মেখে বেরিয়ে আসে তারা। চলে যায় জঙ্গল ধরে নিজেদের পথে। সেই পথ সুদীর্ঘ। সেই পথের শেষ কোথায় জানা নেই আবিদের।

এরপর আর একবার আর একটা কাফেলাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের শেষ সীমানা পর্যন্ত এসেছিল আবিদ। দ্বিতীয়বারের এই অভিযানে সে অনুসরণ করেছিল সভ্য জগতের শ্বেতাঙ্গদের একটা কাফেলাকে।

সভ্য মানুষদের এই কাফেলায় ছিল মাত্র চার জন লোক। রহস্যপুরী কোন্ দিকে তা তারা জানত না। কিন্তু তাদের হাবভাব, আচার আচরণ দেখে আবিদ বুঝতে পেরেছিল তারা রহস্যপুরীর সন্ধান পাবার জন্যেই এই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করেছে। কোন্ দিক যাবে তা তারা স্থির করতে পারত না, লেগে যেত তর্ক বিতর্ক নিজেদের মধ্যে।

অবশেষে শ্বেতাঙ্গরা রহস্যপুরীতে ঢুকেছিল ঠিকই। কিন্তু তারা আর বেরিয়ে আসেনি ভিতর থেকে।

কি এর রহস্য? কি আছে রহস্যপুরীতে! জংলীরা কেন যায়? জংলীরা গিয়ে ফিরে আসতে পারে, সভ্য মানুষরা কেন ফিরতে পারে না? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর পায়নি আবিদ গত পনেরো বছর ধরে চেষ্টা করেও।

চারদিকে তাকাল আবিদ। গেল কোথায় লিজা? রফিকী আর বেগমের সাথে এই তো খেলছিল। যাক, ভালই হয়েছে। ওদেরকে লুকিয়ে জংলীদের কাফেলাকে চুপিসারে দেখে আসা যাবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে আবিদ।

ক্রমে ঢাক-ঢোলের শব্দ বাড়ছে। বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা আশার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে জংলীদের কাফেলার আগমন টের পেলে। ক্ষীণ একটা ইচ্ছা ধিকি ধিকি জ্বলে মনে। দেশে ফেরার সুযোগ কি কখনও আসবে না তার?

মানুষ বলতে সে আর লিজা। আজ পনেরো বছর ধরে আর কোন মানুষের সাথে কথা বলেনি তারা, মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ পায়নি। সভ্য দুনিয়ার লোকদের কাফেলাটিকে দেখে দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়েছে ছুটে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হবার। কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে ক্ষান্ত করেছে। রহস্যপুরীর দিকে যে কাফেলাগুলো এদিক দিয়ে যায়, তারা সভ্যই হোক বা অসভ্যই হোক, লোকগুলোর চেহারা দেখেই খুনী, শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হয় তার। তাদের কাছে ছুটে গেলে তারা যদি তাকে গ্রহণ না করে? যদি হত্যা করে নির্মমভাবে? অসভ্যদের কাছে তো যাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না সে। দেখামাত্র বিষাক্ত তীর মেরে হত্যা করবে তারা।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এইরকম অনেক কথা ভাবছিল আবিদ।

মনে পড়ছিল দেশের কথা, বাবার কথা। ঢাকা শহর এখন কেমন হয়েছে কে জানে। বাবা কি বেঁচে আছেন আজও। সেন্ট্রাল জেল থেকে বাবা কি মুক্তি পেয়েছিলেন? আইয়ুব খানের নামটা ভোলেনি আবিদ। লোকটা কি এখনও তার দেশের মানুষকে শোষণ করছে, শাসন করছে?

আর সোহরাব?

সোহরাব কি সমুদ্রেই তলিয়ে গেছে? নাকি তার মত সে-ও ভাসতে ভাসতে কোথাও গিয়ে উঠেছিল—বেঁচে আছে আজও?

একে একে মনে পড়ে যায় সব কথা, পনেরো বছর আগের কথা। রাজনীতি করতেন আশরাফ উদ্দিন এডভোকেট। ঢাকায় তাঁর নিজের বাড়ি ছিল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার। দুই ছেলে আবিদ এবং সোহরাব। আর একটি পাখি। বাজপাখি। শিকারী বাজপাখি। এডভোকেট আশরাফ সাহেবের এই এক হবি ছিল, শিকারী বাজপাখি পোষা। বাজপাখিটার নামও ছিল শিকারী।

আবিদ পড়ত ক্লাস এইটে, সোহরাব টুতে। সেটা উনিশশো উনষাট সাল। এডভোকেট আশরাফ সাহেবকে গ্রেফতার করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে। বিচার ছাড়াই তাকে নিক্ষিপ্ত করা হলো কারাগারে অনির্দিষ্টকালের জন্য। শুধু তাই নয়, অত্যাচারী সরকার বাজেয়াপ্ত করল তাদের ব্যাঙ্কের টাকা এবং একমাত্র সম্পত্তি ঢাকার বাড়িটা।

বাড়ি ছেড়ে ওদের মা ওদেরকে নিয়ে পথে নামলেন। শান্তিবাগে ভাড়া নিলেন ছোট্ট একটি ঘর। শুরু করলেন টিউশনি। ছেলে দুটোকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তিনি।

কিন্তু ভাগ্য বিমুখ হলে যা হবার তাই হলো। মা হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন।

দুই ভাই অসহায় অবস্থায় পথে নামল। সাথে কিছুই নেই। আসবাবপত্র যা ছিল সব বাড়িওয়ালা ভাড়া বাকি থাকায় রেখে দিল। আবিদ আর সোহরাব রাস্তায় নামল বাজপাখি শিকারীকে নিয়ে।

দুনিয়া সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দুই ভাই শহরের পথে বেরিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু আবিদ বয়সে বড়, তার বুদ্ধি সোহরাবের চেয়ে বেশি। দু'দিন পথে পথে কাটিয়ে, উপোস থেকে হঠাৎ সে একটা রাস্তা বের করে ফেলে জীবিকা অর্জনের।

শিকারীকে কাজে লাগায় আবিদ। পল্টন ময়দানে গিয়ে বহু লোকের সামনে সে শিকারীকে ছেড়ে দেয়। মাথার উপর আকাশে হয়তো উড়ছে একটা কবুতর। তীরের মত উড়ে গিয়ে কবুতরটিকে ধরে নেমে এল শিকারী।

প্রথম প্রথম কবুতরগুলোকে মেরে ফেলত শিকারী। কিন্তু আবিদ শিকারীকে শিক্ষা দিতে লাগল। আবিদের কথা বুঝতে শিখল শিকারী। তারপর থেকে সে না মেরে কবুতর ধরে আনত জ্যান্ত।

আহত কবুতর বিক্রি করে বেশ দু'পয়সা আয় হত ওদের। আবার খেলা দেখার আনন্দও পেত দর্শকরা। ফলে তারাও দু'চার আনা বকশিশ দিত ওদের দুই ভাইকে।

রোজ রোজ একই জায়গায় খেলা দেখালে তা জমে না। কথাটা বুঝতে পেরে শহরের বাইরে যেতে শুরু করল ওরা। তারপর একদিন উঠে বসল ট্রেনে।

এবার অন্য শহর।

চট্টগ্রামে পৌঁছে সেই কবুতর শিকারের খেলা দেখিয়েই দিন কাটতে লাগল ওদের। লালদিঘীর মাঠে একদিন খেলা দেখাচ্ছিল ওরা। দর্শকদের মধ্যে ছিল এক ইংরেজ সাহেব। ওদের খেলা দেখে চমৎকৃত হন ভদ্রলোক। ওদের সাথে আলাপ করেন। জানতে চান ওদের বাবার নাম, বাড়ি কোথায় ইত্যাদি।

সমস্ত কথা সবিস্তারে বলে আবিদ সেই সাহেবকে।

এই সাহেব ছিলেন একটি জাহাজের ডাক্তার। প্রায়ই তিনি আবিদের খেলা দেখতে আসতেন। সোহরাবের তখন ভয়ানক অসুখ। ডিকেনসন সাহেব ওদেরকে একদিন নিয়ে যান পোর্টে। জাহাজে চড়ে আবিদ প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিল। সোহরাবের চিকিৎসার জন্য ডিকেনসন সাহেব ওদের দুজনকেই জাহাজে আশ্রয় দেন। সাহেবের দয়ায় জাহাজেই আশ্রয় পেল ওরা দুই ভাই। কিছু দিনের মধ্যেই সেরে গেল সোহরাবের অসুখ। বেশ সুস্থ হয়ে উঠল সে। ডিকেনসন সাহেব কিছু রঙিন বই দিয়েছিলেন আবিদকে। আবিদ সেগুলো দেখে সময় কাটাত। অবসর সময়ে চিন্তা করার চেষ্টা করত সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সোহরাব কিছুই ভাবত না। মাত্র ছয় বছর বয়স তখন তার।

লিজার তখন সাত কি আট বছর বয়স। ডাক্তারের মেয়ে লিজা।

জাহাজে রয়ে গেল ওরা দুই ভাই। তারপর, একদিন ভেঁপু বাজল, পাড়ি জমাল সমুদ্রে প্রকাণ্ড সেই দ্বীপের মত আলোক মালায় সজ্জিত জাহাজ।

রূপকথার রাজকুমার বলে মনে হয়েছিল নিজেকে আবিদের। সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে যেন তারা দুই ভাই, সাথে ভিন দেশের রাজা এবং রাজকন্যা।

রূপকথার রাজকুমার বাণিজ্যে রওনা হবার পর যা যা ঘটে আবিদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটল। জাহাজটার নাম ছিল ম্যাজেস্টিক। ম্যাজেস্টিকের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সিলোন। কিন্তু সিলোনে নোঙর করার আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন ডিকেনসন সাহেব।

লিজা এতিম হলো। ওর মা আগেই, ক্যালিফোর্নিয়ায়, মারা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটল ভয়ঙ্কর। এরকম ঘটনা রূপকথার রাজকুমারের ভাগ্যেই ঘটে। মাদাগাস্কারের দিকে ছুটছিল জাহাজ। ভারত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তের সবচেয়ে বড় দ্বীপ এই মাদাগাস্কার। কিন্তু মাদাগাস্কারে পৌঁছবার দু'দিন আগে ঝড় উঠল।

সে প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্রের সেই বিকট গর্জন আজও ভোলেনি আবিদ। জাহাজ এই ডোবে ডোবে অবস্থা।

চব্বিশ ঘণ্টা ঝড়ের সাথে, পাহাড় প্রমাণ লক্ষ কোটি রাক্ষুসে ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করে টিকে রইল ম্যাজেস্টিক। ঝড় থামল। ক্যাপটেন বললেন, মাদাগাস্কার পেরিয়ে আমরা অন্যদিকে চলে গেছি। জাহাজ ঘোরাতে হবে।

ঘুরল জাহাজ। কিন্তু হঠাৎ আবার বিপদ ঘটল। জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে।

ফুটো মেরামত করার সংগ্রাম চলল এবার। কিন্তু ব্যর্থ হলো সে সংগ্রাম। হাহাকার পড়ে গেল এদের মধ্যে। কান্নার রোল উঠল যাত্রীদের মধ্যে।

ক্যাপটেন স্বয়ং লিজা এবং আবিদকে নামিয়ে দিলেন একটা লাইফবয়ে। সোহরাবকে নামানো হলো আর একটা লাইফবয়ে।

ম্যাজেস্টিক তখন ডুবছে।

বাজপাখিটা ছিল দুটো লাইফবয়ের মাঝখানে, আকাশে।

সমুদ্রে ভাসতে লাগল ওরা। সন্ধ্যার পর রাত্রি নামল। কেঁদে কেঁদে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে লিজা। লিজাকে জড়িয়ে ধরে আবিদ বসে আছে। সমুদ্রের গর্জনে কানে তালা লাগার অবস্থা। সারারাত জেগে রইল সে। সকাল হলো এক সময়। দিনের আলোয় চারদিকে কোথাও সোহরাবের লাইফবয়ের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেল না। জ্বর এল আবিদের। লিজা জ্ঞান হারিয়েছিল রাত্রেই। সে-ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। লাইফবয় সেদিনই সন্ধ্যায় ভিড়ল তীরে।

জ্ঞান ফিরতে আবিদ দেখল সে শুয়ে আছে জেলেদের কুঁড়ে ঘরে।

এরপর নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে একটার পর একটা। জেলেরা আবিদ এবং লিজাকে কুড়িয়ে পায় বালুকাবেলায়। তারাই ওদেরকে বিক্রি করে দেয় দার-এস-সালামের এক শেখের কাছে।

শেখের বাড়িটা ছিল সুউচ্চ একটা দুর্গ বিশেষ। সেখানে বন্দীর মত জীবনযাপন করতে থাকে ওরা। শেখের কড়া নির্দেশ ছিল লিজাকে যেন কোনমতে বাইরে বেরুতে দেয়া না হয়। তবে আবিদ যখন খুশি বেরুতে পারত, ঢুকতে পারত। মাস তিনেক ওখানে কাটাবার পর কৌশলে শেখের খপ্পর থেকে লিজাকে উদ্ধার করে সে। ছেলেদের প্যান্টশার্ট পরিয়ে শেখের দুর্গ থেকে লিজাকে বাইরে বের করে আনে সে। সোজা চলে যায় সেখান থেকে রেল স্টেশনে।

ট্রেনে উঠে বসে ওরা। অজ্ঞাত দেশ, দুর্বোধ্য ভাষা, গন্তব্যের ঠিকানা জানা নেই—তবু চলেছে ওরা। ইতিমধ্যে এক লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল আবিদের। সেই লোক লোভ দেখিয়ে বলেছিল, টাবোরা শহরে একবার পৌঁছুতে পারলে হয়, যে কেউ বড় লোক হয়ে যাবে। লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারত। সেই লোকের কথা শুনেই ট্রেনে ওঠে আবিদ লিজাকে নিয়ে।

দার-এস-সালাম থেকে টাবোরা পাঁচশো মাইল প্রায়। কিন্তু একশো মাইল

পেরোবার আগেই নেমে পড়ল ওরা।

এরপরের দিনগুলো ঘটনাবহুল। কাজ করল আবিদ আর লিজা কয়েকটা খনিতে। পালিয়ে গেল এক শহর থেকে আর এক শহরে, শ্রমিকদের সর্দারের অত্যাচার সহ্য করে কোন খনিতেই টিকতে পারল না ওরা।, নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে খেয়ে না খেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পড়তে লাগল ওরা। কখনও ট্রাকে, কখনও ট্রেনে করে বহু দূরের কোন শহরে চলে যেত। সেখানে ঘুরে বেড়াত যাযাবরদের মত। তারপর আবার কোন গুণ্ডা বা ডাকাতদলের হাতে পড়ে বিক্রি হয়ে যেত কোন আমিরের কাছে।

কিন্তু পালাবার চেষ্টা করে কোন বারই ব্যর্থ হয়নি আবিদ ও লিজা। যেখানে, যার অধীনেই থাকুক, ঠিকই ওরা আবার পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা পৌঁছুল মোয়ানজায়। এখানেও একটা খনিতে কাজ পেল ওরা। কেউ জানল না লিজা ছেলে না মেয়ে।

একদিন সকালে উঠে ওরা দেখল শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা লেগে গেছে। সে এক খুনোখুনি কাণ্ড। ভয়ে পালাল ওরা। ছুটতে ছুটতে শহরের কাছাকাছি এসে ধরা পড়ল কয়েকজন লোকের হাতে।

একদল লোক একটা তিন চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আবিদ এবং লিজাকে দাঁড় করাল তারা। লোকগুলো সংখ্যায় ছিল আটজন। গাড়িতে তাদের ব্যাগ বাক্স ছিল। প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব ফুটে ছিল। লোকগুলো যে সুবিধের নয় তা আবিদ বুঝতে পেরেছিল। এর আগে অনেক খারাপ লোকের হাতে পড়ছিল ওরা কিন্তু এরা যে সে-সব লোকের চেয়েও ভয়ংকর প্রকৃতির তা বুঝতে কষ্ট হয়নি তার।

আবিদকে দাঁড় করিয়ে রাখল তারা। লিজাকে হুকুম করল তিন চাকাওয়ালা গাড়ির গা পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলার। লিজা ভয়ে ভয়ে কাজে হাত দিল। লোকগুলো ব্যাগ খুলে বের করল খেজুর আর বাদাম। আবিদ আর লিজাকেও দিল খেতে। খাওয়া শেষ হতে লোকগুলো আবিদকে দূরের একটা কূয়া থেকে এক বালতি পানি নিয়ে আসার হুকুম করল।

পানি নিয়ে এল আবিদ।

লোকগুলো গাড়িতে চড়ল। আবিদ ও লিজাকেও তুলে নিল ওরা গাড়িতে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সারারাত ছুটল গাড়ি। সকাল হতে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নেমে আবিদ আর লিজা দেখল গভীর জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করছে গাড়ি। সামনে আর রাস্তা নেই।

লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে তারা আবিদ আর লিজার মাথার চুল ধরে নাড়া দিয়ে ভয় দেখাল আকার ইঙ্গিতে—এখান থেকে পালাবার কোন

উপায় নেই। পালাবার চেষ্টা করলেই হিংস্র জীব-জন্তুর হাতে প্রাণ হারাতে হবে।

এরপর গহীন বনভূমির ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন হাঁটতে হয় ওদেরকে। সেই আটজনের দলটি আসলে রহস্যপুরীর সন্ধানে যাচ্ছিল গহীন অরণ্যের ভিতর দিয়ে। আবিদ এবং লিজাকে তারা সাথে নিয়েছিল কাজকর্ম করবার জন্য। ওরা দুজন রান্নাবান্না করত, কাঠ কেটে আনত, লোকগুলোর হাত-পা টিপে দিত। কাপড় ধুয়ে দিত।

অরণ্যের প্রাণীদের তরফ থেকে আক্রমণ আসত প্রায় রোজই। আধুনিক যন্ত্রপাতি সাথে থাকলেও আটজনের মধ্যে তিনজনই নিহত হলো এক হপ্তার মধ্যে। বাকি পাঁচজন আক্রান্ত হলো একদিন হঠাৎ একদল জংলীদের দ্বারা।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রাণের ভয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটল আবিদ ও লিজা।

কতক্ষণ ধরে দৌড়েছিল খেয়াল নেই আবিদের। হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফেরার পর সে দেখে পাশেই শুয়ে আছে লিজা। ঘুমাচ্ছে অঘোরে। এবং ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী অসংখ্য গরিলা।

বাজপাখিটা বসেছিল একটা গাছের ডালে। আবিদ জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসতেই সে চিৎকার করে ডেকে উঠে মাথার উপর উড়তে লাগল ঘুরে ঘুরে।

আবিদকে উঠে বসতে দেখেই প্রকাণ্ড একটা গরিলা নিজের বুকে চাপড় মেরে ঢোল পেটার মত বিকট শব্দ তুলে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে কেঁদে ফেলল আবিদ।

কিন্তু পরমুহূর্তে ঘটল অদ্ভুত একটা কাণ্ড। সেই প্রকাণ্ড আক্রমণোদ্যত গরিলাটা যখন আবিদের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে তখন তিন চারটে সম-আকৃতির গরিলা অকস্মাৎ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট গর্জন তুলে এগিয়ে এল।

আক্রমণোদ্যত গরিলাটাকে তারা বাধা দিল। লেগে গেল ওদের মধ্যে কোন্দল। শেষ পর্যন্ত হিংস্র গরিলাটা পিছিয়ে গেল।

অধিকাংশ গরিলা আবিদ এবং লিজাকে সুদৃষ্টিতে দেখায় কোন বিপদই ঘটল না ওদের। ক্রমে গরিলাদের বাচ্চারা ওদের কাছে আসতে লাগল, ওদের নিয়ে খেলা করতে চেষ্টা করতে লাগল। দিন কাটতে লাগল, গরিলারা নিজেদের মধ্যে আবিদ এবং লিজার উপস্থিতি মেনে নিল। গরিলাদের হাবভাব গলার স্বর ইত্যাদি নকল করতে শুরু করল ওরা। কেটে গেল মাসের পর মাস বছরের পর বছর। আবিদ এবং লিজা হয়ে উঠল গরিলাদের একমাত্র এবং সবচেয়ে বড় মানুষ-বন্ধু।

আবিদ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। খিকখিক করে হাসছে চারদিক থেকে শ'দেড়েক গরিলা। ঘিরে ফেলেছে ওকে তারা। লিজার উপর রাগ হলো আবিদের। ঢাক-ঢোলের শব্দ

শুনে আগেই সে গরিলা বাহিনীকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে এতদূর। রফিকী ফিক ফিক করে হাসছে আবিদের গাম্ভীর্য দেখে।

জংলীদের উপর গরিলারা বিশেষভাবে খেপা বলে আবিদ পারত পক্ষে চায় না ওদেরকে মুখোমুখি হতে দিতে। জংলীদের প্রতি বিদ্বেষের কারণ হলো জংলীদের ঢাক-ঢোল পেটাবার শব্দটা গরিলাদের বুক চাপড়াবার শব্দের মতই। ঢাক-ঢোলের শব্দ হলেই ওরা ধরে নেয় জংলীরা যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

লিজাকে চারদিকে খুঁজল আবিদ। নেই সে। রফিকীর বউও নেই আশপাশে কোথাও। রফিকীর দিকে তাকাল আবিদ, জানতে চাইল, 'লিজা কোথায়? তোমার বেগম কোথায়?'

রফিকী দুই হাত সামনে বাড়িয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গি করে বোঝাল তারা নদীতে স্নান করতে গেছে।

'জংলীরা আসছে। আমার পিছু পিছু ওদেরকে দেখার জন্য যেতে পারো তোমরা। কিন্তু কোন শব্দ করতে পারবে না। রাজি?'

রফিকী মাথা কাত করল। রাজি সে। রফিকী রাজি হলেই সবাই রাজি। রফিকীর পিঠের লোম উঠে গেছে। রূপোর মত চকচকে তার পিঠ। এটা বয়সের চিহ্ন। অধিকাংশ গরিলার পিঠ তাদের সর্বাঙ্গের মতই লোমে আবৃত। যাদের পিঠ রূপোর মত চকচকে তারাই শুধু সর্দার হবার উপযুক্ত। রফিকী সর্দার।

পা বাড়াল আবিদ।

দ্রিম-দ্রিম, ডুম-ডাম—দ্রাম—দ্রিম, ডুম-ডাম—দ্রাম—দ্রিম-দ্রিম, ডুম-ডাম। সেই সাথে জংলীদের উল্লসিত দুর্বোধ্য আকাশ ফাটানো চিৎকার, সেই সাথে খাঁচায় বন্দী বাঘের গর্জন চারদিকের বনজঙ্গল কাঁপিয়ে তুলছে।

গরিলা বাহিনী আবিদের পিছু পিছু এগোচ্ছে। সবাই উত্তেজিত, সকলের দৃষ্টি তার দিকে। তার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে ওরা। ইঙ্গিত পেলেই বুকে চাপড় মারতে মারতে বিপুল বিক্রমে গাছপালা ভেঙে ছুটবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে জংলীদের ঘাড়ে।

থমকে দাঁড়াল আবিদ। পিছন দিকে হাত নাড়ল। ইঙ্গিত পেয়ে যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল গরিলারা।

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মালকানী পাহাড়ের গিরিপথ। সামনে প্রশস্ত সমতলভূমি। শ' পাঁচেক বা তারও কিছু বেশি জংলী ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে সমতলভূমি পেরিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকের জঙ্গলের ভিতর ঢুকছে। সেই একই দৃশ্য। খাঁচায় বন্দী বাঘ, ভালুক, ঘোড়া, শ্বেতাঙ্গ বন্দিনী। ভারি স্বর্ণের অলঙ্কার গলায়, গায়ে।

জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল জংলীরা। কিন্তু নড়ল না আবিদ। গরিলারা নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দিয়েছে। লাফালাফি করছে তারা। বাচ্চা গরিলারা গাছের

ডাল ধরে দোল খাচ্ছে! মড় মড় শব্দ হচ্ছে ডালপালা ভাঙার। আবিদ হঠাৎ গর্জে উঠল, 'চুপ করো সবাই।'

বনভূমির আড়ালে চলে গেছে জংলীরা। সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ঢাক ঢোল পেটানো। কান পেতেও কোন শব্দ পাচ্ছে না আবিদ। ব্যাপার কি? এরকম তো এর আগে কখনও হয়নি।

মালকানী গিরিপথের দিকে চোখ পড়তেই তীক্ষ্ণ হলো আবিদের দৃষ্টি। বিশ-পঁচিশজন লোককে দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে তারা গিরিপথের ভিতর থেকে সমতল ভূমিতে।

বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, কপাল মন্দ ওদের। জংলীদের হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যাবার কারণ বুঝতে পারল আবিদ। ওরা জানতে পেরেছে সভ্য জগতের বিশ পঁচিশজনের একটা দল ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে। জঙ্গলে প্রবেশ করে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে সবাই। ওত পেতে আছে। সভ্য দুনিয়ার এই লোভী লোকগুলো রহস্যপুরীর সন্ধান জানতে এসেছে। কিন্তু রহস্যপুরী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না তারা। সমতলভূমি পেরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশের সাথে সাথে জংলীরা এদের জান কবচ করবে।

গরিলারাও এতক্ষণে টের পেয়েছে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

সন্ধানী দৃষ্টিতে দূরের ওই লোকগুলোকে দেখতে লাগল আবিদ। অনেকটা দূরে ওরা, ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবে দলটা যে সভ্য জগতের মানুষের তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই রঙচঙে পোশাক পরে আছে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র। তবে দলে শ্বেতাঙ্গ কেউ নেই।

হঠাৎ মাথার উপর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল আবিদ। তার শিকারী তীর বেগে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

পিছন দিকে তাকাল আবিদ। বেগম এসে দাঁড়িয়েছে রফিকীর পাশে। তার পাশে বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে সিক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে পরীর মত সুন্দরী যুবতী লিজা। লিজার দু'চোখে বিস্ময়। আবিদ তাকাতে সে বলল, 'শিকারী আমার কাঁধে ছিল। কি দেখে অমন চিৎকার করে উড়ে গেল বুঝতে পারলাম না।'

পাতার ফাঁক দিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাল আবিদ। বিশ-পঁচিশজনের দলটা সমতলভূমির মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে। দলটার মাথার উপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে শিকারী, চক্কর দিচ্ছে দলটাকে কেন্দ্র করে আকাশে। গোটা দলটা উত্তেজিত। জংলীদের ঢাকঢোলের শব্দ হচ্ছে না দেখে একটা সন্দেহ জেগেছে তাদের মনে। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে তারা। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই মারণাস্ত্র রয়েছে। সবাই প্রস্তুত।

এরপর ঘটল সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। আবিদের শিকারী দলটার একজন

লোকের কাঁধে গিয়ে বসল হঠাৎ।

বুকের ভিতর কেমন যেন একটা ছটফটানি ভাব দেখা দিল আবিদের। কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে, কি যেন চিন্তা করার চেষ্টা করছে।

বিশ-পঁচিশজনের দলটা জঙ্গলে প্রবেশের আগেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে জংলীরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

আবিদ বিকট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'রফিকী! সাবাড় করো জংলীদের।'

চোখের পলকে দ্রুত ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল জংলীরা। সভ্যদের প্রত্যেকের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। আহতদের আর্তনাদে কেঁপে উঠল চারদিকের বনভূমি। জংলীরা প্রথম আক্রমণ করায় সভ্য লোকদের বেশ কয়েকজন প্রথমেই বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তারা। এদিকে জংলীরা মরছে দলে দলে। বুলেটবিদ্ধ হয়ে একসাথে লুটিয়ে পড়ছে চার-পাঁচজন করে জংলী।

কিন্তু জংলীরা সংখ্যায় পঞ্চাশ গুণ বেশি। তাদের লক্ষ্যও অব্যর্থ। ভয়ে বা আত্মরক্ষার্থে পিছিয়ে আসার বান্দা তারা নয়। মরছে একের পর এক, কিন্তু তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। সভ্য লোকদের প্রায় সবাই তীরবিদ্ধ হলো দেখতে দেখতে। তারপর, জংলীরা হঠাৎ মেঘের মত ডাক শুনে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল গরিলা বাহিনীকে।

মৃত্যু ভয়ে যে যেদিক পারল ছুটল। কিন্তু গরিলাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। জংলীদের ধরে গরিলারা ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে মাটিতে, তারপর পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল বুকের উপর। মট্ মট্ করে ভাঙতে লাগল জংলীদের পাঁজরগুলো।

সমতলভূমির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছুল আবিদ।

আহত এবং নিহত বিশ-পঁচিশজনের দলটার মাথার উপর চক্কর মারছে আর চেঁচাচ্ছে তখন শিকারী।

আহতদের একজন লোক একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আবিদের দিকে। আবিদও দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। পাশে এসে দাঁড়াল লিজা।

চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে আবিদের। গাল বেয়ে সেই জলের ধারা টপ টপ করে পড়ছে আহত লোকটার গায়ে।

কাঁদছে নিঃশব্দে আহত লোকটাও। লিজাও হঠাৎ কান্না ভারাক্রান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'সোহরাব!'

আবিদ ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট ভাইয়ের বুকের উপর।

দুই

রফিকীকে পাওয়া গেল না কোথাও। বেগম কাঁধে করে নিয়ে এল সোহরাবকে জঙ্গলের ভিতর। আবিদের কুঁড়েঘরে শোয়ানো হলো তাকে। মাথার কাছে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাজপাখি। কুঁড়েঘরের সামনে আহত আরও চারজনকে এনে রাখল। তাদের মধ্যে এক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল দু'জন।

রফিকী ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর। আবিদের হাতে সে তুলে দিল নীল রঙের কয়েকটা গাছের পাতা। হাতের উপর হাত ঠুকে সে দেখাল পাতাগুলো কেটে থেঁতলে সোহরাবের ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে, খাওয়াতে হবে এই নীল পাতার রস।

আহত অপর লোক দুজনের চিকিৎসার ভার নিল লিজা। আবিদ ছোট ভাইয়ের পাশ থেকে উঠল না মুহূর্তের জন্যও।

গরিলারা লিজার নির্দেশে জংলীদের যাবতীয় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে এল আবিদের কুঁড়েঘরের ভিতর। খাঁচাগুলো রাখা হলো বাইরে।

রফিকীর ওষুধের গুণে বেঁচে গেল সোহরাব এবং তার দলের অপর দু'জন। সোহরাব একে একে বলতে লাগল দুই ভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর তার ভাগ্যে কি কি ঘটেছে।

উগাণ্ডায় বসবাস করছে সোহরাব। বিয়ে করেছে সে। কাম্পালায় তার বেশ ভাল ব্যবসা আছে। ব্যাঙ্কে জমেছে প্রচুর টাকা। পথের ফকীর থেকে সোহরাব আজ অনেক টাকার মানুষ। প্রচণ্ড খেটেছে সে। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হলো না।

উগাণ্ডার একনায়ক শাসক জেনারেল ইদি আমিন বিশেষ আইনবলে এশিয়াবাসীদেরকে উগাণ্ডা ত্যাগ করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ পেয়ে স্বভাবতই মন ভেঙে যায় সোহরাবের। এত কষ্টের ফসল, ব্যবসা, টাকা, ঘর-বাড়ি ফেলে চলে যেতে হবে ভাবতে কারই বা ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা তদ্বির করে সে দেখা করে ইদি আমিনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এক মহিলার সাথে।

ইদি আমিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি সোহরাবের প্রার্থনা শুনে তিনদিন পর উত্তর দেয়, সোহরাব যদি সাবেক বেলজিয়ান কঙ্গো অর্থাৎ বর্তমানের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গোর গভীর অরণ্যে অবস্থিত হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত গুপ্তধন সম্পর্কে যে গুজব শোনা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারে অর্থাৎ গুজবের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে বাস্তবভিত্তিক রিপোর্ট দিতে পারে তাহলে তার সয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে না এবং উগাণ্ডার নাগরিক হিসেবে তাকে গ্রহণ করা হবে।

কঙ্গোর গভীর অরণ্যে গুপ্তধন সঞ্চিত আছে এরকম একটা গুজব প্রচলিত ছিল।

কিন্তু কেউই এর হদিস আজ অবধি পায়নি। যারাই এর সন্ধানে এসেছে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, দেশে ফিরতে পারেনি। রহস্যপুরীর ধারে কাছে কেউ পৌঁছুতে পেরেছে বলে দাবি করেনি কেউ।

আবিদ বলল, 'গুপ্তধন কোথায় আছে তা আমি জানি। গুপ্তধন আছে যে শুধু তাই নয়, তা প্রতি বছরই বাড়ছে। রহস্যপুরী নাম দিয়েছি সেই জায়গার। কিন্তু, সোহরাব, সেখানে গিয়ে কেউ কোনদিন ফিরতে পারে না।'

সোহরাব বলল, 'ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী কয়েক বছর আগে একটা দল পাঠিয়েছিলেন। তারা প্রায় বিশ মণ সোনা উদ্ধার করে নিয়ে যায় তোমার এই রহস্যপুরী থেকে। এ ঘটনার কথা জেনারেল ইদি আমিন জানতে পেরেই গুপ্তধন পাবার লোভে আমার নেতৃত্বে একটা দল পাঠিয়েছেন।'

আবিদ বলল, 'ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসীর পাঠানো সেই দল বিশ মণ সোনা রহস্যপুরী থেকে উদ্ধার করেনি, সোহরাব। সভ্যজগতের কেউ কোন দিন রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে বেরুতে পারেনি আজ পর্যন্ত। ওরা জংলীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সম্ভবত ওই সোনা। জংলীরা, কেন জানি না, প্রতি বছর দল বেঁধে মণ মণ সোনা নিয়ে আসে রহস্যপুরীতে। সেই সোনা রহস্যপুরীতে রেখে ফিরে যায় ওরা।'

'কী আশ্চর্য! রহস্যপুরীতে কারা থাকে, কাদেরকে সোনা দিয়ে যায় জংলীরা!'

আবিদ বলল, 'জানি না। রহস্যপুরীতে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সোহরাব, দেশের খবর কিছু জানিস?'

কথাটা বলে আবিদ হেসে উঠল হঠাৎ, তারপর আবার বলল, 'দেশের কথা তুই জানবি কিভাবে। ছয় বছর বয়সে তোকে নিয়ে বেরিয়েছি। বাবার কথা, দেশের কথা তোর মনে থাকার কথা নয়। সোহরাব, আমাদের বাবা বেঁচে আছেন। আমাদের দেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে।'

'সেকি! বাবা বেঁচে আছেন! তুমি এসব খবর এই গভীর জঙ্গলে থেকে সংগ্রহ করলে কিভাবে।'

'শোনো তবে। আমি এই জঙ্গলে আসার পর থেকে মাঝে মাঝেই আমাদের শিকারী হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যেত। পঁচিশ-ত্রিশ দিন দেখা পাওয়া যেত না তার। আসলে কোথায় যেত সে জানিস? যেত আমাদের দেশে।'

'সেকি!'

আবিদ বলল, 'হ্যাঁ। যে কোন কারণেই হোক, বাবা শিকারীকে লক্ষ্য করেননি অনেক দিন অবধি। কিন্তু মাস চারেক আগে শিকারী আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। ফেরে প্রায় পনেরো দিন পর। দেশেই গিয়েছিল সে। সাথে করে নিয়ে এসেছে—কি নিয়ে এসেছে জানিস?'

'কি?'

'চিঠি। বাবার নিজের হাতে লেখা চিঠি। দাঁড়া, দেখাচ্ছি।'

কথাটা বলে আবিদ ঘরের এক কোনায় রাখা একটা লেদার ব্যাগের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাগটা খুলে একটা তামার মাদুলী বের করে আনল সে। মাদুলীর একদিকের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করা। মোমটুকু লম্বা নখ দিয়ে খুঁটে বের করে ভিতর থেকে ভাঁজ করা ছোট একটা কাগজের টুকরো বের করল আবিদ।

ভাঁজ খুলে আবিদ চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

'আমার দুই সোনা মানিক আবিদ আর সোহরাব, বাবারা, তোমরা বেঁচে আছ কিনা, বেঁচে থাকলেও কোথায় আছ কিছুই জানি না। তোমাদেরকে হারিয়ে আমি নিদারুণ দুশ্চিন্তা এবং শোকে কাতর হয়ে দিন কাটাচ্ছি।

তোমরা যখন হারিয়ে যাও তখন তোমাদের সাথে আমার পোষা পাখি শিকারীও হারিয়ে যায়। গত বছর খানেক হলো, আমি শিকারীকে মাঝে মধ্যে কোথা থেকে জানি না উড়ে আসতে দেখি। ওকে দেখে আমার বুকে আশার আলো জ্বলে ওঠে, মনে হয় তোমরাও বেঁচে আছ; তাই শিকারীর গলায় একটা মাদুলীর সাথে এই চিঠি লিখছি। তোমরা যদি বেঁচে থাকো তাহলে এই চিঠির উত্তর দিও। আমার দোয়া রইল তোমাদের প্রতি।

ইতি—
তোমাদের বাবা,
আশরাফ উদ্দিন

চিঠিটা পড়া শেষ করে আবিদ বলল, 'শিকারীকে এর পর আর পাঠাইনি। ভেবেছিলাম এবার পাঠাব। কিন্তু তাও আর দরকার হবে না।

সোহরাব বলল, 'এখন কি করতে চাও তুমি?'

আবিদ বলল, 'যেমন করে হোক দেশে ফেরার চেষ্টা করব, সোহরাব।'

'দেশে তো অবশ্যই ফিরব। কিন্তু···।'

আবিদ বলল, 'তুই কি আশঙ্কা করছিস বুঝতে পারছি। গুপ্তধনের সঠিক অবস্থান জেনারেল ইদি আমিনকে জানাতে হবে। শুধু জানালেই চলবে না, জানাবার পর সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে তুলে দিতে হবে তার হাতে। তা না হলে তোর সয় সম্পত্তি যাবে সব।'

'শুধু তাই নয়, প্রাণ নিয়ে উগাণ্ডা থেকে পালাবারও উপায় থাকবে না আমার। জেনারেল রগচটা মানুষ। কখন কি করে, কখন কি সিদ্ধান্ত নেয় তার ঠিক নেই। সারা পৃথিবীর লোক জানে ইদি আমিন যেমন পাগলাটে তেমনি নিষ্ঠুর।'

আবিদ বলল, 'হুঁ!'

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সোহরাব বলল, 'আমার যা হবার হবে। তুমি দেশে

ফিরে যাও।

'তা হয় না। তোকে এমন বিপদে ফেলে আমি দেশে যাব কেমন করে রে, বোকা? ঠিক আছে, উপায় পেয়ে গেছি। উগাণ্ডায় চল আগে। রহস্যপুরীর হদিস দেব জেনারেলকে। জেনারেল গুপ্তধন উদ্ধার করতে পাঠাতে চাইলে রাজি হব আমি উদ্ধার অভিযানে আসতে। কিন্তু শর্ত দেব তোদেরকে উগাণ্ডা ত্যাগের অনুমতি দিতে হবে। ব্যবসার গুড উইল বিক্রির টাকা, ব্যাঙ্কের টাকা, বাড়ি বিক্রির টাকা সব দেশে নিয়ে যাবার অনুমতিও দিতে হবে সেই সাথে।'

'কিন্তু···।'

আবিদ বলল, 'আমার বিপদের কথা ভাবছিস? আমি বিপদে পড়ব না। এই এলাকাতেই তো যত বিপদ, তাই না? এখানকার বিপদকে আমি পরোয়া করি না। রফিকীর দল আমাকে সাহায্য করবে। এদেরকে নিয়েই আমি রহস্যপুরীতে ঢুকব। সাথে থাকবে ইদি আমিনের সামরিক বাহিনীর বিরাট একটা দল। সব ঠিক করে ফেলব, দেখিস তুই।'

তিন

ঢাকা।

মিল ব্যারাক রোডের উপর দুর্ঘটনা ঘটেছে এইমাত্র। প্রকাণ্ড একটা ভ্যান ছোট্ট একটা অস্টিনকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে। ভ্যানের ড্রাইভার পাটখড়ির মত রোগা হ্যাট পরা লোকটা শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেছিল ঠিকই কিন্তু কাজ হয়নি তাতে। অস্টিনকে বাঁচাতে পারেনি সে। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটন্ত ভ্যানের ধাক্কায় অস্টিনটা ফ্রী কিক্ খাওয়া ফুটবলের মত প্রায় উড়ে গিয়ে পড়েছে মাঠের উপর। অস্টিনের ড্রাইভারের ভাগ্য অস্বাভাবিক ভাল বলতে হবে। কারণ ধাক্কা লাগলেও পুরোপুরি অক্ষত আছে সে। গাড়ির পিছনটা অবশ্য তুবড়ে গেছে। অকস্মাৎ ভ্যান ব্রেক কষায় কাঠের কয়েকটি বাক্স ছিটকে পড়ে গেছে রাস্তার উপর।

ভেঙে গেছে একটা বাক্স। ভাঙা বাক্স থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য তেলাপোকা।

মহা হৈ-চৈ পড়ে গেছে চারপাশের লোকজনের মধ্যে। দোষ কার? সবাই একবাক্যে বলছে দোষ অস্টিনের। অস্টিনের ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যদিও দু'একজন লোক বলছে, ভ্যানের ড্রাইভারই বা কেমন লোক? শহরের ভিতর এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল কেন সে? তবে অ্যাক্সিডেন্টে তেমন ক্ষতি কারোরই হয়নি, তাই কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এদিকে ভ্যানের পিছনে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। ভ্যানের ড্রাইভার নিচে নেমে কাঠের বাক্সগুলো তুলছে। ভাঙা বাক্সের ভিতর থেকে তেলাপোকারা বের হয়ে পালাচ্ছে এদিক সেদিক, লোকটা এক হাতে মাথার হ্যাট ঠিক করতে করতে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি

করে সেগুলোকে ধরে বাক্সে ভরার চেষ্টা করছে। দর্শকরা এদিকে হেসে গড়িয়ে পড়ছে একজন আরেকজনের গায়ের উপর।

এমন দৃশ্য দেখা যায় না সচরাচর।

খেপে উঠেছে হ্যাটপরা ভ্যানের ড্রাইভার। তেলাপোকাদের সাথে পারছে না সে।

'ফিফটি ঠাউজেন্ট তেলচোট্টা সাপ্লাই ডিটে হইবে—এডিকে ব্যাটারা পলাতক হইটে চায়।'

বলাই বাহুল্য, ভ্যানের ড্রাইভার স্বয়ং স্যানন ডি. কস্টা।

'কি হবে এই তেলাপোকা দিয়ে?' একজন পথিক হাসি থামিয়ে জানতে চাইল।

'শাটআপ, মিস্টার! কি হইবে টা ডিয়া হাপনার কি ডরকার?'

ডি. কস্টা কথাটা বলে ভাঙা বাক্সটা ভ্যানের পিছন দিকে তুলে ফেলল। মাথার হ্যাটটা বাক্সের উপর রাখল সে। যাতে তেলাপোকারা আর বেরুতে না পারে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে।

কে একজন বলল, 'পুলিস আসছে।'

পাশেই থানা। পুলিস আসছে এতক্ষণে। ডি. কস্টা বলে উঠল, 'কোন প্রফিট হইবে না। পকেট এমটি।'

ভ্যান স্টার্ট দেয়াই ছিল, চলতে শুরু করল এবার। কিন্তু অস্টিনের ড্রাইভার স্যুট পরা ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে পথ রোধ করে দাঁড়াল। চিৎকার করছে সে, 'পালিয়ে যেতে দেব ভেবেছ? আমার গাড়ির পিছনটা তুবড়ে গেছে, আমি কেস করব। ভাল যদি চাও, থামো, গাড়ি মেরামতের টাকা দিয়ে যাও!'

ডি. কস্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিচে নামল। লোকটা সামনে এসে দাঁড়াতে অতি আপনজনের মত অপ্রত্যাশিতভাবে ডি. কস্টা তাকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে বুকের সাথে চেপে ধরল।

'আরে! ছাড়ো বলছি, তোমার হাড় বিঁধছে গায়ে—কী মুশকিল! পাগল নাকিরে বাবা।' স্যুট পরা লোকটা চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

ডি.কস্টার কাণ্ড দেখে হোঃ হোঃ করে হাসছে দর্শকরা। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ডি. কস্টা। মিটিমিটি হাসছে সে। জানতে চাইল মিষ্টি গলায়, 'হাউ মাচ? কট টাকা লাগিবে মিস্টার হাপনার খেলনা গাড়ি মেরামট করিটে?'

'দুশো টাকার এক পয়সাও কম না···।'

'ডিচ্ছি ডিচ্ছি।'

কথাটা বলে আবার ভ্যানে উঠে পড়ল ডি. কস্টা। পকেট থেকে বের করল ম্যানিব্যাগ, উল্টেপাল্টে দেখল সেটা। বিড় বিড় করে বলল, 'বেশ দামী জিনিস ডেকা যাইটেছে অণ্ডরমহলে রসকষ কিছু ঠাকিলেও ঠাকিটে পারে।'

ম্যানিব্যাগ খুলে ডি. কস্টা দেখল দশ টাকার অনেকগুলো নোট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত বিশটা নোট গুনে নিচে দাঁড়ানো লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, বলল, 'এই নিন, মিস্টার। হাপনার টাকা, আইমীন, হাপনার প্রাপ্য হাপনাকে ডিলাম।'

লোকটা টাকাটা নিতেই ভ্যান ছেড়ে দিল ডি. কস্টা। স্যুট পরা লোকটা জানতেও পারল না তার পকেটের ম্যানিব্যাগ কখন কিভাবে ডি. কস্টার পকেটে গেল, বুঝতেও পারল না যে টাকাগুলো ডি. কস্টা তাকে দিল সেগুলো আসলে তারই টাকা।

ভ্যান ছুটছে। ডি. কস্টা মাথা দোলাতে দোলাতে গান গাইছে আপন মনে:

'মাই নেম ইজ স্যানন
লাইক এ বিগ ক্যানন
আই অ্যাম এ হিরো
অল অফ দেম আর জিরো
লা লা লাম্বা, লা লা লাম্বা
বা বা বাম্বা, বা বা বাম্বা
মাই নেম ইজ··· ···।'

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে ডি. কস্টার ভ্যান গিয়ে দাঁড়াল সেগুনবাগিচার একটা একতলা বাড়ির গেটের সামনে। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল সে। গেটের গায়ে নেমপ্লেট রয়েছেঃ এডভোকেট আশরাফ উদ্দীন।

খোলা গেট পেরিয়ে হন হন করে উঠন দিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল ডি. কস্টা। এডভোকেট আশরাফ সাহেব দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলেন বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে। সহাস্যে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন ডি. কস্টাকে। বললেন, 'আসুন, মি. ডি. কস্টা। বসুন।'

মুখোমুখি একটা কাঠের চেয়ারে বসল ডি. কস্টা। পকেট থেকে বের করল চুরুটের প্যাকেট। ধরাল একটা। নীল ধোঁয়া ছাড়ল উপর দিকে। তারপর জানতে চাইল, 'ইজ দেয়ার এনি নিউজ অফ ইওর সান, অর অফ দ্যাট এক্সট্রা অর্ডিনারী গুড বার্ড—দ্য শিকারী?'

আশরাফ সাহেব বিষণ্ন হাসলেন, 'না, নতুন কোন খবর নেই, মি. ডি. কস্টা। আমার শিকারীর অপেক্ষাতেই তো রোজ সারাক্ষণ এই বারান্দায় বসে থাকি আর আকাশ দেখি। কিন্তু কই, আর তো তার দেখা নেই। আমার কি সন্দেহ জানেন? সন্দেহ হয় শিকারী হয়তো মারা গেছে। কিংবা আমার ছেলেরা হয়তো কোন বিপদে পড়েছে, হয়তো—থাক। রাতদিন কত অশুভ কথা মনে হয়। ওদেরকে আর এজীবনে দেখতে পাব বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'নো-নো-নো-নো। দ্যাট ইজ ইমপসিবল! হাপনার শিকারী নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইটে পারিয়াছে। আর হাপনার ছেলে? টাহাকে হামি আনিয়া ডিব। বিলিভ মি,

হাপনি চিন্টা করিবেন না। মি. আশরাফ, হাপনি হাপনার ছেলেডেরকে রিটার্ন পাইবেন। হামি মি. স্যানন ডি. কস্টা, টাহাডেরকে উড্ঢার করিয়া আনিব।'

শিকারী কয়েক মাস পর পর হঠাৎ করে কোথাও থেকে আসে এ খবর আশরাফ সাহেবই দেশের খবরের কাগজগুলোর রিপোর্টারদেরকে জানিয়েছিলেন। প্রায় সব কাগজেই এই আশ্চর্য খবরটা ছাপা হয়েছিল। ফলে দেশবাসী জানে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা।

এদিকে আশরাফ সাহেব ঘোষণা করে দেশের গোয়েন্দাদেরকে জানিয়েছিলেন যে কেউ যদি তাঁর দুই সন্তানের সন্ধান দিতে পারেন তাহলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। কিংবা, কেউ যদি প্রমাণ দিয়ে জানাতে পারে শিকারী কয়েক মাস পর পর কোত্থেকে আসে তাহলে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

এই পুরস্কারের কথা শুনেই ডি. কস্টা ঘন ঘন আসা যাওয়া করতে শুরু করে এ বাড়িতে। মাঝে-মধ্যেই সে আসে, চা-পানির সদ্ব্যবহার করে এবং ফেরার সময় দু'চার টাকা গাড়ি ভাড়া চেয়ে নেয় আশরাফ সাহেবের কাছ থেকে। এবং বলা বাহুল্য, সে টাকায় বাংলা মদ কিনে খায়।

'মি. আশরাফ, প্রাইজের টেন ঠাউজেন্ট কিন্টু বড্ড কম। টাকার অ্যামাউন্টটা আরও বাড়াইয়া ডিন···।'

একজন পিয়নকে গেট পেরিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল ডি. কস্টা। পিয়নটা উঠন থেকে বারান্দায় উঠল লাফ দিয়ে। বলল, 'স্যার, আপনার টেলিগ্রাম। উগাণ্ডা থেকে এসেছে।'

'উগাণ্ডা থেকে টেলিগ্রাম!'

আশরাফ সাহেব অবাক হলেন। পিয়ন উত্তেজিত, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বলে উঠল, 'জ্বি, হ্যাঁ। উগাণ্ডা থেকেই এসেছে। আপনার নামই তো আশরাফ সাহেব? জানি, জানি। আপনার দুই ছেলেই বেঁচে আছে, স্যার। তারা, তাদের একজন···।'

ছোঁ মেরে টেলিগ্রামটা কেড়ে নিল ডি. কস্টা পিয়নের হাত থেকে। দ্রুত পড়ল সে টেলিগ্রামটা। সত্যি, উগাণ্ডা থেকেই এসেছে টেলিগ্রামটা। পাঠিয়েছে আশরাফ সাহেবের বড় ছেলে আবিদ।

আবিদের বক্তব্য বাংলা করলে এই রকম অর্থ দাঁড়ায়:

"বাবা,

তোমার দোয়ায় আমরা নিরাপদে কঙ্গোর গহীন জঙ্গল থেকে উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালায় পৌঁছেছি। কঙ্গোর জঙ্গলেই দেখা হয় আমার সাথে সোহরাবের—হ্যাঁ, আমরা তোমার দুই ছেলেই বেঁচে আছি। আগামী রবিবার দিন সোহরাব প্লেনে উঠবে ওর স্ত্রীকে নিয়ে। আমি জেনারেল ইদি আমিনের অনুরোধে আর একবার যাব কঙ্গোয়।

ফিরব কাজ শেষ করে। হয়তো কিছু দিন দেরি হবে, আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। দেশে একদিন না একদিন ফিরবই।"

টেলিগ্রামটা পড়া শেষ করে ডি. কস্টা বৃদ্ধ আশরাফ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো দু'গালে।

আনন্দে জল বেরিয়ে আসছে আশরাফ সাহেবের দু'চোখ বেয়ে। ডি. কস্টা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফর গডস্ সেক, ইউ আর এ লাকী ফাদার। ডিন আর একটা সিগারেট ডিন।'

'খবরটা তাহলে পত্রিকা অফিসে পৌঁছে দিতে হয়, কি বলেন?' রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললেন আশরাফ সাহেব।

ডি. কস্টা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'নো চিন্টা ডু ফুর্টি, মি. আশরাফ। হামি ঠাকিটে হাপনার ভরসা নাই, থুড়ি, হামি ঠাকিতে হাপনার কোন চিন্টা নাই। সব কাজ হামি করিয়া ডিব। ডিন, টাকা ডিন, সুইট মিট খাইব···।'

মিষ্টি খাবার টাকার জন্য হাত পেতে দিল ডি. কস্টা।

চার

উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালা।

জেনারেল ইদি আমিনের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। লোহার প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিজ গিজ করছে সশস্ত্র মিলিটারি পুলিস। গেট খুলে গেল। দ্রুত বেজে উঠল সাইরেন। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল হুডখোলা দুটো মিলিটারি জীপ। জীপের উপর দাঁড়িয়ে আছে অটোমেটিক কারবাইন হাতে চারজন করে সশস্ত্র সৈনিক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাদের চোখে।

জীপ দুটোর পিছনে নীল রঙের একটা মার্সিডিজ বেঞ্জ। গাড়িটার বুলেটপ্রুফ জানালার কাঁচ উঠানো। পিছনের সীটে বসে আছে নীল রঙের স্যুট পরে আবিদ এবং সোহরাব। সামনের সীটে, ড্রাইভারের পাশে একজন মিলিটারি পুলিস। তার হাতে স্টেনগান দেখা যাচ্ছে।

রাজধানীর ফাইভ স্টার হোটেল দ্যা মিরাকল-এর ভিতর ঢুকল জীপ দুটো। পিছু পিছু মার্সিডিজ।

জীপের সশস্ত্র লোকগুলো লাফ দিয়ে নামল নিচে। হোটেলের লাউঞ্জ থেকে দ্রুত নেমে এল আরও চারজন সশস্ত্র লোক। মার্সিডিজের দরজা খোলা হলো। ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবিদ নামল নিচে।

আবিদের দু'পাশে দাঁড়াল সশস্ত্র গার্ড। সিঁড়ি বেয়ে লাউঞ্জে উঠল আবিদ। সাথে মিলিটারি পুলিস। লিফটের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

ইতিমধ্যে মার্সিডিজ বেরিয়ে গেল সোহরাবকে নিয়ে হোটেল কম্পাউণ্ড ত্যাগ করে। নিজের বাড়ির উদ্দেশে চলেছে সোহরাব। রীতিমত চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

আজ রবিবার। আর একঘণ্টার মধ্যে প্লেনে চড়বে সোহরাব স্ত্রীকে নিয়ে। বাড়িটা উগাণ্ডা সরকার কিনে নিয়েছে ভালো দামে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ট্রান্সফার করে পাঠিয়ে দিয়েছে সে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে। ব্যবসার গুডউইলও বিক্রি হয়ে গেছে। সবই খুশির খবর।

জেনারেল ইদি আমিন দু'মণ সোনা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন প্রথম দিন। আবিদের সব শর্তই মেনে নিয়েছিলেন তিনি। ঠিক হয়েছে বিরাট একটা অভিযাত্রী দল নিয়ে আবিদ কঙ্গোর গহীন জঙ্গলে যাবে। উদ্ধার করে আনবে রহস্যপুরীর সমস্ত গুপ্তধন। আবিদ পুরস্কার স্বরূপ পাবে উদ্ধারকৃত স্বর্ণের শতকরা একভাগ।

সবই খুশির খবর। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে একটা। বিপদের ঘন কালো মেঘ কোত্থেকে যে উড়ে এল মাথার উপর!

কে এই লোক, যার নাম গ্রেট ম্যাজিশিয়ান? জেনারেল ইদি আমিনের মত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী লৌহমানবও ভয় পায় এই গ্রেট ম্যাজিশিয়ানকে। ভয় পেয়েছেন বলেই তিনি আজ সাবধানে থাকার অনুরোধ করেছেন আবিদকে। আবিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সশস্ত্র মিলিটারি নিয়োগ করেছেন হোটেলে, হোটেলের বাইরে।

গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের লেখা চিঠিটা পড়ে ভয় পেয়েছে আবিদও। চিঠিটা ইদি আমিনের প্রাইভেট সেক্রেটারির নামে এসেছে। চিঠির বক্তব্য হলো ঃ আবিদকে এঁকে দিতে হবে কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে অবস্থিত রহস্যপুরীর নকশা। এটা গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের আদেশ। এই আদেশ অমান্য করলে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে আবিদকে।

সোহরাব নতুন বিপদ দেখা দেয়ায় দেশে ফিরে যেতে রাজি হয়নি এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু আবিদ বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করিয়েছে তাকে। তার বক্তব্য ঃ বিপদ যদি আসেই, একজনের উপর আসুক।

হোটেল মিরাকলের ফিফথ ফ্লোরের ছয়শো এগারো নম্বর রুমের বাইরে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। জেনারেল ইদি আমিন কড়া নির্দেশ দিয়েছেন—আবিদের কোনরকম শারীরিক ক্ষতি ঘটলে কারও রক্ষা থাকবে না।

কিন্তু স্বয়ং ইদি আমিনই গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের চিঠি পেয়ে আতঙ্ক বোধ করছেন। তাঁর ভাষায় ঃ এই গ্রেট ম্যাজিশিয়ান পারে না এমন কাজ নেই। দিনে দুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে সে একাধিকবার। সাত তলা বিল্ডিং থেকে লাফ মেরে রাস্তায় পড়েছে সে, কিছুই হয়নি তার, দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। আবার তাকে দেখা গেছে ক'দিন পরেই রাজধানীতে। কোন কোটিপতির বাড়িতে সে হানা দিয়েছে খালি হাতে, কেড়ে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ

টাকা। জাদু জানে লোকটা। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে লোকটাকে জীবিত বা মৃত ধরে দেবার জন্য। ধরা তো দূরের কথা, কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারেনি কেউ। বড় ভয়ঙ্কর ক্ষমতা লোকটার। যা বলে তা পালন করে অক্ষরে অক্ষরে।

'উভয় সংকট একেই বলে!'

নরম কার্পেট বিছানো রুমের মেঝেতে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করে কথাটা বলল আবিদ। সত্যি, বিপদ, অজগর সাপের মত পেঁচিয়ে ধরতে চাইছে তাকে। জেনারেল ইদি আমিন জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রেট ম্যাজিশিয়ানকে সে যদি রহস্যপুরীর নকশা এঁকে দেয় তাহলে চরম শাস্তি পেতে হবে তাকে—মৃত্যুদণ্ড।

এদিকে গ্রেট ম্যাজিশিয়ান রহস্যপুরীর পথের সন্ধান না পেলে হুমকি দিয়েছে হত্যা করবে তাকে।

ভাবছিল আবিদ। কে এই গ্রেট ম্যাজিশিয়ান? সত্যিই কি তার ক্ষমতা জাদুকরদের মত? অনেক গল্প শুনেছে সে এই ক'দিনে। সব কি সত্যি?

গ্রেট ম্যাজিশিয়ান যে-ই হোক, ক্ষমতা তার যতই থাক, রহস্যপুরীর নকশা সে কাউকে দেবে না। জেনারেল ইদি আমিনের নির্দেশে রহস্যপুরীর স্বর্ণ উদ্ধার করতে রওনা সে হবে ঠিকই, কিন্তু উদ্ধার করার চেষ্টা সেখানে গিয়ে করবে কিনা তা এখনও ঠিক করেনি। কঙ্গোর গহীন অরণ্যে যেতে তাকে হবেই।

লিজা রয়েছে সেখানে। তাকে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে আবিদ। গরিলাদের বুক ফাটা আকুল কান্না দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল আবিদ রওনা হবার দিন। তার কোন কথাই তারা শুনছিল না। বুকে চাপড় মেরে গগনবিদারী শব্দে বনজঙ্গল কাঁপিয়ে তারা বিলাপ করছিল দুর্বোধ্য ভাষায়, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল কালো লোমশ বুক।

শেষ পর্যন্ত লিজাই প্রস্তাবটা দেয়, 'আমি থেকে যাই। আবার তো তুমি আসবে। তখন যাব? এরা আমাদের জীবন রক্ষা করেছে—এদেরকে কাঁদিয়ে গেলে অমঙ্গল হবে।'

লিজা থাকবে জানতে পেরে রফিকীর দল কান্না থামায় শেষ পর্যন্ত।

লিজাকে নিয়ে আসার জন্য যেতেই হবে তাকে। এবং সেখানে যেতে হলে জেনারেল ইদি আমিনের সহযোগিতা একান্ত দরকার। কিন্তু তার মানে এই নয় রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে জেনারেল ইদি আমিনের জন্য। রহস্যপুরীতে যত বড় মিলিটারি ফোর্সই পাঠানো হোক, আবিদের বিশ্বাস, সেখান থেকে ফেরা কারও পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না।

শিকারী বসে আছে জানালার উপর। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

শিকারীকে আদর করল অন্যমনস্কভাবে। নিচের দিকে তাকাল একবার। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার দৃষ্টি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে হোটেলের পিছনের অংশটা দেখা যাচ্ছে। ফুলের বাগান পিছন দিকটায়। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল আবিদ।

ঠাণ্ডা বরফের মত হয়ে গেল তার শরীর আতঙ্কে।

বাগানে দুজন মিলিটারি পুলিস হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। দুজনের বুকই ভেসে যাচ্ছে লাল রক্তে।

ঢোক গিলল আবিদ। খানিক আগে লোক দুজনকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছে ও। ইতিমধ্যে খুন করল কে ওদেরকে?

গ্রেট ম্যাজিশিয়ান?

ভয়ে হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চাইছে পেটের ভিতর। আসছে, আসছে গ্রেট ম্যাজিশিয়ান! মন বলছে তার। সাবধান, আবিদ? যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেলো, সময় নেই হাতে, তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে আসছে আজরাইল···।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগল আবিদ।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। মরতে তাকে হবেই, বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না তার। মরার আগে রহস্যপুরীর সঠিক নকশা এঁকে রেখে যাওয়া দরকার। একমাত্র সেই জানে ঠিক কোথায় অবস্থিত এই রহস্যপুরী।

তড়াক করে লাফিয়ে জানালাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল আবিদ। দ্রুত বন্ধ করল বাকি দুটো জানালা। তারপর বাথরুমে যাবার এবং করিডরে বেরুবার দরজা দুটোয় তালা লাগাল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজ কলম বের করল আবিদ দ্রুত। কলম দিয়ে আঁকতে লাগল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে একটা ম্যাপ।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে নকশাটা আঁকল আবিদ। নিখুঁত হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। এই নকশা যার হাতে পড়বে সে-ই পৌঁছুতে পারবে রহস্যপুরীতে।

একটা জানালা খুলে দিয়ে নকশাটা ভাঁজ করতে শুরু করল আবিদ। দুভাঁজ, চারভাঁজ তারপর আট ভাঁজ করল কাগজের টুকরোটাকে। সুতো দিয়ে বাঁধল সেটা। সুতোর ফাঁদ তৈরি করে সেটা গলিয়ে দিল শিকারীর গলায়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবিদের মুখ।

'দেশে ফিরে যাবি তুই। বাবার কাছে।'

শিকারীর উদ্দেশে কথাটা বলে হঠাৎ কান খাড়া করল আবিদ। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে।

খুট খাট শব্দ হচ্ছে ঠিক তার পিছনে।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল আবিদ পিছন দিকে।

হাঁ হয়ে গেল অবিদের মুখ। একি স্বপ্ন দেখছে সে? কে ওই লোক বসে রয়েছে চেয়ারে তার দিকে পিছন ফিরে?

'আমি এসেছি এইমাত্র। আমি কে তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ? কেন এসেছি তাও জানো, তাই না?'

আবিদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। কোত্থেকে এল এই লোক? দরজায় ভিতর থেকে তালা দেয়া। জানালাগুলো সব বন্ধ একটি ছাড়া। খোলা জানালার গ্রিলও যেমন ছিল তেমনি আছে। আগে থেকে এই রুমে লুকিয়েও ছিল না। সশস্ত্র মিলিটারি পুলিসরা তার সামনে সার্চ করেছে রুমটা। তাহলে—সত্যি কি লোকটা জাদু জানে?

এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে আবিদের দিকে তাকাল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, 'কথা বলছ না যে? নকশাটা আঁকো।'

হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠল আবিদ। মরতে তাকে হবেই, বুঝতে পারল সে। মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। ব্যস, সব ভয় দূর হয়ে গেল মন থেকে। বলল, 'নকশা? সে তো এঁকে ফেলেছি আমি।'

চেয়ার ছেড়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, 'কোথায়! দেখি!'

'এতই সহজ? দেখি বললেই দেখাব ভেবেছেন?'

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, 'বড় সাহসের সাথে কথা বলছ দেখি, ছোকরা! নকশাটা কি ইতিমধ্যে পাচার করে দিয়েছ?'

আবিদ বলল, 'না! নকশাটা এখনও এই ঘরের ভিতরই আছে। তবে যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে যাবে এ ঘর থেকে। মোট কথা নকশাটা আপনার হাতে পড়ছে না।'

দ্রুত রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। শিকারীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তার। পা বাড়াল সে দ্রুত জানালার দিকে।

'শিকারী, উড়ে যা!'

আবিদের কথা শেষ হওয়ামাত্র শিকারী জানালা গলে বেরিয়ে গেল ফুড়ুৎ করে।

হাঃ হাঃ হা করে হেসে উঠল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। বিকট কণ্ঠে হাসতেই থাকল সে। সারা শরীরে ভয়ের কাঁটা দেখা দিল আবিদের। হাসি থামিয়ে সুদর্শন গ্রেট ম্যাজিশিয়ান বলে উঠল, 'নকশা চলে গেল বাংলাদেশে, কেমন? তুমি এত বড় বোকা ভাবিনি। গাধার মত হলো না কি কাজটা? নকশা না হয় পাঠালে, কিন্তু নিজের ব্যবস্থা কি করলে তুমি?'

আবিদ বলে উঠল, 'আমি মরতে প্রস্তুত।'

'দূর, গাধা। মারব কেন তোমাকে? তুমি মরলে তো সবই ফুরিয়ে যাবে। নকশার জনক তুমি। একটা এঁকেছ, আরেকটা আঁকতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আঁকব না, কেউ আমাকে দিয়ে আর একটা নকশাও আঁকাতে পারবে না।'

'আমি পারব। টরচার মেশিনের ভিতর তোমাকে ঢুকিয়ে দিলেই তুমি বাপ বাপ করে এঁকে দেবে। শুধু রহস্যপুরীর নকশাই নয়, আমি চাইলে তুমি তোমার বাপের, সারা দুনিয়ার, স্বর্গের, নরকের নকশাও আঁকতে রাজি হবে। চলো।'

'কোথাও যাব না আমি।'

পা বাড়াল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, 'তুমি যেতে চাইবে না সে তো আমি জানি। জোর করে নিয়ে যাব তোমাকে। এখনও কি তুমি আমার ক্ষমতার প্রমাণ পাওনি? বন্ধ ঘরের ভিতর বাতাসের সাথে ঢুকতে পারলাম—দেখলে তো নিজের চোখেই। এখনও বুঝতে পারছ না আমার ক্ষমতা কতটুকু?'

দরজায় ঘনঘন করাঘাত পড়ছে।

'দরজাটা খুলে দাও, আবিদ। দেখা যাক, তোমার গার্ডরা তোমাকে রক্ষা করতে পারে কি না। ভয় নেই, কিছু বলব না আমি, দরজা খোলো। তোমাকে একটা চান্স দিচ্ছি আমি।'

পা বাড়াল আবিদ। দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে রুমের ভিতর ঢুকল চার পাঁচজন স্টেনগানধারী সেন্ট্রি।

'এই লোকটাই গ্রেট ম্যাজিশিয়ান···।'

আবিদের কথা শেষ হবার আগেই গর্জে উঠল একযোগে চারটি স্টেনগান। সেইসাথে গগন-বিদারী কণ্ঠে হাসির শব্দ উঠল রুমের ভিতর—হাঃ হাঃ হাঃ হা···।

স্টেনগানের শব্দ থামল। থামল গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের হাসির শব্দ। সে বলল, 'কি হলো, আবিদ মিয়া, চান্স পেয়েও কাজ হলো না, তাই না? তোমার কপাল খারাপ! এবার দেখো, আমার রিভলভার কি সুন্দর কাজ দেখায়।'

ধীরে ধীরে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে সেন্ট্রি চারজনের দিকে তুলল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান।

সেন্ট্রিরা ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের দিকে। লোকটা মানুষ না ভূত? একটা বুলেটও বিদ্ধ হয়নি শরীরে—এ কেমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

রিভলভার গর্জে উঠল পরপর চারবার।

লুটিয়ে পড়ল চারজন সেন্ট্রি। লোহার মত শক্ত হাতে আবিদের একটা হাত ধরল গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, 'চলো, মিয়া! তুম মেরা মেহমান!'

পাঁচ

ঢাকা।

প্রখ্যাত শখের গোয়েন্দা শহীদ খানের গুলশানের বাড়ি।

রাত আড়াইটা।

দোতলার সবগুলো ঘরের আলো নিভে গেছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন লীনার কামরায় লীনা। মহুয়ার বেডরুমে একা ঘুমাচ্ছে মহুয়া। শহীদ সেখানে নেই।

সন্দেশ এবং লেবু কিচেনের পাশের ঘরে শুয়ে আছে। দুইজনের নাক ডাকছে দুই স্কেলে।

আলো জ্বলছে ড্রয়িংরুমে।

ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল শহীদ। কিন্তু ভূতের গল্পের বইয়ের

পাতা থেকে দৃষ্টি সরাল না। বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ এটা। দারুণ ইন্টারেস্টিং! সময়ের হিসেব ভুলে পড়ে চলেছে সে তুমুল বেগে।

ফর্‌র্‌র্‌···ফর্‌র্‌র্‌···!

চমকে উঠল শহীদ। মুখ তুলে তাকাল। হাসি পেল ওর। ভূতের গল্প পড়লে একটু শব্দ হলেই মানুষ চমকে ওঠে! শব্দটা তেলাপোকার। জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে দুটো তেলাপোকা।

আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল শহীদ।

ফর্‌র্‌র্‌···ফর্‌র্‌র্‌···ফর্‌র্‌র্‌···

ঘরের চারদিকে উড়ছে তেলাপোকাগুলো। বিরক্তির সাথে আবার মুখ তুলল শহীদ। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। আরে, এ যে অনেক তেলাপোকা!

ফর্‌র্‌র্‌···ফর্‌র্‌র্‌···

দ্বিতীয় জানালার দিকে তাকাল শহীদ। কী আশ্চর্য! দুই জানালা দিয়েই যে তেলাপোকা ঢুকছে। তিন এবং চার নম্বর জানালার দিকেও স্বভাবতই তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে ও।

সিগারেটটা পড়ে গেল ঠোঁট থেকে কার্পেটের উপর। সর্বনাশ! একি বিদঘুটে কাণ্ড! এত তেলাপোকা আসছে কোত্থেকে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি!

রুমের চারদিকে ফর্‌র্‌র্‌···ফর্‌র্‌র্‌···করে উড়ে বেড়াচ্ছে ডজন তিনেক তেলাপোকা। দেখতে দেখতে ভরে যাচ্ছে ঘর। আরও ঢুকছে। হাঁটতে হাঁটতে, উড়তে উড়তে দলে দলে, শয়ে শয়ে তেলাপোকারা আসছে রুমের ভিতর।

হঠাৎ লেবুর চিৎকার ভেসে এল অন্দরমহল থেকে, 'ই···ই···ই।'

পরমুহূর্তে শোনা গেল সন্দেশের গলা, 'দু···দু···দুর।'

লেবু এবং সন্দেশ এরপর একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইঁদুর! ইঁদুর!'

ব্যস্ত হয়ে উঠল শহীদ। তেলাপোকারা বসছে ওর কাঁধে, ঘাড়ে, মাথায়। পা বেয়ে উঠছে গায়ে। উড়তে উড়তে ধাক্কা খাচ্ছে ওর শরীরে। বিচ্ছিরী আঠা লেপটে যাচ্ছে ওর শরীরে।

লীনা চেঁচাচ্ছে না? হ্যাঁ, লীনার গলা।

'ভাবী! ভাবী! তেলাপোকা আসছে কোত্থেকে হাজারে হাজারে···!'

মহুয়ার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল বেডরুম থেকে, 'শহীদ! শুনছ তুমি? বাঁচাও! বাঁচাও! শয়ে শয়ে ইঁদুর ঢুকছে ঘরের ভিতর···মাগো।'

শোরগোল উঠল রাত দুপুরে বাড়ির সর্বত্র। হুলস্থুল কাণ্ড। বিপদের গুরুত্ব টের পেলেও হাসি দমন করতে পারল না শহীদ। আপন মনে খানিক হাসল সে। তেলাপোকা, ইঁদুর—ব্যাপার কি? কী ধরনের উপদ্রব এসব? কেউ যেন রসিকতা করার ইচ্ছা নিয়ে পাঠাচ্ছে···।

নিভে গেল শহীদের মুখের হাসি। জানালা দিয়ে পিল পিল করে ঢুকছে ছোট

ছোট লাল পিঁপড়ে। পানি যেমন গড়িয়ে পড়ে তেমনি সাদা হোয়াইট ওয়াশ করা দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে হাজার হাজার লাখ-লাখ পিঁপড়ে।

'তুমি কোথায়? শহীদ!'

মহুয়া চেঁচাচ্ছে। সেই সাথে ভেসে আসছে পাশের ঘরগুলো থেকে চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ার শব্দ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ সোফা ছেড়ে। ক্রেডল থেকে তুলে নিল রিসিভারটা। অতি পরিচিত নাম্বারে ডায়াল করল দ্রুত। তারপর বলল, 'কামাল! উই আর ইন ডেঞ্জার। এক্ষুণি চলে আয় বাড়িতে।'

কামালকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ। দরজা খুলে ফেলল ও। সাথে সাথে পিছিয়ে এল দু'পা। নেংটি ইঁদুর গণ্ডা চার-পাঁচ লাফাতে লাফাতে করিডর থেকে ঢুকে পড়ল ড্রয়িংরুমের ভিতর।

রসিকতা, কোন সন্দেহ নেই, ভাবল শহীদ। কিন্তু রসহীন রসিকতা, স্বীকার করতেই হবে। করিডর ধরে ছুটল ও।

বেডরুমের দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে শহীদ দেখল মহুয়া দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপর। মেঝেতে ছুটোছুটি করছে নেংটি ইঁদুরগুলো। ফর্‌র্‌র্‌...ফর্‌র্‌র্‌... করে উড়ছে চারদিকে তেলাপোকার দল।

লাফ দিয়ে পড়ল মহুয়া। তাল সামলাতে না পারলে পড়ে যেত ওরা দুজনেই কার্পেটের উপর। শূন্য থেকেই মহুয়াকে ধরে ফেলল শহীদ।

তারস্বরে চিৎকার করছে মহুয়া। আঁকড়ে ধরেছে শহীদকে দুই হাত দিয়ে। শহীদ ধমকে উঠল, 'থামো! অমন চেঁচালে লাভ হবে কিছু?'

শহীদ কিন্তু আর হাসছে না। রীতিমত গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

'লীনা চেঁচাচ্ছে!' বলে উঠল মহুয়া হাঁপাতে হাঁপাতে। শহীদ মহুয়াকে তুলে দিল আবার টেবিলের উপর। আসছি বলে বেরিয়ে গেল ও রুম থেকে।

করিডরে বেরিয়ে শহীদ দেখল ঝাড়ু হাতে তেলাপোকা মারতে মারতে লেবু আর সন্দেশ ছুটে আসছে।

'দা-দা-দা-দাদা—'

'ম-ম-মণি!'

শহীদ বলল, 'ছাদে গিয়ে ওঠ সবাই তোরা।'

লীনা দরজা খুলে তীর বেগে ছুটে আসছে শহীদের দিকে।

'থাম, থাম। পড়ে যাবি যে!'

শহীদ লীনাকে ধরে ফেলল। হাঁপাচ্ছে লীনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পিঁপড়েও...!'

মহুয়াকে নিয়ে এল শহীদ। করিডরেও তেলাপোকা উড়ছে, ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। পিঁপড়ে অবশ্য নেই। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা।

কয়েকটা ধাপ টপকে থমকে দাঁড়াল শহীদ।

'মাগো!'

চেঁচিয়ে উঠল গালে হাত চাপা দিয়ে মহুয়া। দু'চোখে তার আতঙ্ক। লীনা জড়িয়ে ধরল মহুয়াকে, 'ডাবী—বাড়ি ছেড়ে পালাই চলো।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে লাখ লাখ পিঁপড়ে।

পিছিয়ে এল শহীদ। বলল, 'মহুয়া, সাহস হারিয়ো না। তোমরা সবাই নিচে নেমে গ্যারেজের দিকে ছোটো। গাড়িটা বের করা হয়তো সম্ভব এখনও। কামালের বাড়িতে চলে যাও সবাই। যাও, দেরি কোরো না।'

ছুটল সবাই করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে।

দ্রুত ফিরে এল শহীদ ড্রয়িংরুমে। কার্পেটের উপর পিঁপড়ের সমুদ্র তৈরি হয়ে গেছে। লাফ মেরে একটা সোফায় উঠল ও। ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল নিকটবর্তী দমকল বাহিনীর অফিসে।

ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে ছুটল শহীদ। নিচে নেমে বেরিয়ে এল বাড়ির সামনের উঠনে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে ওর ফোক্সওয়াগেনটা।

তিন মিনিট পর সেই খোলা গেট দিয়েই ঢুকল একটা মোটর সাইকেল। স্টার্ট বন্ধ করে দ্রুত নামল কামাল। উঠনে শহীদের পাশে এসে দাঁড়াল সে, 'কি ব্যাপার? মহুয়াদি ওদেরকে নিয়ে গেল কোথায় এত রাতে?'

'পালাল, তোর ওখানে।'

কামাল অবাক, 'পালাল মানে? হেঁয়ালি করছিস রাত দুপুরে?'

শহীদ বলল, 'আমাদের ওপরতলা শত্রু কবলিত। পিঁপড়ে বাহিনী, কয়েক ব্রিগেড তেলাপোকা, দশ কিংবা পনেরো ব্যাটালিয়ান ইঁদুর একযোগে আক্রমণ করছে। বিশ্বাস না হয়, আয় আমার সাথে। নিজের চোখেই দেখবি।'

সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল শহীদ। কামাল অনুসরণ করল তাকে। দোতলার আলোকিত করিডরে পা দিয়েই আঁতকে উঠল কামাল, 'একি কাণ্ড!'

করিডরে পিঁপড়েদের ভোজনপর্ব শুরু হয়েছে। আহত এবং নিহত তেলাপোকাদের উপর চড়াও হয়েছে পিঁপড়ে বাহিনী। হাজারে হাজারে দলবদ্ধ ভাবে তারা তেলাপোকাদের পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে নানাদিকে। মেঝেতে, দেয়ালে এই একই দৃশ্য। অবশ্য মাথার উপর ফর্‌র্‌র্‌...ফর্‌র্‌র্‌...করে উড়ে বেড়াচ্ছে এখনও অসংখ্য তেলাপোকা।

নিচ থেকে ঢং ঢং শব্দ ভেসে এল। দমকলবাহিনীর গাড়ি এল। আবার নিচে নেমে এল শহীদ এবং কামাল। দমকল অফিসারকে সমস্যাটা বুঝিয়ে দিতে যা দেরি, কর্মীবাহিনী নিয়ে তিনি কাজে নেমে পড়লেন। পানির পাইপ সিঁড়ি দিয়ে তুলতে শুরু করল কর্মীরা দোতলায়।

কামাল হেলান দিয়ে দাঁড়াল তার মটরসাইকেলে। শহীদ ধীরে-সুস্থে পায়চারি

করছে।

'এই বিদঘুটে ঘটনার তাৎপর্য কি তাহলে?'

শহীদ দাঁড়াল। বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে ওদের দু'জনকে। খানিক পর শহীদ বলল, 'খুবই রহস্যময় ব্যাপার। দু'চারজন মানুষের পক্ষে এত ইঁদুর, এত তেলাপোকা, এত পিঁপড়ে নিয়ে এসে বাড়ির দোতলায় ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। বিশ-পঁচিশজন মানুষের পক্ষেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমি তো জেগেই ছিলাম। ছাদে বা সিঁড়িতে কেউ এলে শব্দ পেতাম।'

কামাল বলল, 'ভৌতিক ব্যাপার দেখছি!'

দমকলবাহিনী সফলতার সাথে দোতলা থেকে শত্রুর বংশ ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছে ভোর পাঁচটায়।

মহুয়ারা ফিরে এসেছে সাড়ে ছয়টায়। ব্রেকফার্স্ট সেরে কামাল এবং শহীদ ড্রয়িংরুমে বসে আছে। দুজনেই চিন্তামগ্ন।

এমন সময় ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'হ্যালো, শহীদ। চিন্তিত মনে হচ্ছে তোমাদেরকে?'

'আপনি কোত্থেকে খবর পেলেন,' জানতে চাইল কামাল।

ধপ করে একটা সোফায় বসলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'কিসের খবর? আমি এলাম উর্বশী গ্রাম থেকে। সারারাত ছুটোছুটি করেছি গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি।'

'কেন?'

'কুয়াশা উর্বশী গ্রামের গরীব মানুষদের সাহায্য দেবে রাতের বেলা গোপনসূত্রে এই খবর পেয়ে দলবল নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'সাহায্য দিয়েছে কুয়াশা?'

'হ্যাঁ। দুশো করে টাকা, একমণ করে চাল পেয়েছে প্রতিটি পরিবার। কিন্তু কোথাও তার বা তার দলের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। যেখানে যাই, শুনি এইমাত্র সাহায্য দিয়ে সে অমুক দিকে চলে গেছে। আবার ছুটি। কিন্তু ছোটাছুটিই সার, কাজ হলো না। তা কিসের খবরের কথা বললে তুমি, কামাল?'

শহীদ সবিস্তারে গতরাতের ঘটনা বলল। 'এ ঠিক সেই ডি. কস্টার কাজ।'

'মানে? ডি. কস্টাকে সন্দেহ হচ্ছে কেন আপনার?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'চার-পাঁচদিন আগে একটা ভ্যান নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম আমি তাকে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তার ভ্যান। ভ্যানে ছিল অনেকগুলো কাঠের বাক্স। একটা বাক্স পড়ে গিয়েছিল রাস্তার উপর। সেটা থেকে বেরিয়ে আসছিল অসংখ্য তেলাপোকা।'

'কি সাংঘাতিক! ডি. কস্টা বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি!' কামাল খেপে উঠল।

শহীদ বলল, 'মাথা গরম করিসনে। ডি.কস্টার সাহস বা বুদ্ধি অতটা নেই, কামাল।'

কামাল বলল, 'ডি. কস্টা তাহলে তেলাপোকার বাক্স নিয়ে···।'

শহীদ বলল, 'আমার বিশ্বাস, ডি. কস্টাকে জেরা করলে কিছু তথ্য সে দিতে পারবে। তার বেশি তার কাছ থেকে আশা করা বৃথা। আমার আরও কি বিশ্বাস জানিস? কিছু তথ্য আমরা পাব ছাদ থেকে। আমি লক্ষ্য করেছি ইঁদুর, তেলাপোকা এবং পিঁপড়েগুলো নেমে এসেছে দেয়াল বা সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকেই।'

'এতক্ষণ বলিসনি কেন! চল তাহলে, ছাদটা পরীক্ষা করে আসি।'

সাগ্রহে উঠে দাঁড়ালেন কামালের সাথে মি. সিম্পসনও, 'চলো তো দেখা যাক।'

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলল শহীদ। এক মুহূর্ত পর সে রিসিভারটা এগিয়ে ধরল মি. সিম্পসনের দিকে, 'আপনার ফোন। আপনি এখানে আছেন কিনা জানতে চাইছে ইন্সপেক্টর জেনারেল অভ পুলিসের সেক্রেটারি।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন।

সিগারেট ধরাল শহীদ।

'শহীদ, দুঃখিত। তোমাদের সাথে ছাদে যেতে পারছি না আমি। ইন্সপেক্টর জেনারেল এই মুহূর্তে দেখা করতে বললেন আমাকে। জেনারেল ইদি আমিনের একটা মেসেজ এসেছে প্রেসিডেন্টের কাছে। সেই মেসেজ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি আলাপ করতে চান।'

'জেনারেল ইদি আমিনের মেসেজ?'

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল শহীদ। তারপর বলল, 'এডভোকেট আশরাফ উদ্দীনের দুই ছেলের এক ছেলে—কি যেন নাম—হ্যাঁ, সোহরাবের না গতকাল প্লেনে চড়ার কথা?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ। আজ দুপুরে ল্যাণ্ড করার কথা সেই প্লেন ঢাকা এয়ারপোর্টে। বেলা একটায়।'

ঘড়ি দেখল শহীদ। দশটা বাজে।

কামাল বলল, 'সোহরাবের আগেই এল জেনারেল ইদি আমিনের মেসেজ। মেসেজটা কি পলিটিক্যাল, না, আবিদ সোহরাব দুই ভাই সংক্রান্ত?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সে কথা জানাবার জন্যই ডাকা হয়েছে আমাকে। চলি, শহীদ। খবর দেব সুযোগ হলেই।'

ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন মি. সিম্পসন দ্রুত।

কামাল বলল, 'চল, শহীদ, ছাদে যাই।'

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'চল।'

ছাদে উঠে এল ওরা। সিঁড়ির শেষ ধাপ দুটোর উপরে একটা কাঠের মাচা আছে অনেক দিন থেকে। সেই মাচায় টুকিটাকি ব্যবহারের অযোগ্য বহু জিনিস ফেলে রাখা হয়েছে। ছাদে গিয়েও কি মনে করে ফিরে এসে সিঁড়ির উপরের সেই মাচায় উঠল শহীদ। কামাল ছাদে গিয়ে চারদিক দেখে নিল ভাল করে। তার পর প্রকাণ্ড ছাদটার এক প্রান্ত থেকে হাঁটতে শুরু করল। পরিষ্কার ছাদ। কোথাও কিছু নেই। বৃথা খোঁজাখুঁজি। পুরো ছাদটা চক্কর মেরে সিঁড়ির কাছে ফিরে এল সে।

শহীদ তখন মাচা থেকে নামছে।

কামাল বলে উঠল, 'কিছুই তো নেই রে···।'

শহীদের হাতে অদ্ভুত ধরনের একটা যন্ত্রের মত জিনিস দেখে মাঝপথে থেমে গেল কামাল।

'কি রে ওটা?'

জিনিসটা অনেকটা ছোট আকারের ছাতা বা টেবিল ল্যাম্পের শেডের মত দেখতে। ধাতব পদার্থের তৈরি মূল্যবান কোন যন্ত্র। চকচক করছে গা। দেখলেই বোঝা যায় জিনিসটা ভারী। আটটা ইস্পাতের সরু শিক বেরিয়ে এসেছে বাইরে যন্ত্রটার ভিতর থেকে। যন্ত্রটার গায়ে হাঁটছে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে।

'এটা পেলাম মাচার উপর। একটা চটের ছেঁড়া বস্তার ভেতর কেউ লুকিয়ে রেখেছিল।'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কি? এল কোত্থেকে?'

'কি, কোত্থেকে এল তা কি এই মুহূর্তে বলা সম্ভব? তবে শত্রু বাহিনী অর্থাৎ ইঁদুর, পিঁপড়ে, তেলাপোকার আগমনের সাথে এই যন্ত্রের কোন না কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'বলিস কি!'

কিন্তু শহীদ আর কোন কথা বলল না। ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে।

নেমে এসে বসল ওরা ড্রয়িংরুমে। খানিক পরই মি. সিম্পসনের ফোন এল। তিনি বললেন, 'শহীদ, বিপদ দেখা দিয়েছে। জেনারেল ইদি আমিনের মেসেজ সম্পর্কে আমরা তোমার সাথে এখুনি আলোচনায় বসতে চাই। তুমি এখুনি চলে এসো ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে। আর শোনো, তোমার বাড়িতে ইঁদুর-পিঁপড়ের উপদ্রবের কথা শুনে আমার কেন যেন সন্দেহ হয়েছিল এ কাজ সেই শয়তান প্রফেসর ওয়াই-এর ছাড়া আর কারও না। কিন্তু এখানে এসে জেনারেল ইদি আমিনের মেসেজ পড়ে ভুল ভেঙে গেছে আমার। উপদ্রবের কারণ শয়তান প্রফেসর ওয়াই নয়। কারণ সে এই মুহূর্তে উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালায় তেলেসমাতি কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে। সব কথা তোমার জানা দরকার। চলে এসো এখুনি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ। সব কথা কামালকে জানাল ও। কামাল বলল,

'আমার সন্দেহ ডি. কস্টা অনেক কথা জানে এই পোকা-মাকড় পাঠাবার ব্যাপারে। হয়তো তারই কীর্তি এসব। শহীদ, যন্ত্রটা আমাকে দে। আমি ডি. কস্টার হোটেলে একবার যাই ওটা নিয়ে।'

বাড়ি থেকে বেরুল ওরা। দু'জন রওনা হলো দু'দিকে।

'এত টাকা তুমি পেলে কোথায় মি. ডি. কস্টা?'

'ফের টুমি?' গর্জে উঠল ডি. কস্টা।

'সরি। এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি?' দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করল মান্নান।

ডি. কস্টা টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা কাত করতে করতে বলল, 'বিজনেস করিয়া আর্ন করিয়াছি।'

'কি বিজনেস?'

'সেটা আমার বিজনেস সিক্রেট! কাহাকেও বলিটে পারি না। ওসব কঠা ঠাক, ডোস্ট। এসো, ড্রিঙ্ক করি। বিলাতী মাল আছে। ওয়েট, বের করিটেছি।'

ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে দুটো গ্লাস এবং একটি জনিওয়াকারের বোতল বের করে আনল ডি. কস্টা। নিচু টেবিলের উপর গ্লাস দুটো রাখল। ছিপি মুক্ত করে বোতল থেকে মদ ঢালল অতি যত্ন সহকারে।

'পান করো, মি. মান্নান। এমোন চান্স আর কোঠাও পাইবে না।'

এমন সময় দরজার গায়ে টোকা পড়ল।

ডি. কস্টাকে হোটেলে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কুয়াশা বেশ কিছুদিন হলো। মি. সিম্পসন এবং তাঁর বাহিনী নতুন করে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে আবার কুয়াশার পিছনে লাগায় কুয়াশা এই ব্যবস্থা নিয়েছে। ডি. কস্টা বা তার অন্য সব সহকারীকে অনুসরণ করে মি. সিম্পসন যাতে তার কোন আস্তানার সন্ধান পাবার চেষ্টা না করেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কুয়াশা তার সহকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে টেলিফোন বা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে।

'কে? হু ইজ দেয়ার?'

বাইরে থেকে কামালের গলা ভেসে এল, 'দরজাটা খোলো, ডি. কস্টা।'

ডি. কস্টা একটু গম্ভীর হলো। বিড় বিড় করে বলল, 'আপড আসিয়াছে। মি. মান্নান, দরজাটা খুলিয়া ডাও, ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড!'

দরজা খুলে দিল মান্নান। কামালকে দেখে ডি. কস্টা আনন্দে আত্মহারা হবার ভান করল। সহাস্যে বলল, 'হোয়াট এ লাকী পারসন আই অ্যাম! নিজের গুডলাক ডেখিয়া নিজেরই হিংসা হইটেছে। তা মহারথীর কি হেটু আগমন? আসুন, সীট ডাউন, মি. কামাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট অব দা গ্রেট ডিটেকটিভ মি. শহীদ খান···।'

কামাল বলল, 'থামো, ডি. কস্টা। তোমার বোয়াল মাছের মুখটা বন্ধ করো একবার।'

কামাল বসল একটা চেয়ারে।

'ইনসালটিং কঠা বলবেন না, মি. কামাল। হামার মাউথ বোয়াল মাছের মটো নয়।' ডি. কস্টা গম্ভীর।

কামাল বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। কাজের কথায় এসো দেখি। কোথায় যাচ্ছিলে সেদিন ভ্যানে তেলাপোকার বাক্স নিয়ে? অস্বীকার কোরো না ডি. কস্টা। তাতে ফল ভাল হবে না। আমি সব জানি।'

কামাল হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে।

'অস্বীকার করিব কোন ডুঃখে? পিঁপড়া, আরশুলা লইয়া হামি বিজনেস করি। ইঁডুর লইয়া হামি বিজনেস করি। সাপ, পয়জনাল স্নেক লইয়া হামি বিজনেস করি। অস্বীকার করিবার কি ঠাকিটে পারে, মি. কামাল?'

কামাল বলল, 'ব্যবসা করো? কোত্থেকে সংগ্রহ করো ওসব? কে কেনে, মানে, কার কাছে বিক্রি করো তুমি?'

'টা বলিটে রাজি নই। বিজনেস সিক্রেট।'

ডি. কস্টার কথা শেষ হবার সাথে সাথে উপর থেকে থপ্ থপ্ শব্দে দুটো কুচকুচে কালো সাপ পড়ল মেঝেতে।

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল ডি. কস্টা। ভয়ে কেঁপে উঠল কামাল। মাম্লান দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলল, তারপর চেয়ার উল্টে লাফ দিল বিছানার দিকে।

কামাল উঠে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে। সাপ দুটো কেউটে, দেখেই বুঝেছে সে। এঁকে বেঁকে সরসর করে খাটের নিচে গিয়ে ঢুকছে।

চোখের পলকে ঘটল আর এক কাণ্ড।

আর্তনাদ করে উঠল ডি. কস্টা। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে কামাল তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ডি. কস্টার কোলের উপর পড়েছে উপর থেকে আর একটা সাপ! ফণা তুলে ধরেছে সাপটা ডি. কস্টার মুখের সামনে।

হাঁ করে বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে ডি. কস্টা।

মদের বোতলটা হাতে নিয়ে সাপটাকে আঘাত করার জন্য সেটা উপর দিকে তুলল কামাল। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেল।

ছোবল মারল কেউটে ডি. কস্টার ডান দিকের গালে। ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে।

বোতল দিয়ে আঘাত করল কামাল। সাপটা ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। এঁকে বেঁকে দ্রুত সোফার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল সেটা।

চোখ বুজে চেঁচাচ্ছিল ডি. কস্টা। চোখ খুলে সাপ নেই দেখে কাঁপতে কাঁপতে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। দিশেহারার মত কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। তার ধাক্কায় উল্টে পড়ল গ্লাস সহ টেবিলটা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কামাল এবং মান্নান চেয়ে আছে। কেউটের কামড় খেয়েছে ডি. কস্টা। মৃত্যু অনিবার্য। কেউটের কামড় খেয়ে কেউ বাঁচেনি আজ পর্যন্ত।

'মি. কামাল! হামাকে ঢরুন। হামাকে বাইরে নিয়ে চলুন—প্লীজ! প্রমিজ করিটেছি সব কঠা স্বীকার করিব।'

মান্নান বলল, 'কামাল ভাই, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ওকে এখুনি।'

'হাসপাটালে? কেন, হাসপাটালে যাইটে হইবে কেন?'

'আপনাকে সাপে কামড়েছে।'

'আই নো, আই নো। বাট বিষ নাই! নো পয়জন!'

কামাল অবাক হয়ে বলল, 'বিষ নেই মানে? তুমি জানলে কিভাবে?'

ডি: কস্টা করুণ, মিনতিভরা গলায় বলল, 'সব কঠা বলিব। ডয়া করিয়া হাপনি হামাকে এই রূম হইটে···।'

ভীড় জমে গিয়েছিল রূমের বাইরে। কামাল সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'কেউ থাকবেন না আশেপাশে! ঘরের ভিতর তিনটে বিষাক্ত সাপ আছে।'

কেটে পড়ল সবাই। ঘর থেকে বাইরে এসে ডি. কস্টা নামল মান্নানের কাঁধ থেকে। ছুটে এল হোটেলের ম্যানেজার খবর পেয়ে। সংক্ষেপে সব ঘটনা শোনার পর সেকেণ্ড ফ্লোরের একটা রূম খুলে দিলেন তিনি। যাবার সময় বলে গেলেন, সাপ ধরার জন্য ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন।

বেয়ারা এল ডি. কস্টার জন্য ব্র্যাণ্ডি নিয়ে। গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করল সে। কামাল বলল, 'আমার হাতে সময় নেই। যা বলবার বলো তাড়াতাড়ি। কোত্থেকে এল তোমার ঘরে সাপগুলো?'

'কোঠা হটে আসিয়াছে টা বলিটে পারি না। টবে, এই সাপগুলোই যে হামি গত পরশুদিন সাপ্লাই ডিয়াছি টাহাটে কোন সণ্ডেহ নাই।'

'সাপ্লাই দিয়েছ? কাকে?'

ডি. কস্টা বলল, 'প্রঠম থেকে স্টার্ট করি। এক ভদ্রলোক হামাকে অড সব জিনিস সাপ্লাই ডিবার প্রস্তাব ডেয়। টেলাপোকা, ইঁডুর, সাপ, পিঁপড়া এইসব। সেই লোকের নাম জানি না হামি। ঠিকানাও জানিনা। ড্যানটা সেই লোকেরই। হামি টাহাকে এক এক ডিন এক এক আইটেম সহ ড্যানটা ডিয়া আসি রমনা পার্কের পিছনের রোডে। সে হামাকে টাকা ডিয়া ড্যান লইয়া চলিয়া যায়, সম্ভবট টু হেল।'

'লোকটার চেহারার বর্ণনা দাও।'

'গাট্টাগোট্টা, মেজাজ খাট্টা, গালে দাগ, কপাল কাটা···।'

'বয়স?'

'থারটি-ফোরটি।'

'কতদিন থেকে এই সাপ্লাইয়ের কাজ করছ তুমি?'

ডি. কস্টা বলল, 'ডশ-পনেরো ডিন।'

কামাল একটু চিন্তা করল। তারপর জানতে চাইল, 'তোমার ঘরে সাপগুলো এল কেমন করে?'

ডি. কস্টা চোখ বড় বড় করে ঢোক গিলল, 'সেটাই টো ভেরি আশ্চর্যের কঠা। কিছুই বুঝিটে পারিটেছি না!'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেরা করল ডি. কস্টাকে কামাল। কিন্তু কোন নতুন তথ্যই সে যোগ করতে পারল না।

কামাল যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার ঢুকল রুমের ভিতর। তার হাতে আটটা মরা পাখি। পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে কামাল বুঝতে পারল, ওগুলো বাজপাখি।

'কোথায় পেলেন এগুলো?'

ম্যানেজার বলল, 'মি. স্যানন ডি. কস্টার রুমের মেঝেতে পড়ে রয়েছে দেখলাম। সাপগুলোকে মেরে ফেলার পর আমি ঘরে গিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখছিলাম। এমন সময় উপর দিক থেকে ঝপ্ ঝপ্ করে পড়ল এই মরা পাখিগুলো। ভৌতিক কাণ্ড, সাহেব।'

'দেখি, দেখি! আপনার ডান হাতের একটা পাখির গলায় কি ঝুলছে ওটা? কাগজ না? সুতো দিয়ে বাঁধা কাগজই তো মনে হচ্ছে।'

ম্যানেজারও এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে জিনিসটা, 'আরে—হ্যাঁ, তাই তো!'

সুতো ছিঁড়ে কাগজের টুকরোটা কামালের হাতে দিল ম্যানেজার। ভাঁজ করা কাগজের টুকরো একটা। ভাঁজ খুলতেই কামাল দেখল কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে: শখের টিকটিকি শহীদ খান, সাবধান! গোয়েন্দাগিরি ছাড়ো!

হাতের লেখাটা চিনতে পারল কামাল। অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে লেখার দিকে।

"শিকারীকে তোমরা পাবে না। বাংলাদেশের গোটা পশ্চিমাঞ্চল আমার রাডারের আওতায় এনেছি আমি। কোন বাজপাখি আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে পারবে না। প্রতিটি পাখিকেই আমি ধরব। আজ যে-কটা ধরা পড়েছে সে কটা তোমার কাছে পাঠালাম।"

ডি. কস্টার সাথে আরও দশ মিনিট ধরে কথা বলে শহীদের বাড়িতে চলে এল কামাল। এসে শুনল শহীদ তখনও ফিরে আসেনি।

শহীদ ফিরল বেলা আড়াইটার সময়। সবিস্তারে সব ঘটনা বলল কামাল। কিন্তু শহীদ কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তোর খবর কি? কি লিখেছে জেনারেল ইদি আমিন, মেসেজে?'

শহীদ বলল, 'কাম্পালায় অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দিন অর্থাৎ গতকাল যথাসময়ে সোহরাব প্লেনে চড়ে। প্লেন টেক অফ করার খানিক পরই গ্রেট

ম্যাজিশিয়ান নামে এক ভয়ঙ্কর লোক আবিদকে বন্দী করে নিয়ে যায় তার হোটেল থেকে।'

'কারণ?'

'কারণ আবিদ কঙ্গোর দুর্গম জঙ্গলের কোথাও নাকি হাজার হাজার মণ সোনা অর্থাৎ গুপ্তধন দেখে এসেছে। কঙ্গোর গভীর জঙ্গলের কোথাও যে বিশাল এক গুপ্তধনের ভাণ্ডার জমা হয়ে আছে তা অনেকেই জানে, যেমন আমিও জানি। কিন্তু গুপ্তধনের সঠিক অবস্থান কারও জানা নেই। একমাত্র আফ্রিকার অসভ্য আদিবাসীরা নাকি সেই গুপ্তধনের ঠিকানা জানে। সভ্য জগতের মানুষদের মধ্যে জানে একমাত্র আবিদ। আবিদকে গ্রেট ম্যাজিশিয়ান তাই বন্দী করে নিয়ে গেছে। কিন্তু বন্দী হবার আগে আবিদ একটা কাজের মত কাজ করেছে অবশ্য।'

'কি কাজ?'

'শিকারী, বাজপাখিটার কথা মনে আছে তো? আবিদ একটা নকশা এঁকে বাজপাখিটার গলায় বেঁধে দিয়েছে।'

'অদ্ভুত। তারপর?'

'জেনারেল ইদি আমিন মেসেজে বলতে চাইছেন যে আবিদ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও সে উগাণ্ডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। সেই হিসেবে নকশাটা উগাণ্ডা সরকারের সম্পত্তি। জেনারেলের বিশ্বাস শিকারী বাংলাদেশের উদ্দেশে উড়ে আসছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেছেন, পাখিটার নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং পাখিটার কাছ থেকে নকশাটা উদ্ধার করে উগাণ্ডা সরকারের হাতে তুলে দেয়ার জন্য।'

'গ্রেট ম্যাজিশিয়ান লোকটা কে?'

শহীদকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল। বলল, 'কে আবার, আমাদের প্রফেসর ওয়াই স্বয়ং, গ্রেট ম্যাজিশিয়ান হিসেবে পরিচিত উগাণ্ডায়।'

কামাল বলল, 'ডি. কস্টার ঘরে বাজপাখিদের সাথে যে চিঠিটা পাওয়া গেছে সেটা দেখে তোর মনে হচ্ছে না হাতের লেখাটা প্রফেসর ওয়াই-এর?'

'মনে হবে কেন! হলপ করে বলতে পারি প্রফেসর ওয়াই-এর হাতের লেখা ওটা।'

'তার মানে সে এখন ঢাকায়?'

শহীদ চিন্তিত ভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

কামাল জানতে চাইল, 'সোহরাব পৌঁছেছে?'

'হ্যাঁ। স্ত্রী দুই ছেলেকে নিয়ে বেলা একটার সময় পৌঁছেছে সে। আমি মি. সিম্পসনের সাথে গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে। ওখান থেকে ওদের সাথে এডভোকেট আশরাফ সাহেবের বাড়িতে যাই। সোহরাবের সাথে দীর্ঘ আলাপ করেছি।'

'ইন্সপেক্টর জেনারেল কি বললেন?'

'কেসটা নিতে বললেন আমাকে। নিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি নিয়ে।'

'কেন, ভুল করেছিস মনে হচ্ছে কেন?'

শহীদ বলল, 'দর্শক হওয়া ছাড়া আমাদের করার কিছু আছে কি? প্রফেসর ওয়াই-এর রাডার প্রতি সেকেণ্ড লক্ষ রাখছে পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে কোনও বাজপাখি দেশের সীমানা অতিক্রম করছে কিনা। বাজপাখি দেখলেই সে ভ্যানিসিং রে বা কসমিক রে ব্যবহার করে হয় পাখিটাকে খুন করবে নয়ত গায়েব করে দেবে বাতাসের সাথে। কি করতে পারব আমরা?'

কামাল জানতে চাইল, 'আবিদকে বন্দী করেছে বলছিস। সেক্ষেত্রে আবিদের সাহায্যেই তো সে গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারে। নকশার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে কেন আবার?'

'আমার মনে হয় প্রফেসর ওয়াই আসলে ভয় করছে কুয়াশাকে। কুয়াশার হাতে যদি নকশাটা পড়ে তাহলে সে-ও গুপ্তধন উদ্ধার করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। প্রফেসর ওয়াই তা চায় না। কুয়াশাকে সে রীতিমত ভয় করে।'

কামাল খানিক পর জানতে চাইল, 'কিন্তু ইঁদুর, তেলাপোকা, পিঁপড়ে—এসবের কি অর্থ?'

'স্রেফ আমাদের বিরক্ত করার জন্য প্রফেসর ওয়াইয়ের রসিকতা ওগুলো। তাছাড়া কিছু নয়। জানিসই তো, লোকটা আসলে বদ্ধ উন্মাদ।'

'কিন্তু এগুলো আসছে কিভাবে? ডি. কস্টার ঘরের ছাদে ফুটো নেই, গর্ত নেই, ফাটল নেই অথচ উপর দিক থেকে পড়ল সাপগুলো...'

শহীদ বলল, 'সিঁড়ির মাচা থেকে যে যন্ত্রটা পেয়েছি ওটা এক ধরনের রিসিভিং সেটই, এখন আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। এর বেশি জানি না আমি।'

'আশ্চর্য!'

শহীদ বলল, 'তারচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস?'

'কি?'

'গতকাল রাতেও দেখা গেছে গ্রেট ম্যাজিশিয়ান ওরফে প্রফেসর ওয়াইকে কাম্পালায়। এদিকে আজ সকালে তাকে দেখা গেছে ঢাকায়।'

'ঢাকায় দেখা গেছে!'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। কুয়াশার কাছে গিয়েছিল সে।'

'তুই জানলি কি করে?'

'মি. সিম্পসনকে ফোন করেছিল কুয়াশা। আমি ছিলাম তখন মি. সিম্পসনের সাথে।'

'কুয়াশা ফোন করেছিল মি. সিম্পসনকে! কেন, কেন?'

'প্রফেসর ওয়াই-এর বিরুদ্ধে না লাগার জন্য মি. সিম্পসনকে উপদেশ দেবার

জন্য। প্রফেসর ওয়াই কুয়াশাকে জানিয়ে দিয়েছে কুয়াশা, মি. সিম্পসন বা আর যে কেউ তার বিরুদ্ধে লাগলে চরম শাস্তি দেবে সে।'

কামাল বলল, 'হুঁ। তাহলে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য কি এখন?

'শিকারীর জন্য অপেক্ষা করা। শিকারী যদি পৌঁছায় তাহলে তার গলা থেকে নকশাটা উদ্ধার করা। নকশাটা যাতে প্রফেসর ওয়াই বা কুয়াশা না পায় তার ব্যবস্থা করা।'

কামাল মুখ বাঁকা করে বলল, 'কঠিন, কঠিন কাজ।'

শহীদ বলল, 'ঠিক বলেছিস। তিনটেই সত্যি বড় কঠিন কাজ।'

কামাল জানতে চাইল, 'শিকারী কবে বাংলাদেশে ঢুকবে বলে আশা করছিস?'

শহীদ বলল, 'হিসেব করে দেখেছি আমি। আমার হিসেব যদি ভুল না হয় এবং শিকারী যদি রাতের বেলাও ওড়ার কাজে বিরতি না দেয় তাহলে পরশু দিন সকালের দিকে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করবে সে।'

'এখন তাহলে অপেক্ষার পালা?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। অপেক্ষার পালা।'

ছয়

পরের দিনটা কাটল ঘটনাবিহীন ভাবে।

ভিতর ভিতর সবাই ভীষণ উত্তেজিত। সত্যিই কি শিকারী আসবে? প্রফেসর ওয়াই-এর রাডারের পর্দাকে কি শিকারী ফাঁকি দিতে পারবে?'

সকাল থেকে শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন এডভোকেট আশরাফ সাহেবের বাড়িতে বসে আছে। হিসেব অনুযায়ী আজই আসার কথা শিকারীর।

ছটফট করছেন মি. সিম্পসন। ঘনঘন তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। উঠনের আম গাছটার দিক থেকে কামাল তো মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না।

বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে সবাই ওরা। আশরাফ সাহেব আছেন ওদের সাথে। সোহরাবও আছে। সোহরাবের আফ্রিকান স্ত্রী আসমা লেমন খানিক পরপরই গরম চা দিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরপরই ফোন আসছে মি. সিম্পসনের। টেবিলের উপর এনে রেখেছে ফোনটা সোহরাব।

ফোনে খবর পাচ্ছে মি. সিম্পসন কন্ট্রোল রুম থেকে।

ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে কোন বাজপাখিকেই যেন গুলি করে হত্যা করা না হয় তার ব্যবস্থা করবার জন্যে।

গতরাতে মেটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হাই অফিশিয়ালদের সাথে শিকারীকে ডাইভার্ট করার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে ব্যাপারে দীর্ঘ আলাপ করেছেন মি. সিম্পসন। কিন্তু কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারেননি।

প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছে সবাই প্রফেসর ওয়াই-এর কাছ থেকে খবর আসবে—শিকারীকে পেয়েছি আমি।

শহীদ গম্ভীর। কোন কথাই বলছে না সে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। বন্ধ হয়ে গেল সকলের মুখের কথা। সবাই চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

মেঘমুক্ত, নির্মল আকাশ। কিন্তু কোথায় শিকারী? একটা চিল বা শকুনেরও চিহ্ন নেই আকাশের কোথাও?

প্রফেসর ওয়াইও শিকারীকে ধরতে পারেননি, বোঝা যাচ্ছে। শিকারীকে ঘায়েল করতে পারলে সগর্বে তিনি তা ঘোষণা করতেন।

তাহলে? আসছে না কেন শিকারী? তবে কি পথ ভুল করেছে পাখিটা? কিংবা মারা গেছে পথে কোথাও?

কিছুই অসম্ভব নয়।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা নামল।

সকলের চেহারায় ফুটে উঠেছে নৈরাশ্যের ঘোর কৃষ্ণছায়া। ক্রমশ নামল রাত্রির অন্ধকার।

এল না শিকারী।

এদিকে সকাল বেলাই আলোচনা হয়ে গেছে শিকারী আবিদের তৈরি নকশা যদি নিয়ে আসে তাহলে সেটার মালিক হবে কে? আশরাফ সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন নকশার উপর তার কোন লোভ নেই। নকশা বাংলাদেশ সরকারকে দান করবেন তিনি। তবে সরকার যদি তাঁকে পুরস্কার দিতে চান তাহলে তা তিনি গ্রহণ করবেন।

নতুন করে হিসেব কষতে বসল কামাল।

'শিকারী হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্রাম নেবে ঠিক করেছে এক বা দুদিন কোথাও···।' ইতস্তত করতে করতে বলল সোহরাব।

মি. সিম্পসন জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'খুবই সম্ভব সেটা।'

আশরাফ সাহেব বললেন, 'রাস্তা তো আর কম নয়। কয়েক হাজার মাইল। চাট্টিখানি কথা নয়।'

কামাল বলল, 'আগামীকাল নিশ্চয় পৌঁছে যাবে শিকারী।'

কিন্তু পরদিনও অপেক্ষা করাই সার হলো। এল না শিকারী। এদিকে প্রফেসর ওয়াইও নীরব। অর্থাৎ শিকারী তাকেও ফাঁকি দিয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনের পর কেটে গেল আরও দুটো দিন। তবু শিকারীর দেখা নেই। কিন্তু মি. সিম্পসন হাল ছাড়বার পাত্র নন। এখনও তিনি আশা করেন শিকারী আসবে।

আশা করে শহীদও।

মি. সিম্পসন পলিস পাহারা বসিয়েছেন আশরাফ সাহেবের বাড়ির চারদিকে।

তাঁর বিশ্বাস প্রফেসর ওয়াই শিকারীর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। শিকারী সরাসরি উড়ে আসবে আশরাফ সাহেবের আম গাছের উপর।

কেটে গেল আরও একটা দিন।

ধৈর্যের পরীক্ষা চলেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আশরাফ সাহেবের বারান্দায় সবাই বসে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে। কামাল বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সারাদিন আকাশে খোঁজে শিকারীকে। পশ্চিম দিকের আকাশ থেকে তার দৃষ্টি সরে না।

সোহরাব উগাণ্ডার গল্প বলে। সবাই শোনে। আসমা লেমন চা আনে, মাঝে মধ্যে বসে ওদের সাথে, জেনারেল ইদি আমিনের পাগলামির বর্ণনা দেয় নানা ঘটনার উল্লেখ করে। জেনারেল কি রকম নিষ্ঠুর, কি রকম রগচটা, কি রকম গোঁয়ার তার গল্প শোনায় একটার পর একটা।

অন্যমনস্কভাবে সবাই শোনে। শোনার ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে দেখে নেয় আকাশটা!

কিন্তু কোথায় শিকারী?

কেটে যায় আরও একটা দিন।

পরদিনও আবার চলে ধৈর্যের কঠোর পরীক্ষা। আবার বসেছে আজ ওরা আশরাফ সাহেবের বারান্দায়। চেয়ার টেবিল পেতে। শহীদ এবং মি. সিম্পসন মুখোমুখি। শহীদের পাশে কামাল। মি. সিম্পসনের পাশে সোহরাব। সোহরাবের পাশে ডি. কস্টা। ডি. কস্টাও ক'দিন থেকে আসছে নিয়মিত। ডি. কস্টার পাশে আশরাফ চৌধুরী।

বাড়ির ভিতর, উঠনে, একটা লম্বা বেঞ্চের উপর বসে আছে পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র পুলিস। বাড়ির গেটের বাইরেও সশস্ত্র পুলিস আছে। পিছনেও পাহারার ব্যবস্থা করেছেন মি. সিম্পসন। রাস্তায় আছে পুলিস বিভাগের ডিটেকটিভরা, সিভিল ড্রেসে।

আসমা লেমন গল্প বলছিল। জেনারেল ইদি আমিন সামান্য কারণে একজনের উপর চটে গিয়ে নির্মমভাবে তার কি চরম ক্ষতি করেছিল সে কথা বর্ণনা করছিল সে।

এমন সময়, যেন টিকেট না কেটেই লটারিতে প্রাইজ পাওয়া গেল, শিকারী উড়ে এসে বসল আশরাফ সাহেবের কাঁধে।

চোখের পলকে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা।

শহীদ সবচেয়ে আগে চেয়ার ছেড়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়েই পকেট থেকে লোডেড রিভলভার বের করল। সাবধানের মার নেই। মি. সিম্পসন হুইসেল বের করে ফুঁ দিলেন দীর্ঘক্ষণ। ছুটে আসতে লাগল সশস্ত্র পুলিসরা।

'কর্ডন! কর্ডন! কর্ডন করো বারান্দাটাকে!' দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনা দমন করতে করতে নির্দেশ দিলেন মি. সিম্পসন। সোহরাব গিয়ে দাঁড়াল তার বাবার পাশে। শিকারীর গায়ে আলতোভাবে হাত দিল সে।

লাল টকটকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে শিকারী। হাঁপাচ্ছে সে। ছোট্ট বুকটা উঠছে, নামছে—উঠছে নামছে।

মি. সিম্পসন সোহরাবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। শিকারীর গলা থেকে সুতো দিয়ে বাঁধা ভাঁজ করা কাগজটা খুলে নিয়ে সাথে সাথেই প্যান্টের পকেটে ভরে ফেললেন তিনি। তাকালেন শহীদের দিকে, 'শহীদ, নকশাটার নিরাপত্তা বিধানের জন্যে এখন আমাদের কি করা উচিত মনে করো তুমি?'

শহীদ বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া উচিত। হেডকোয়ার্টারে চলুন।'

বাড়ি ভরে গেছে সশস্ত্র পুলিসে।

মি. সিম্পসন বারান্দা থেকে নামলেন। তার সাথে শহীদ, পাশাপাশি। পিছন পিছন কামাল, ডি. কস্টা।

গোটা দলটাকে ঘিরে রেখে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে সশস্ত্র পুলিসের দল।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস বিভাগের দুটো মাইক্রোবাস। দুটো জীপও দেখা যাচ্ছে। মাইক্রোবাসের কাছাকাছি গিয়ে কামাল কটমট করে তাকাল ডি. কস্টার দিকে। ঢোক গিলল ডি. কস্টা। কেন যেন অপ্রতিভ দেখাল তাকে। কামাল বলল, 'আমাদের সাথে যাবার মতলব আছে নাকি?'

'টা নয়, টা নয়,' বলে সরে গেল ডি. কস্টা। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে রাস্তার বাঁকে।

মি. সিম্পসন, শহীদ, কামাল উঠল একটি মাইক্রোবাসে। সামনের মাইক্রোবাসটায় উঠল কিছু সশস্ত্র পুলিস। সামনে রইল একটা জীপও।

পিছনে রইল আর একটা জীপ।

সবগুলো গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করল একযোগে।

মি. সিম্পসন পাশে বসা শহীদের হাতের রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রিভলভারটা পকেটে ভরে রাখতে পারো শহীদ। ওটার বোধ হয় আর দরকার নেই।'

শহীদ বলল, 'নকশাটা নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না, মি. সিম্পসন।'

কামাল বসেছে শহীদের পাশে।

মি. সিম্পসন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শহীদ! মাথাটা ঘুরছে আমার...'

কথা শেষ হলো না তার। মাথাটা কাত হয়ে গেল একপাশে। শহীদ পিছন দিকে তাকাবার জন্য ঘাড় ফেরাতে গিয়ে মিষ্টি একটা গন্ধ পেল। পিছন দিকে ঘাড় ফেরানো হলো না ওর। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে-ও।

কামাল আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

মাইক্রোবাস যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটছে। ড্রাইভার শুধু খানিক পর নাক থেকে রুমাল সরিয়ে পিছন ফিরে তাকাল।

সবাই যেন ঘুমুচ্ছে অঘোরে। মুচকি হাসি ফুটে উঠল মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের ঠোঁটে।

সাত

জ্ঞান ফেরার পর শহীদ দেখল প্রকাণ্ড একটা হলঘরের একধারে একটা চেয়ারের উপর বসে আছে ও। হাত পা বাঁধা নয়। মি. সিম্পসন, কামাল, বসে রয়েছে পাশের দুটো চেয়ারে। সকলের জ্ঞান ফিরে এসেছে এইমাত্র।

হলরুমের চারদিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। এটাকে হলরুম না বলে বিজ্ঞানাগার বা কন্ট্রোলরুম বলাই ভাল। অদ্ভুত দর্শন ছোট বড় যন্ত্রপাতি চারদিকে দেখা যাচ্ছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা কেবিন। তার পাশেই দু'মানুষ সমান উঁচু একটা ট্র্যান্সমিটার। ট্র্যান্সমিটারটার পাশে তিনফুট উঁচু ইস্পাতের তৈরি মানুষের আকার আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আটটা যন্ত্র।

'রোবট!' কামাল চাপা কণ্ঠে বলল।

হলের একধারে একটা টেবিলে অসংখ্য সুইচ ছাড়াও রয়েছে টিভির দেয়াল-জোড়া স্ক্রিন। প্রফেসর ওয়াই বসে আছেন টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক চেয়ারে।

'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে?'

কেউ কোন কথা বলল না।

'আপনাদের পাশে খালি চেয়ার রয়েছে আর কয়েকটা। দেখতে পাচ্ছেন?'

সবাই তাকাল, শহীদ ছাড়া। খালি চেয়ারগুলো আগেই লক্ষ করেছে ও।

প্রফেসর ওয়াই টেবিলের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বলল, 'আমি চাই না ওই খালি চেয়ারগুলো পূরণ করার জন্য মিসেস শহীদ বা, কুয়াশাকে এখানে আনতে। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে বাধ্য করেন তাহলে আমি নিরুপায়। দেখুন, কতটা ভদ্রলোক আমি—সুযোগ পেয়েও আমি আপনাদের ক্ষতি করিনি। আমি চাই, মি. সিম্পসন, নকশাটা নিজের হাতে পকেট থেকে বের করে আমাকে দেবেন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'নকশা আমি দেব না। এটা তোমার জিনিস নয়, শয়তান প্রফেসর!'

প্রফেসর ওয়াই টেবিলের অসংখ্য সুইচের মধ্যে থেকে একটা সুইচে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেন।

মি. সিম্পসন 'মাই গড!' বলে চিৎকার করে উঠে এক ঝটকায় মাথার হ্যাটটা ফেলে দিলেন মেঝেতে।

আগুন জ্বলছে হ্যাটে। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেটা।

প্রফেসর ওয়াই বলল, 'এরপর যদি ভদ্রভাবে কথা না বলেন তাহলে আপনার মাথার চুল, ভুরু আর চোখের পাপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব। নকশাটা বের করুন এবার, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকাল।

শহীদ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, 'পরাজয় মেনে নেয়া উচিত আপনার, প্রফেসর ওয়াই। আপনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, শিকারীকে আমাদের হাতে আসতে দেবেন না। হেরে গেছেন আপনি। আপনার উচিত পরাজয় মেনে নেয়া। কাপুরুষের মত নিজের আস্তানায় বন্দী করে নিয়ে এসে এই নাটক করার কোন মানে হয় না! এতে প্রমাণিত হচ্ছে আপনি আদর্শহীন, শঠ, কাপুরুষ!'

'থামো, ছোকরা!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর ওয়াই, 'লেকচার এখানে আমি দেব, তুমি না। আমি নকশাটা চাই। এই নকশার জন্য আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই। যুদ্ধে পরাজয় বলে কোন জিনিস নেই। একভাবে পারিনি, অন্য ভাবে পারতে হবে—এই আমি বুঝি। মি. সিম্পসন, এই শেষ বার বলছি, নকশাটা পকেট থেকে বের করে মেঝেতে ফেলে দিন।'

মি. সিম্পসন রাগে কাঁপতে কাঁপতে পকেটে হাত দিলেন। দিয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। বিস্ফারিত হয়ে গেছে দুই চোখ। 'কিন্তু···নকশাটা গেল কোথায়! আমার পকেটেই ছিল—শহীদ, নেই কেন?'

কথাগুলো বলেই সবিস্ময়ে তাকালেন মি. সিম্পসন শহীদের দিকে।

প্রফেসর ওয়াই গর্জে উঠল, 'কৌশল, কেমন? কৌশল খাটবে না, মি. সিম্পসন।'

প্রফেসর ওয়াই আর একটা বোতাম টিপল। ট্র্যান্সমিটারের পাশে যে আটটা রোবট দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা রোবট খট্ খট্ করে শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে শুরু করল মি. সিম্পসনের দিকে।

মি. সিম্পসনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রোবটটা পুরোপুরি একজন মানুষের মতই। সার্চ করছে রোবটের ইস্পাত নির্মিত দুটো হাত মি. সিম্পসনকে।

প্রফেসর ওয়াই বলল, 'মি. সিম্পসনের কাছে নেই নকশাটা। নাম্বার ওয়ান ডল, তুমি একে একে সকলের পকেট সার্চ করো।

একে একে সকলের পকেট সার্চ করতে শুরু করল নাম্বার ওয়ান ডল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নকশাটা পাওয়া গেল না কারও কাছেই।

কামাল বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য! গেল কোথায় সেটা!'

বজ্রকণ্ঠে কথা বলে উঠল প্রফেসর ওয়াই, 'কোন কথা শুনব না আমি। নকশা চাই, এই মুহূর্তে চাই। নাম্বার এইট ডল, বাইরে গিয়ে জর্মন শেখকে বলো, শহীদ খানের বাড়িতে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই যেন ধরে আনা হয়। ওকে তিন নম্বর

ট্র্যান্সমিশন, কেবিন ব্যবহার করতে বলো!'

শহীদ বলল, 'পাগল আর বলে কাকে! নকশা পাবেন না বলে আমার বাড়ির মানুষদের উপর এত রাগ দেখাবার কারণ কি?'

'তুমিই যত নষ্টের মূলে,' প্রফেসর ওয়াই বলল।

কামাল তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ ফিসফিস করে বলল, 'ডি. কস্টাকে সন্দেহ হয় আমার। নকশাটা ওর কাছেই আছে সম্ভবত। মাইক্রোবাসে ওঠার সময় মি. সিম্পসনের পকেট থেকে নকশাটা চুরি করেছে ও।'

'সেকি!' ফিসফিস করে জানতে চাইল কামাল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আচমকা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল প্রফেসর ওয়াই। হাসি থামতে বলল, 'বোকার দল! ভেবেছে ফিসফিস করে কথা বললে শুনতে পাব না? হাঃ হাঃ হাঃ হা! আমার কানে যেসব শব্দ ধরা পড়ে তা তোমরা জীবনে কোনদিন শুনতে পাবে না। স্পেশালভাবে তৈরি এই কান। ডি. কস্টাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানি আমি। ডল নাম্বার থ্রী, ডি. কস্টাকে এখানে বন্দী করে আনো। সাত নম্বর কেবিন ব্যবহার করো তুমি।'

তিন নম্বর ডল কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট কাটল না। ডি.কস্টাকে বন্দী করে নিয়ে এল তিন নম্বর রোবট। প্রফেসর ওয়াই হাঁক ছাড়ল, 'নকশাটা তোমার কাছে?'

ডি. কস্টা ঘন ঘন ঢোক গিলল। বলল, 'হ্যাঁ, নকশাটা আমার কাছেই ছিল। কিন্তু এখন সেটা আমার আওটার বাইরে, প্রফেসর ওয়াই।'

প্রফেসর ওয়াই গর্জে উঠল, 'আওতার বাইরে? তার মানে?'

'মাড়ুলিটা গিলিয়া ফেলিয়াছি। পেটের ভিতর সেটা এখন।'

চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারল না কামাল।

প্রফেসর ওয়াই বলল বজ্রকণ্ঠে, 'পেটের ভিতর কি বুকের ভিতর তা আমি শুনতে চাই না। নকশা আমি চাই। এই মুহূর্তে! বের করো, ডি. কস্টা।'

'কিন্তু বের করিব কিভাবে?'

'তা আমি জানি না। গিলে ফেলার সময় ভাবনি কিভাবে বের করবে?'

ডি. কস্টা বলল, 'বের হবে। টবে একটা কি ডেড়টা ডিন ডিটে হবে, প্রফেসর।'

'অত ধৈর্য আমার নেই! নকশা তুমি এই মুহূর্তে দেবে কি না বলো।'

উঠে দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই। রাগে কাঁপছে সে।

অসহায় দেখাল ডি. কস্টাকে। সাহস সঞ্চয়ের জন্য সে তাকাল কামালের দিকে। কামাল মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

'আমাকে তোমরা পেয়েছ কি তাই ভাবি! গিলে ফেলেছ! কোন কথা শুনব না

আমি—নকশা দাও! হয় নকশা দেবে নয়ত···নয়ত···ঠিক আছে! ব্যবস্থা করছি আমি। তোমাদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় জানা আছে আমার! দাঁড়াও! তোমার বস্ মি. কুয়াশাকে আমি বলেছিলাম, সে যেন সবাইকে নিষেধ করে দেয় আমার পিছনে লাগতে। শোনেনি সে আমার কথা। তোমরাও শোনোনি! বেশ, দেখো আমি কি করতে পারি।'

প্রফেসর ওয়াই রাগে কাঁপতে কাঁপতে আবার বসল চেয়ারে। সুইচ টিপল আবার একটা। বলল, 'ডল নাম্বার সেভেন! যাও তুমি! কেবিনে ঢোকো। কুয়াশাকে গিয়ে বলবে, আমি প্রফেসর ওয়াই, তাকে ডেকেছি। দেখি সে আসে কিনা। যদি সে আসতে না চায় তাহলে জানিয়ে দেবে মি. সিম্পসন, শহীদ খান, কামাল আহমেদ, ডি. কস্টা, মিসেস মহুয়া—সবাইকে আজই নিজের হাতে খুন করব আমি।'

সাত নম্বর রোবটটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা কেবিনের ভিতর ঢুকল। প্রফেসর ওয়াই একটা সুইচ টিপল আবার।

তীব্র নীল আলোয় ঝলসে গেল ওদের সকলের চোখ। চোখ বন্ধ করে ফেলল সকলে। খানিক পর চোখ খুলে ওরা দেখল কেবিনের ভিতরটা ফাঁকা, রোবটটা নেই সেখানে!

প্রফেসর ওয়াই জিজ্ঞেস করল, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না? কেবিনের ভিতর থেকে গেল কোথায় রোবটটা? শুনবে, এর রহস্য শুনবে? মাথা খারাপ হয়ে যাবে শুনলে, হ্যাঁ, এমনই অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি। রেডিও টেলিভিশন কি জিনিস জানো তো? নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে ছবি বা শব্দ ট্র্যান্সমিট করা হলেই আমরা আমাদের রিসিভিং সেটের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে তা শুনতে পাই বা দেখতে পাই। আলোর গতিতে শব্দটা আসে বা ছবিটা আসে। কিন্তু আমি কি আবিষ্কার করেছি জানো? ছবি নয়, কথা নয়, আমি আবিষ্কার করেছি বস্তু ট্র্যান্সমিট করার পদ্ধতি। ওই কেবিনে যে-কোন জিনিসকে ঢুকিয়ে দিয়ে ডিজইন্টিগ্রেট করে দিই আমি, অর্থাৎ বস্তুকে ভেঙে অণু-পরমাণুতে পরিণত করি। বিভিন্ন জায়গায় আমি রেখে দিয়েছি রিসিভিং সেট। যেখানে পাঠাতে চাই, বোতাম টেপার সাথে সাথেই অণুগুলো সেখানে গিয়ে জোড়া লাগে, আবার একত্রিত হয়, অর্থাৎ বস্তু তার হুবহু নিজস্ব আকার ফিরে পায়। কি, বিস্ময়কর আবিষ্কার না?'

এমন সময় কন্ট্রোলরুমে এসে ঢুকল মহুয়া। পিছনে একটা রোবট।

'খালি চেয়ারটায় বসো,' প্রফেসর ওয়াই নির্দেশ দিল। তারপর আবার বলল, 'মিসেস মহুয়া, আপনার প্রতিও আমার কঠিন অভিযোগ আছে। আমার পিছনে লাগা থেকে আপনার স্বামীকে আপনি ক্ষান্ত করতে পারেননি। এর শাস্তি পেতে হবে আজ আপনাকে।'

চোখ মিট মিট করল মহুয়া। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কী ব্যাপার! হঠাৎ কোথায় এসে পড়লাম!'

মহুয়াকে খালি চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল কামাল। বিস্ফারিত চোখে প্রফেসর ওয়াই-এর দিকে চেয়ে আছে মহুয়া। যন্ত্রচালিতের মত বসল সে একটা চেয়ারে।

প্রফেসর ওয়াই বলতে শুরু করল আবার, 'ভেবে দেখুন এবার, কতবড় বিজ্ঞানী আমি। আপনার ভাইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। বস্তু কখনও ট্র্যান্সমিট করা যায় না।'

'হোয়াট! কি বললে! আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

'নিশ্চয়ই, মিথ্যে কথা বলছ। হয়তো কোন ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদেরকে বোকা বানাতে চেষ্টা করবে, বলবে প্রমাণ দেখালাম। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়! তুমি তো একটা আস্ত পাগল, তোমার কথায় বিশ্বাস করলে…'

'আমি পাগল?'

প্রফেসর ওয়াই আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! ঠিক আছে, ঠিক আছে! প্রমাণ চাও, না? বেশ, বেশ! প্রমাণ আমি দেখাব। মি. সিম্পসন, হঠাৎ যদি চোখের পলকে তুমি নিজেকে আবিষ্কার করো গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের উপর, যেখানে শূন্য ডিগ্রীরও অনেক নিচে টেমপারেচার—কেমন হয় বলো তো?'

'রাখো তোমার বড় বড় কথা! ওসব গল্প আমি অনেক শুনেছি।'

'বেশ। প্রমাণ দেখাব তোমাকে। অবশ্যই দেখাব। তোমাকে একা কেন, প্রমাণ সবাইকেই দেখাব। আসতে দাও কুয়াশাকে, তাকেও দেখাব প্রমাণ। তোমাদের সবাইকে আমি ছড়িয়ে দেব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। নকশাটা তোমার পেটে, তাই না ডি. কস্টা? বেশ, বেশ। তোমাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা এভারেস্টের শৃঙ্গে পাঠাব। একা নয়, একা নয়—তোমার দোসর থাকবে—ফুলবাবুর মত ওই যে সাজগোজ করে রয়েছে কি যেন নাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কামাল মিয়া। ওর সাথেই পাঠাব তোমাকে। ডল নাম্বার ওয়ান, ওদের দুজনকে অক্সিজেন পাইপ দিয়ে সাজিয়ে দাও। যাতে বিশ কি পঁচিশ মিনিট বেঁচে থাকতে পারে এভারেস্টে গিয়ে। সাবধান, বেশি অক্সিজেন যেন না থাকে সিলিণ্ডারে। ডি. কস্টা আর কামাল, কেমন হবে বলো তো ব্যাপারটা? রহস্যপুরী ওখান থেকে মাত্র কয়েক হাজার মাইল দূরে। তবে, দুঃখের কথা এভারেস্ট থেকে নামার সুযোগ তোমরা পাবে না। তার আগেই অক্কা পাবে। মানুষ এভারেস্টে চড়তে গিয়ে প্রাণ দেয়। তোমরা সেখান থেকে নামার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ দেবে। মরে গিয়েও অমর হয়ে থাকবে। হুঁ…এবার মি. সিম্পসন,…ওহে ডল নাম্বার টু, এক কাজ করো, মি. সিম্পসনকে বেশ গরম কাপড়-চোপড় পরিয়ে দাও ভাল করে। মি. সিম্পসন, আপনার এখন মাত্র দু এক মিনিট একটু গরম লাগবে। তাতে বিচলিত না হওয়াই উচিত আপনার। কারণ এই গরম কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি বলে খানিক পরই আপনি আমাকে শত-কোটি প্রণাম

জানাবেন। কারণটা কি জানেন? খানিক পরই আপনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন বরফের রাজ্য, গ্রীনল্যাণ্ডে। ওখানে আপনি বড়জোর এক কি দুঘণ্টা বেঁচে থাকবেন। তারপর ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবেন। শক্ত, পাথরের মত। আর শহীদ, তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে পাঠাব ভারত মহাসাগরের এক রহস্যময় দ্বীপে। যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছায়নি, কেউ কোনদিন পৌঁছাবে না। কোন জাহাজ সেখানে কোনদিন ভেড়ে না। ওখানে মহুয়ার জন্য অপেক্ষা করছে আমার কিছু লোক। মহুয়াকে পেলে ওরা বড়ই আনন্দিত হবে।

এমন সময় কালো আলখাল্লায় আপাদমস্তক ঢাকা দীর্ঘদেহী ঋজু এক পুরুষ প্রবেশ করল হলরুমে। প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলে উঠল ভারি গলায়, 'আমাকে কোথায় পাঠাবে, ওয়াই?'

চমকে উঠল প্রফেসর ওয়াই। ঘাড় ফিরিয়ে কালো আলখাল্লা পরিহিত কুয়াশাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে! মি. কুয়াশা! আপনি এসেছেন! সার্থক হলো আমার জন্ম! আপনাকে আমার কন্ট্রোলরুমে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। চমৎকার! আমার রোবটকে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে বন্দী করে আনতে! সে বুঝি আপনাকে পায়নি? স্বেচ্ছায় এসেছেন দেখছি—গুড! ভেরী গুড। মি. কুয়াশা, আপনাকেও পাঠাব!'

'সে কথাই তো জানতে চাইছি। কোথায় পাঠাবে আমাকে?'

'আপনাকে পাঠাব মহাশূন্যে। প্রফেসর কুটজে যেখানে আছে আপনিও সেখানে থাকবেন। প্রফেসর কুটজের স্পেস ক্রাফটে রিসিভিং সেট লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আমি। তার স্পেসক্রাফট নষ্ট হয়ে গেছে মহাশূন্যে, কোন এক গ্রহের উপর আছড়ে পড়ে, যতদূর জানি। আপনিও সেখানে যাবেন। কোনদিন ফিরতে পারবেন না এই দুনিয়ায়। অনেক ভাবে অনেকবার অনুরোধ করেছি আপনাকে। আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করবেন না। শোনেননি। এর শাস্তি আজ আপনাকে পেতে হবে, মি. কুয়াশা। স্বীকার করি, আমি আপনার কাছে ঋণী। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা যেমন আপনাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী আমি তেমনি···থাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনাদের অত্যাচার আমি অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। এই পৃথিবীর মানুষকে আমি ভালবাসি। এদের জন্য কিছু কাজের মত কাজ করতে চাই আমি। কিন্তু আপনারা থাকতে তা আর সম্ভব নয়, বুঝতে পারছি। ডল নাম্বার ফোর, ফাইভ। গরম কাপড় তো পরানো হয়ে গেছে? মি. সিম্পসনকে কেবিনে ঢোকাও!

মি. সিম্পসন ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, 'ঢোকাতে হবে না, আমি নিজেই ঢুকছি। আবারও বলছি আমি তোমার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার কথা বিশ্বাস করি না।'

'মি. কুয়াশা, শুনলেন? বোকা লোকটার কথা শুনলেন?'

কুয়াশা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'বড় বেশি বেড়ে গেছ তুমি, ওয়াই।

একটা কথা মনে রেখো, ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে আমি তোমার ইতি ঘটাতে পারি।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন প্রফেসর ওয়াই। বললেন, 'পারতেন, স্বীকার করি। কিন্তু এখন আর পারবেন না। এখন আপনি আমার হাতে বন্দী। আপনার কোন ক্ষমতা নেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবার! কথাটা আপনিও জানেন। আমার ইতি ঘটাবার ক্ষমতা আপনার ছিল খানিক আগে পর্যন্ত—সেজন্যে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম আমি। সব ভয় দূর হয়ে গেছে আমার এখন। আপনাকে আজ পেয়েছি আমার কন্ট্রোলরুমে। কেউ বাধা দিতে পারবে না এখন আমার কাজে। আমি আপনাকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেব। আপনি অনেক বড় বিজ্ঞানী, দেখব ফিরে আসতে পারেন কিনা আবার এই সুন্দর পৃথিবীতে।'

'মি. সিম্পসন কাঁচ ঘেরা কেবিনে ঢুকেছেন। প্রফেসর ওয়াই সুইচ টিপতেই আবার সেই চোখ ঝলসানো আলো দেখা গেল। পরমুহূর্তে দেখা গেল মি. সিম্পসন নেই কেবিনের ভিতর।

'দাদা! এসব কি সত্যি!' চিৎকার করে জানতে চাইল মহুয়া।

কুয়াশা গম্ভীর। মৃদু কণ্ঠে শুধু বলল, 'এই মুহূর্তে আমি তোদের কারও কোন কাজে লাগতে পারব না রে, মহুয়া। তবে চিন্তা করিসনে, বোন। তোর দাদা যদি বেঁচে থাকে তবে তোরাও বেঁচে থাকবি!'

'সাবাস! সাবাস! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মতই কথা বলছেন আপনি মি. কুয়াশা,' প্রফেসর ওয়াই বলে উঠলেন।

মহুয়া আবার শুনতে চাইল, 'মি. সিম্পসন কি সত্যিই···?'

কুয়াশা সংক্ষেপে শুধু বলল, 'হ্যাঁ। এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন।'

প্রফেসর ওয়াই বলল, 'এবার শহীদ আর মিসেস।'

শহীদ মহুয়ার হাত ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে কেবিনের দিকে এগোল। এছাড়া উপায় নেই। মৃত্যুর চেয়ে এ-ও ভাল।

ঝলসে উঠল আলো। অদৃশ্য হয়েছে।

এরপর কামাল আর ডি. কস্টা ঢুকল কেবিনে।

সবশেষে ঢুকল কুয়াশা।

সুইচে আঙুলের চাপ দিল প্রফেসর ওয়াই। নীল আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

দেখা গেল কেবিনে কুয়াশা নেই।

প্রফেসর ওয়াই হাঁফ ছেড়ে বলল, 'বাঁচা গেল! সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কেউ ওরা বেঁচে ফিরবে না আর এই বাংলাদেশে। আমি এখন একা। যা খুশি তাই করব এবার। কেউ নেই আমাকে বাধা দেবার! নো ওয়ান।'

গলার স্বর পরিবর্তন করে হাঁক ছাড়ল, 'ডল নাম্বার এইট! কফি খাওয়াও দেখি এক কাপ।'